লোক ঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস

অধ্যক্ষ কৃষ্ণনগর গভঃ পি.টি.টি.আই

ইন্দিরা প্রকাশনী

১৯ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০০৬

৩। কদমগাছির রাজবংশী কচিকাঁচা ও বৌ-ঝিরা।

৪। কদমগাছির ধানভানা।

প্রকাশক :
লক্ষ্মী রায়
ইন্দিরা প্রকাশনী
১৯ডি/এইচ/১০ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৯৯৮

মুদ্রক :
বক্সী প্রিন্টার্স
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান :
বিশ্বাস বুক স্টল
৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
দে বুক স্টোর
১৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩
পি এন পুস্তকালয়
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩
সুমন
২৮/১২এ, বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০ ০০৬
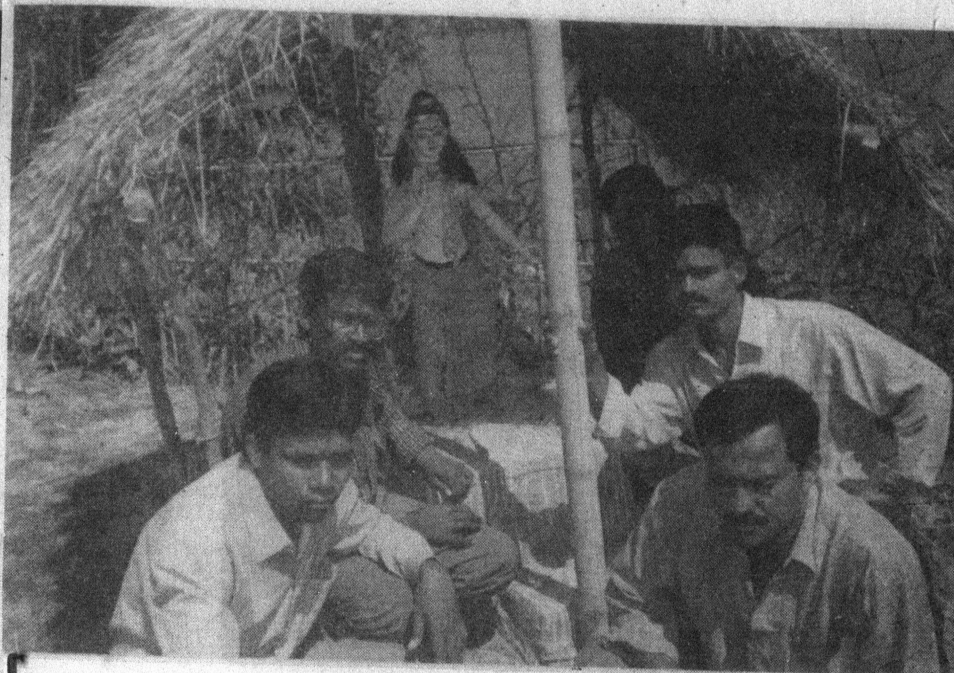
৫। সোনা রায় (গৌড়)।
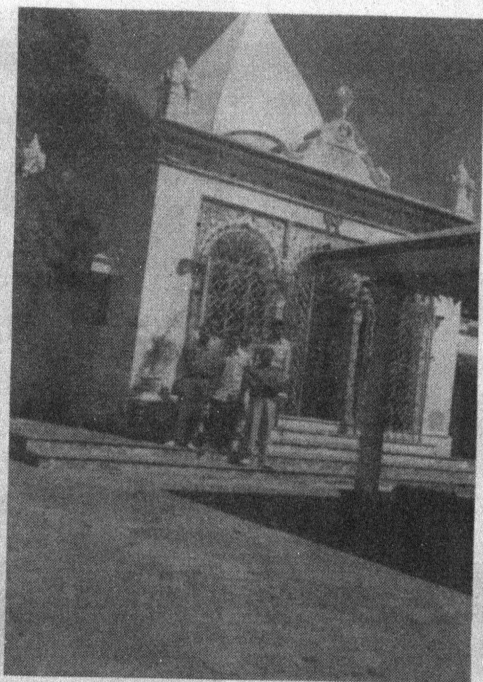
৬। রামকেলি (গৌড়) রাধাকৃষ্ণ মন্দির।

● ভূমিকা ●

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম যখন আমি উত্তরবঙ্গে যাই তখনই এই অংশের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসি এবং মুগ্ধ হই লোকসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যে। কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর বেসিকট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের পরেই আমি এ ব্যাপারে কাজ শুরু করি। সেই সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন আমার সহকর্মী মোহনলাল বসু, গোপাল মণ্ডল, চিত্ত ঘোষ, বীরেন সরকার, ভোলানাথ চক্রবর্তী, কানাইলাল সাহু এবং সংস্থার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণ।

১৯৭৫ এর পরে বদলী হয়ে চলে আসি হাওড়ার রাধানগরে। গবেষণাপত্র তৈরী করতে শুরু করি আশির দশকে। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন আমাকে ডঃ সুধীর করণ মহাশয়। কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় আমি দ্বিতীয়বার আবার উত্তরবঙ্গে বদলী হয়ে যাই ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে। এবার রামগঞ্জ থেকে আবার কাজ শুরু করি। এখানেও ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা পাই। তাছাড়া কুচবিহার নিগম নগরের অধ্যাপিকা সুনীতি বিশ্বাস, কালিংম্পঙ বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বলরাম ছেত্রী এবং বেলা কোবার অধ্যাপকদের সহযোগিতা পাই।

প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে অনেকেই হয়তো এই অংশের লোকসংস্কৃতির ওপরে কাজ করে ফেলেছেন বা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও প্রকাশও করে থাকবেন। ফলে কোন কোন বিষয়ে মিল ও চোখে পড়তে পারে। প্রায় তিরিশ বছর পরে আমার সংগ্রহ করা উপাদান ও তথ্যের ভিত্তিতে 'লোকঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ প্রকাশিত হলো। গবেষক ও পাঠক মহলে গ্রন্থটি আদৃত হলেই আমার তিরিশ বছরের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থটি রচনায় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে বা শেষে বলেছি। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস প্রকাশন সংস্থার শ্যামল রায় এবং চন্দন রায় যে ভাবে সাহায্য করেছেন তাতে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ইতি—রণজিৎ কুমার বিশ্বাস

অধ্যক্ষ—কৃষ্ণনগর গভঃ পি.টি.টি.আই
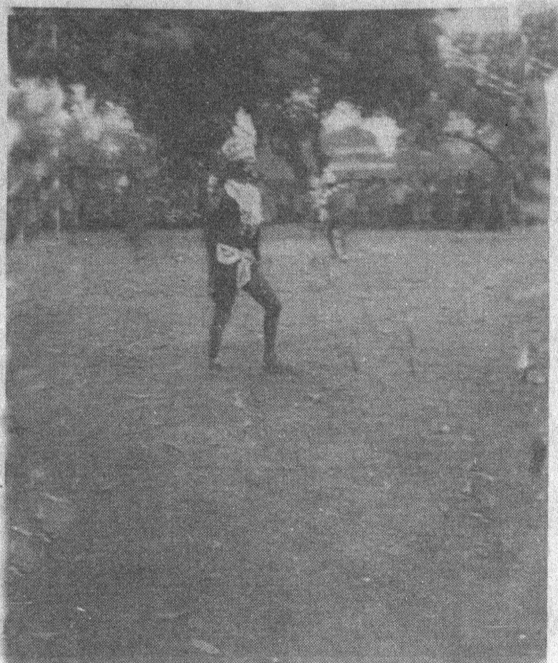
৭। মশানকালী (নয়াবাজার) গঙ্গারামপুর।

৮। গম্ভীরা পালায় (শোভানগর)।

৯। লোকনাহারের মহারাজা।

১০। মহারাজার কাছে পায়রা বলি (লোকনাহার)।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

১১। দাসপাড়ার চা বাগানে (চোপড়া)।

১২। নাগর নদীর উৎস স্থল (চোপড়া)।

লেখকের অন্যান্য বই

১। বিড়লার দ্বারে বাউল (কবিতা)
২। দিগন্ত পেরিয়ে (উপন্যাস)
৩। সব ভূত ভূত নয় (গল্প)
৪। ভূলোদার ভূত (গল্প)
৫। নীল সাগরের ঢেউ (ভ্রমণ)
৬। দক্ষিণী (কবিতা)
৭। ছড়ায় ছড়ায় দখিনভারত (কবিতা)
৮। রাজপুতানাভাবে (কবিতা)
৯। বঙ্গভূমি জননী আমার (কবিতা)
১০। আজো স্বপ্ন আসে (কবিতা)
১১। ডাকে বিন্ধ্যা ডাকে নর্মদা (কবিতা)
১২। বেত্রবতী রেবাদের কাছে (উপন্যাস)
১৩। বাংলার শিক্ষণ-দীপিকা (পাঠ্যগ্রন্থ)
১৪। প্রবাল দেশের উড়ালনায়ে (কবিতা)
১৫। দখিন দেশের দখিন বায়ে (কবিতা)
১৬। ভারতবর্ষ স্বপ্ন আমার (কবিতা)
১৭। ডাকছে পাহাড় হাসছে নদী (কবিতা)
১৮। সীমান্ত (নাটক)
১৯। সজল কাজল (কাব্যনাট্য)
২০। চলছে চলবে ? (নাটিকাগুচ্ছ)
২১। আমারই এ বাংলায় (কবিতা-পুরস্কৃত)
২২। যা জোনাকী (কবিতা-পুরস্কৃত)
২৩। নাগর যেখানে নদী (উপন্যাস)
২৪। উত্তরা পশ্চিমা (কবিতা)
২৫। গঙ্গোত্রী গোমুখীর কাছে (ভ্রমণ)
২৬। বিপাশার পাশে (ভ্রমণ)
২৭। লোকশ্রুতির নদীয়া (গবেষণা)
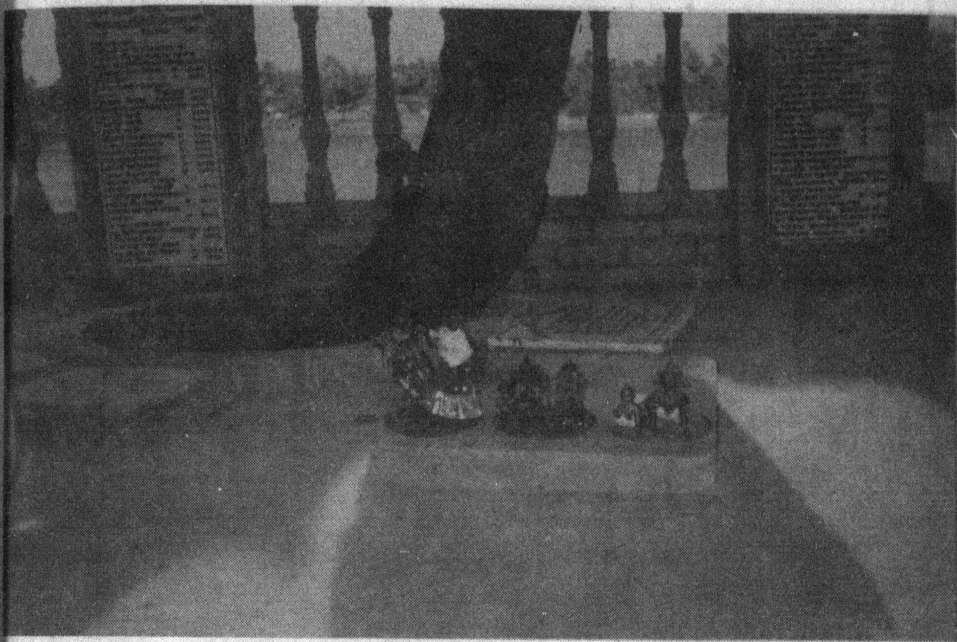
১৩। গ্রামদেবতার থান।

১৪। লোকসঙ্গীতের আসর (চৌপড়া)।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গ :—
ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা

ক—ভৌগোলিক রূপরেখা :

(১) ভূ-পরিচিতি :

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের লোক সংস্কৃতির পরিচয় নিতে গেলে সঙ্গত কারণেই সেই অংশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ও জানা দরকার।

আমাদের পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ বলে কোন নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত না থাকলেও বহুকাল ধরেই লোক মুখে উত্তরবঙ্গ নামটি প্রচলিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যে ছটি জেলা উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত সেই মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দার্জিলিং জেলাই কিন্তু উত্তরবঙ্গের যথার্থ প্রতিনিধি নয়। বৃহত্তর উত্তর বঙ্গের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজসাহী এবং বগুড়াকেও ধরা দরকার। তবে এই জেলাগুলি বর্তমানে অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের ছটি জেলার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

এই অংশের উত্তরে হিমালয় এবং সিকিম ও ভূটান, পশ্চিমে বিহার ও নেপাল, পূর্বে বাংলাদেশ ও আসাম এবং দক্ষিণে বাংলা দেশ ও গঙ্গানদী।

যুগে যুগে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণত কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি নির্ণয় করে সেই দেশের নদনদী, পাহাড় পর্বত, বনভূমি এবং জলবায়ু। নদীর পলিমাটি, ভূমিকম্প, ধ্বস, বন্যা বা কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে প্রাচীন ভূমিতে গড়ে ওঠে নূতন ভূমি। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে দীর্ঘকাল ধরে।

কোটি কোটি বৎসর পূর্বে একদা হিমালয় ছিল সমুদ্রগর্ভে। তারপরে হিমালয় ক্রমেই উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিকযুগে বরেন্দ্র ভূমি ছিল উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ সীমা এবং হিমালয় ছিল উত্তর সীমা। ঐ যুগে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছিল এক বিস্তীর্ণ সাগর প্রমাণ জলাশয়। তিস্তার মতো হিমালয় পূর্ব যুগের বেশ কিছু নদীও তখন উত্তর থেকে এসে পড়তো ঐ জলাশয়ে। পরবর্তী কালে হিমালয় থেকে উদ্ভুত নদী সমূহ পলিমাটি, বালি, কাঁকর এই সব বয়ে এনে ফেলতে থাকে ঐ জলাশয়ে এবং ভরাট হতে থাকে ঐ বিশাল জলাশয়। হিমালয়ের উচ্চতা বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে শুরু হয় প্রচুর বৃষ্টি পাতও। ধীরে ধীরে ধ্বস, বৃষ্টিপাত ও নদী বাহিত পলি কাঁকর ও পলিমাটির কল্যাণে বিস্তৃত হয় নদী উপত্যকা—। ভূতত্ত্ব বিশারদ *এ. বি. চ্যাটার্জীর* মতে— 'To the North was the Himalayas in the Post pleistocene period, the Barind

১৫। রূপগোস্বামী পূজিত রামকেলীর রাধাকৃষ্ণ।

১৬। লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে ভাষণরত লেখক (চোপড়া)।

certainly formed the southern limit. In between there was probably a swamp or a shallow lake of indeterminable length from east to west. There were a number of pre Himalayan rivers, like the Tista, as can be deduced from their antecedent characters, draining into this lake or swamp from north. In all probability the barind in the south left it disconnected from the Bay of Bengal.....sediments were carried into this swamp by the Himalayan rivers.....There are evidence of enormous glacial activities during the pleistocene era in this sector of the Himalayas. The continual rise of the Himalayas together with heavier rainfall during the interglacial periods contributed to the deepening of the river valleys in the mountain province and their rapid filling up by the fluvio-glacial materials."

West Bengal—Page 23.
Edited by *A.B. Chatterjee*
and *P. K. Mokhopaddhyay.*
1972 Edition.

(২) ভূ-প্রকৃতি :

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুরনো ভূমির জায়গায় বিস্তৃত হয়েছে 'নবভূমি'। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতিকেও প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) পুরাভূমি ও (২) নবভূমি। অখণ্ড উত্তরবঙ্গের মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়ার কিছুকিছু অংশে লক্ষ্য করা যায় পুরাভূমি। রাজসাহী বগুড়ার উত্তরাংশ, দিনাজপুরের পূর্বাংশ এবং রংপরের পশ্চিমাংশে যে গৈরিক ভূমি দেখা যায় সেই অংশকেই বলা যায় বরেন্দ্র ভূমির কেন্দ্রবিন্দু। এই বরেন্দ্র ভূমির পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ ঘিরে রয়েছে গঙ্গা, পদ্মা, করতোয়া, মহানন্দা, টাঙ্গন ও আত্রাই নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত শস্যশ্যামল নবভূমি। আর সুপ্রাচীন কাল থেকে এই অংশেই গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ জনপদ গুলো।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে আমাদের আলোচ্য উত্তরবঙ্গকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) দার্জিলিং হিমালয় (২) ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চল এবং (৩) সমতল অঞ্চল।

দার্জিলিং-এর মধ্য ও উত্তরাংশকে দার্জিলিং হিমালয় হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং দক্ষিণ দার্জিলিং জেলা কুচবিহার ও জলপাইগুড়িকে ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের মধ্যে ধরা যেতে পারে। মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে সমতল অঞ্চল হিসাবেই চিহ্নিত করতে হবে।

দার্জিলিং-হিমালয়ের জলবায়ু ঠাণ্ডা হলেও স্বাস্থ্যপ্রদ। পক্ষান্তরে ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের জলবায়ু স্যাঁতসেঁতে ও গরম। আর সমতল অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

তিস্তা-তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, ধরলা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী যেমন ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি গঙ্গা-মহানন্দা, কালিন্দী, ট্যাঙ্গন, আত্রাই, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদী সমৃদ্ধ করেছে নিম্ন উত্তরবঙ্গ তথা সমতল অঞ্চলকে। দার্জিলিং হিমালয়ের রঙ্গীত, মেচি, বালাসন প্রভৃতি নদীর সঙ্গে বিভিন্ন পার্বত্য ঝর্ণা ও ছোট ছোট পার্বত্য নদীগুলোও নানাভাবে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে দার্জিলিং-এর জনজীবনকে।

উত্তরবঙ্গের ভূমি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, জলবায়ু এবং নদনদী নানাভাবেই এই অংশের লোক জীবন ও লোক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এসেছে যুগ যুগ ধরে।

(৩) নদনদী :

উত্তরবঙ্গের নদ-নদীগুলো সুপ্রাচীন কাল থেকেই একদিকে যেমন প্রভাবিত করে এসেছে অর্থনৈতিক জীবনকে তেমনই প্রভাব ফেলেছে সাংস্কৃতিক জীবনচর্যাতেও। উত্তরবঙ্গবাসীরা নদীকে শ্রদ্ধা করে, পূজা করে আবার ভয়ও করে কেন না নদী দেয় প্রাণের উৎস জল, দেশকে করে শস্য শ্যামলা আবার কালান্তক বন্যায় করে সর্বনাশ।

পৃথিবীর অন্যান্য বহু নদীতীরেই যেমন গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন সভ্যতা সমূহ তেমনি উত্তরবঙ্গের নদীতীরেও বিকশিত হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতার। করতোয়া নদীর তীরেই বিকশিত হয়েছিল পুন্ড্র সভ্যতার। পুনর্ভবার তীরে গড়ে উঠেছিল কোটিবর্ষ। গঙ্গা ও মহানন্দার তীরে গড়ে উঠেছিল গৌড়, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী নগরী।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই তিস্তা-মহানন্দা, গঙ্গা, আত্রাই, জলঢাকা, মেচী, নাগর, টাঙ্গন, রঙ্গীত, কুলিক, বালাসন, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদনদীর তীরে হয়ে আসছে বিভিন্ন তিথিতে নানাবিধ পূজানুষ্ঠান এবং ঐ উপলক্ষ্যে বসে আসছে বহু লোকমেলাও। হয়ে আসছে বহু উৎসব অনুষ্ঠানও। লোক শিল্পের বিকাশে এবং সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

(খ) ঐতিহাসিক রূপরেখা :

(১) বৈশিষ্ট্য :

উত্তরবঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, উত্তরবঙ্গ আদিমতম মানব গোষ্ঠীর অন্যতম পীঠস্থান। বাংলার অধিকাংশ এলাকা যখন জলমগ্ন ছিল তখনো এই অংশে বিচিত্র মানব প্রজাতির অবস্থান, সংমিশ্রণ এবং তাদের সংস্কৃতির মিলনের ধারা ছিল অব্যাহত।

দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল আর্য্যসভ্যতা পূর্বভারতে বিস্তারের বহু পূর্বেই।

তৃতীয়ত, উত্তরবঙ্গের প্রাচীন শাসকদের সঙ্গে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং তারফলেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় জনগণ শাসকদের পাশে থেকে প্রাণপণে লড়াই করেছে বহিঃশত্রুর সঙ্গে।

চতুর্থত, উত্তরবঙ্গ কখনোই একটি মাত্র শাসন তন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়নি। পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ এই ত্রিকেন্দ্রিক শাসনে শাসিত হয়েছে সমগ্র উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমকেন্দ্র পুন্ড্রবর্ধন থেকে পূর্বকেন্দ্র কামরূপ বা কামতাপুর থেকে এবং দক্ষিণকেন্দ্র গৌড় রামাবতী ও লক্ষ্ণাবতী থেকে।

প্রাগার্যযুগে পুন্ড্রবর্ধন ভারত জোড়া খ্যাতি অর্জন করলেও পরবর্তীকালে সামরিক বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য দক্ষিণ কেন্দ্র তথা গৌড়ই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস রচয়িতা সুকুমার দাস মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্ত বঙ্গভূমির প্রায় মধ্যদেশে অবস্থিত বলে এবং মগধ-পাটলিপুত্র পাটনার রাজ পাট থেকে সংযুক্ত নদীবন্দরের বাণিজ্যিক, সামরিক সুবিধা থাকায় এতদঞ্চলে বহুকাল বাংলার রাজনীতির মূল রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে।"

—উত্তরবঙ্গের ইতিহাস
সুকুমার দাস—পৃষ্ঠা ৮
প্রথম সংস্করণ ১৯৮২

(২) প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তরবঙ্গ :

উত্তরবঙ্গের মানব ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই অংশে অষ্ট্রিক, নেগ্রিটো এবং দ্রাবিডগোষ্ঠীর মানুষরা বিচরণ করেছে। কৃষির বিকাশ ঘটিয়েছে। দ্রাবিড়রা এই অংশে বহুকাল রাজত্বও করেছে।

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রস্তর যুগের বহু হাতিয়ার। কালিম্পঙের আশে পাশে পাওয়া গেছে নব্য প্রস্তর যুগের কুঠার, পাথরের ছেনি, খাঁজ কাটা হাতিয়ার, ছিদ্রযুক্ত ছোট ছোট পাথর, ও পাথরের কোদাল প্রভৃতি বহু প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপাদান। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড়ে খনন কাজ চালিয়ে মাটির সাড়ে ষোল ফুট গভীরে আবিষ্কৃত হয়েছে নব্য প্রস্তর যুগের কুঠার। —এসবই প্রমাণ করে যে উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়দেরও বহু পূর্বে অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো জাতির লোকেরা বসবাস করে গেছে।

(৩) প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী :

(ক) নেগ্রিটো : প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নেগ্রিটোরাই উত্তরবঙ্গে প্রথম প্রবেশ করেছিল ছোটনাগপুর ও রাজমহল হয়ে। বহু-বহু শতাব্দীর পরে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটোদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা কঠিন হলেও প্রজনন ও উর্বরাশক্তির উপাসনায়, বৃক্ষপূজায়, স্বর্গ ও আত্মার ভাবনায় নেগ্রিটো সংস্কৃতির ছাপ আবিষ্কারে অসুবিধা হয় না।

দু একটি নেগ্রিটো শব্দও বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে সংস্কৃত হয়ে। যেমন নেগ্রিটো-বাড়্—বাদুরিকা (সংস্কৃত)—বাদুড় (বাংলা)।

(খ) অষ্ট্রিক : অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিল প্রায় সাত হাজার বছর আগে। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার জনজীবনে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রভাব তো আছেই সেই সঙ্গে তারা ছাপ রেখে গেছে ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। কোল ও মুণ্ডারা এখনো অষ্ট্রিক ভাষাতেই কথা বলে। নেবু, লাউ, কলা, বেগুন, জাম প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক থেকেই বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। হলুদ ও সিঁদুরের ব্যবহার, বস্ত্র বয়ন, চিনি তৈরীর কৌশল, কুড়ি কুড়ি করে গোণা, কৃষিকাজ ও মাটির পাত্র তৈরীর কায়দা সবই এসেছে এই অষ্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কল্যাণেই। আর্যরা এদের নিষাদ বলে অভিহিত করেছেন। একলব্য এই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীরই সন্তান।

(গ) মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী : মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা বর্মা সীমান্ত দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে প্রবেশ করেছিল আসাম ও উত্তরবঙ্গে। অন্য একটি শাখা তিব্বত দিয়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটান হয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করার সময়েই ঢুকে পড়েছিল উত্তরবঙ্গেও। এই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকেরাই আর্য্যকথিত কিরাত জাতি। আসাম এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গী ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্চায় মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর প্রভাব আজও লক্ষ্য করা যায় সহজেই।

(ঘ) দ্রাবিড় গোষ্ঠী : ভূমধ্যসাগরের আশপাশ থেকে যেসব দ্রাবিড গোষ্ঠীর লোক ভারতে প্রবেশ করেছিল বিভিন্ন সময়ে তাদেরই একটি শাখা ঢুকেছিল এই উত্তরবঙ্গেও এবং বিখ্যাত 'পুন্ড্রবর্ধন' এই দ্রাবিড়গোষ্ঠীরই অবদান। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের মতে —"পুন্ড্র জনপদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং তার পরে 'বোধায়ন-ধর্মসূত্রে'। প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতে এরা আর্য্য ভূমির প্রাচ্য প্রত্যন্ত দেশের দস্যু কোমদের অন্যতম; দ্বিতীয় গ্রন্থের মতে এরা সংকীর্ণ যোনি, অপবিত্র; বঙ্গ এবং কলিঙ্গ জনদের প্রতিবেশী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ আখ্যানের এই উল্লেখে দেখা যায় পুন্ড্ররা অন্ধ্র, শবর ও মুতিব কোমদের সংলগ্ন এবং আত্মীয় কোম।"

বাঙালীর ইতিহাস—পৃষ্ঠা ১৩৭

প্রথম সং- ১৯৮০

এর থেকেই বোঝা যায় প্রাগার্যযুগেই পুন্ড্ররা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং উত্তরবঙ্গে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর্য্যরা এদের দস্যু বলে আখ্যাত করলেও দীর্ঘকাল এরা পূর্বভারত তথা উত্তরবঙ্গে যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল পুন্ড্রবর্ধন নগরীই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৪) উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নগর-নগরী :

(ক) পুন্ড্রবর্ধন : প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন ছিল উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার এক প্রাচীন নগরী। বাণিজ্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই নগরী প্রাচীনবিদিশা এবং শ্রাবস্তীর চেয়ে

কোন অংশে কম ছিল না। করতোয়া নদীর তীরবর্তী এই নগরীর তীর্থমাহাত্ম্যও ছিল। হিউয়েন সাং এই নগরীর প্রশংসা করেছেন। বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থান গড়ই ছিল এই প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরী। এখানে খনন কাজ চালিয়ে যেসব প্রাসাদ, মন্দির, মূর্তি, প্রাচীর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে তার থেকেই বোঝা যায় এই নগরী কতো সমৃদ্ধ ছিল।

(খ) কোটিবর্ষ বা বাণগড় : কোটিবর্ষ ছিল প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগর। এই কোটিবর্ষেরই অন্য নাম 'বাণগড়'। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের পুণর্ভবা নদীর তীরবর্তী গঙ্গারামপুর থানার 'বাণগড়ই' সেই প্রাচীন কোটিবর্ষ। মুসলমান আমলে এর পরিচিতি ছিল 'দেবীকোট' নামে।

সুপ্রাচীন কোটিবর্ষের খ্যাতি ও মর্য্যাদা কৌশাম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কাণ্যকুব্জ ও পাটলিপুত্রের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। পঞ্চমশতক থেকে শুরু করে পাল আমলের শেষ পর্যন্ত এই কোটিবর্ষ নগরই ছিল পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তির প্রধান শাসন কেন্দ্র।

এই বাণগড়কে ঘিরে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাভারতের যুগের বাণরাজার রাজধানী ছিল এই বাণগড়। প্রহ্লাদের প্রপৌত্র বিরচনের পুত্র 'বলি' ছিলেন পূর্ব ভারতের একবিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী। এই বলিরই পুত্র হলেন বাণরাজা। বাণরাজার কন্যা ঊষাকে হরণ করেন কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ। এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে বাণরাজার। বাণরাজা এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বাণরাজার দুই হাত কেটে শ্রীকৃষ্ণ যে দহেতে ফেলেন তাই-ই 'করদহ' নামে পরিচিত। কাছেই রয়েছে 'বংশী হারি' থানা। লোকশ্রুতি এখানে নাকি শ্রীকৃষ্ণের বংশী হারিয়েছিল। কিছুদূরেই হাটকালিয়া গঞ্জের কাছে রয়েছে 'ঊষাহরণ বোর্ড'—যে পথ ধরে ঊষাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। তপন থানার তপনদীঘিতে নাকি শিবউপাসক-বাণ তর্পণ করতেঁন বলে জনশ্রুতি। বাণগড়ের অমৃতকুন্ড ও জীয়নকুণ্ডে স্নান করে পুণ্য অর্জনের জন্য প্রতিবছর বহু পুণ্যার্থী বারুণী স্নানের সময় ভীড় করেন এখানে।

আবার আসামের তেজপুরকেই অনেকে বলিপুত্র বাণরাজার রাজধানী ছিল বলে মনে করেন, মহাভারতের যুগে যার নাম ছিল শোণিতপুর। সেখানেও ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী প্রচলিত আছে।

তবে এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি—"পুনর্ভবাতীরস্থ কোটিবর্ষ এবং বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও ঊষা অনিরুদ্ধের পুরাণস্মৃতি বিজড়িত বাণপুর বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড় এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।'

—বাঙালীর ইতিহাস,

প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬১

প্রথম সংস্করণ—১৯৮০

(খ) পঞ্চনগরী ও সোমপুর : প্রাচীন 'পঞ্চনগরী' অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত থাকলেও তার সঠিক স্থান জানা যায়নি আজও। তবে সোমপুরের অবস্থান যে রাজসাহীতেই ছিল সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ নেই। ধর্মপালের সময় থেকেই প্রাচীন 'পাহাড়পুর'

সোমপুর নামে খ্যাতি অর্জন করে। এখানে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধমহাবিহার। পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই সোমপুর।

(গ) রামাবতী : পদ্মা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলে বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামাবতী নগরী। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে এই রামাবতী নগরীর সুন্দর বর্ণনা আছে।

(ঘ) লক্ষ্মণাবতী : সেন আমলে লক্ষ্মণ সেন মহানন্দা গঙ্গার তীরে গড়ে তুলেছিলেন লক্ষ্মণাবতী। মুঘল যুগে এই লক্ষ্মণাবতী পরিচিত হয়েছিল লক্ষৌতি বলে। প্রায় ১৪/১৫ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই নগরী।

(ঙ) গৌড় : প্রাচীন বাংলার গৌড়নগরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে সন্ধ্যাকরের 'রামচরিত' এমনকি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'ও গৌড়ের সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। প্রাক বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগেও গৌড়ের সুনাম ছিল। বর্তমান মালদহ জেলার গৌড়ে মুসলিম যুগের স্থাপত্য নিদর্শন গুলো আজও দর্শক টানে।

(চ) পাণ্ডুয়া : মালদহের অদূরে পাণ্ডুয়া ও এক সময়ে সমৃদ্ধ নগর হয়ে উঠেছিল। পাণ্ডুয়ার প্রাচীন প্রাসাদও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্নত স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় দেয়।

(ছ) আধুনিক নগর : এই সব বিখ্যাত প্রাচীন নগর-নগরী ছাড়াও পরবর্তীকালের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ইংলিশবাজার, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি প্রভৃতি আধুনিক নগর নগরীও উত্তরবঙ্গকে উজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরেছে বাংলা তথা ভারতের মানচিত্রে।

(৫) বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব :

বিভিন্ন সময়ে নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে, বসবাস করেছে এবং কালক্রমে বিশাল জনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই প্রাগার্য যুগ থেকে একের পর এক বহু রাজতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ এবং রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের।

(খ) বাণরাজ ও পৌণ্ড্রবাসুদেব : দ্বাপর যুগে বাণগড়ে রাজত্ব করেছেন বাণরাজা। এসেছেন পুন্ডরিক বাসুদেব। বাহুবলে বঙ্গ কিরাত এবং পুন্ড্রদেশকে একত্র করে তিনি শক্তিশালী করেছেন পুন্ড্রবর্ধনকে। পৌন্ড্র বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থানেই হত্যা করায় বিদ্রোহ করেন। সম্ভবত ঐ যজ্ঞস্থলেই পৌন্ড্র বাসুদেব প্রাণ হারান। পরবর্তী কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে পুন্ড্রগণ হস্তী বাহিনী নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন সম্ভবত পৌন্ড্র বাসুদেবের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই।

গুপ্তযুগেই উত্তরবঙ্গ স্বাধীনতা হারায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

(গ) শশাঙ্ক : এরপরেই মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে উত্তরবঙ্গ তথা গৌড় সহ সারা বাংলার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চরমে পৌঁছায়। হর্ষবর্ধন এবং ভাস্কর বর্মার হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে উত্তরবঙ্গ চলে যায় ভাস্করবর্মার অধীনে। ভাস্করবর্মার পরে যায় শালস্তম্ভের অধীনে। উত্তরবঙ্গে বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয় কামরূপীয় শাসন।

(ঘ) ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপাল : এর পরেই আসেন পালরাজারা। পুন্ড্রবর্ধন নিবাসী গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের উল্লেখযোগ্য রাজারা হলেন ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল। পাল আমলের দুই রাজধানী গৌড় ও রামাবতী দুই-ই ছিল উত্তরবঙ্গে। পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মহীপালের স্মৃতি উত্তরবঙ্গের মহীপালদীঘি, মহীপুর, মহীসন্তোষ, মহীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদটি আজও ফেরে লোকের মুখে মুখে।

পালরাজ রামপালের সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত রামাবতী নগরী।

(ঙ) বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন : পাল আমলের পরে আসে সেন আমল। বল্লাল সেনের আমলে উত্তরবঙ্গের 'বরেন্দ্রভূমি' সেন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে এবং লক্ষ্মণ সেনের আমলে দিনাজপুর ও রংপুর পর্য্যন্ত সেন রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই সেন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষ্মণাবতী নগরী।

(চ) পৃথু : সেনযুগে উত্তরবঙ্গের বাকী অংশ ছিল সম্ভবত কামতাপুর রাজ পৃথুর অধীনে। পৃথুর পুত্র বিখ্যাত সন্ধ্যারায় গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পৃথু দু-দুবার সাফল্যের সঙ্গে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করেন।

(ছ) বখ্‌তিয়ার খিলজী : লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন এবং প্রথমে লক্ষ্মণাবতী ও পরে বাণগড়ের কাছে দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরেও দেবকোটেই রাজধানী থাকে। প্রায় ২১ বছর রাজধানীর গৌরব অক্ষুন্ন থাকে দেবকোটের। পরে ঐ রাজধানী স্থানান্তরিত হয় লক্ষ্মণাবতীতে। বখ্‌তিয়ারের পরে দলাদলি বিশ্বাসঘাতকতা এবং দিল্লীর সুলতানদের ঘন ঘন হস্তক্ষেপের ফলে উত্তরবঙ্গে তথা সারা বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ওঠে।

(জ) সন্ধ্যা রায় : ১২২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন লক্ষ্মণাবতী দখল করেন এবং কামতাপুর রাজ বীর পৃথুকে পরাজিত করেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই পৃথুর পুত্র সন্ধ্যা রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১২৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কামতাপুর সহ প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।

(ঝ) সিন্ধু ও দুর্লভনারায়ণ : সন্ধ্যা রায়ের পরে সিংহাসনে বসেন সিন্ধু। এই সিন্ধুর সময়েই অহমরাজ 'সুকফা' কামরূপ আক্রমণ করেন। সিন্ধুর পরে রূপনারায়াণ এবং রূপনারায়ণের পরে তাঁর পুত্র 'সিংহধ্বজ' রাজা হন। সিংহধ্বজকে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী মাণিক 'প্রতাপধ্বজ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন ও নূতন এক কায়স্থ রাজ বংশের

সূচনা করেন। মাণিক পুত্র দুর্লভ নারায়ণের সময়ে মহম্মদবিন তুঘলকের বিশাল বাহিনী প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও আসাম আক্রমণ করলে অহমরাজার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে তিনি একযোগে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করেন। দুর্লভ নারায়ণের পরে একে একে ইন্দ্র নারায়ণ অরিমত্ত গজাঙ্ক, শুক্রাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক বসেন কামতাপুরের সিংহাসনে।

(ঞ) খেন বংশ ও নীলধ্বজ : মৃগাঙ্কের মৃত্যুর পরে নীলধ্বজ কামতাপুরের সিংহাসন অধিকার করে 'খেন' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নীলধ্বজের পরে চক্রধ্বজ এবং চক্রধ্বজের পরে নীলাম্বর সিংহাসনে বসেন এবং পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ভূভাগ কামতাপুরের অধীনে আনেন। কিন্তু কামতাপুরের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ঐ সময় গৌড়ের শাসক হুসেনশাহ্ কামতাপুর আক্রমণ করে কামতাপুরকে গৌড়ের শাসনাধীনে আনেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই ১৫০২ খৃষ্টাব্দে কামতাপুর স্বাধীন হয় এবং নাগাঙ্কের শাসনাধীনে আসে।

(ট) কোচরাজ বংশ ও বিশ্বসিংহ : বীর নাগাঙ্কের পুত্র দুর্লভেন্দ্রকে পরাজিত করে বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত কোচ রাজ বংশের। বিশ্বসিংহ রংপুর ও দিনাজপুর পর্য্যন্ত এই রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন এবং তাঁর পরে নরনারায়ণ এই রাজ্যের সীমা পশ্চিমে ত্রিহুত, উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পূর্বে আসাম পর্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। জগদীশচন্দ্রই এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সুদীর্ঘ ৪৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোচ রাজ বংশের গৌরবময় ইতিহাস উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। ধর্ম-ভাষা এবং শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই রাজ বংশের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় নানা কারণেই।

(ঠ) মুসলিম আমলে উত্তরবঙ্গ :— সামসুদ্দিন ও সিকান্দর : বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে নানা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটলেও সামসুদ্দীন ইলিয়াসের সময়ে ধীরে ধীরে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তারপরে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেন সিকান্দার শাহ্ যাঁর অমর কীর্তি পাণ্ডুয়ার কাছে 'আদিনা মসজিদ'।

(ড) রাজা গণেশ : বাংলার সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে রাজা গণেশের সাময়িক শাসন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরে তাঁর পুত্র যদু জালালুদ্দীন নাম নিয়ে কিছু কাল রাজত্ব করলেও তাঁর পুত্র সামসুদ্দীনকে হত্যা করে নাদির খাঁ 'হাবসী' শাসনের সূত্রপাত করলে আবার দেখা দেয় দেশ জুড়ে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

(ঢ) হোসেনশাহ : এই সময়ে আমির ওমরাহরা এক জোট হয়ে সিংহাসনে বসান হোসেন শাহকে। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আসীন থেকে সারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনেন। তাঁর সুশাসনে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল তার জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন গোটা বঙ্গবাসীর কাছে।

হোসেন শাহী বংশের পরে শূরবংশ ও করবানী বংশের শাসন কিছুকাল চলার পরেই উত্তরবঙ্গ সহ গোটা বাংলা চলে যায় মুঘল শাসনের অধীনে। রাজধানী চলে যায় রাজমহল ও ঢাকায় এবং নবাবী আমলে বাংলা-বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। ১৭৫৭র ইতিহাস সবারই জানা।

(৬) ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গ :

পলাশী যুদ্ধের পরে ধীরে ধীরে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে ইংরেজরা। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার এবং বৈকুণ্ঠপুর বাদে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গই চলে আসে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। চোর-ডাকাত-ফকির-সন্ন্যাসীদের উপদ্রব ও লুঠতরাজে উত্তরবঙ্গের জনজীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। '৭৬ এর মন্বন্তরে বাংলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গও শ্মশানে পরিণত হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য ভূটানের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইংরেজের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরও চলে যায় ইংরেজের অধীনে।

(ক) কৃষক বিদ্রোহ : ইংরেজের কঠোর রাজস্বনীতির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উত্তরবঙ্গের কৃষকরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল তা ছড়িয়ে পড়েছিল রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গেই। বিদ্রোহীরা শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হলেও ঐ বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে খাজনার হার কমে আসে, দেবীসিংহের উচ্ছেদ ঘটে এবং ইংরেজ শাসকরা প্রশাসনিক সংস্কার করতে বাধ্য হয়।

(খ) উত্তরবঙ্গের জেলা পুনর্গঠন : শাসনের সুবিধা ও রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলাকে ভেঙে মোট নটি জেলার সৃষ্টি করা হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলার চারটি থানা— যথা শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট ও গুরগুড়িবাগ এবং দিনাজপুর জেলার দুটি থানা মালদা ও বামনগোলার সঙ্গে রাজসাহীর চুম্পী ও রহনপুর থানা দুটিকে একত্রিত করে গঠিত হয় নতুন জেলা মালদহ।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় বগুড়া জেলা। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালপাড়া জেলা এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় পাবনা জেলা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয় দার্জিলিং জেলা। নেপালের কাছ থেকে দখল করা তরাই অঞ্চল এবং সিকিমের কাছ থেকে পাওয়া পাহাড়ী অঞ্চলের সঙ্গে পরে যুক্ত করা হয় কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির শিলিগুড়িকে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে জলপাইগুড়িকে জুড়ে দিয়ে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা।

(গ) স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অবশিষ্ট বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জনগণও গর্জে উঠেছিল। সামিল হয়েছিল সর্বাত্মক গণ আন্দোলনে।

সামাজিক সুবিচার ও ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল বিদ্রোহও উত্তরবঙ্গের স্বরাজ আন্দোলনের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

বাংলার অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে দুটি ধারাতেই। অহিংস এবং সহিংস দুটি পথেই উত্তরবঙ্গের আন্দোলন এগিয়ে গেছে ১৯৪৭ এর পনেরই আগষ্টের দিকে।

(ঘ) স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরবঙ্গ : ১৯৪৭ এর পনেরই আগষ্ট দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হলো ভারত। দ্বিখণ্ডিত হলো গোটা বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গও। বগুড়া, রাজসাহী ও রংপুর চলে গেল পূর্ব পাকিস্থানে (অধুনা বাংলাদেশ)। চলে গেল দিনাজপুর জেলার বেশ কিছুটা অংশও ওপারে। আর যুক্ত হলো কুচবিহার জেলা এবং বিহারের ইসলামপুর থানা।

দেশ স্বাধীন হবার চরম মূল্য গুণে দিতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভীড় হলো এপার বাংলায়। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করে বনাঞ্চলে, পতিত জমিতে এবং গাঁয়ে গঞ্জে ও নদীর চরে ভীড় জমালো লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু। কঠিন পরিশ্রম এবং বুদ্ধি খাটিয়ে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকার তাগিদেই নবাগত উদ্বাস্তুরা কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে নতুন জোয়ার আনলো। গড়ে তুললো নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গড়ে উঠলো ছোট বড় গঞ্জ ও শহর। নবাগতরাই ধীরে ধীরে দখল করে নিল সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যায়ের অধিকাংশ চাকুরীও। ক্রমে উত্তর বাংলার শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চেতনায় এলো এক বৈচিত্র্যময় বিরাট পরিবর্তন।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) West Bengal- A. B. Bhattacharjee and P. K. Mukherjee (২) বাংলাদেশের ইতিহাস- (১ম খণ্ড) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (৩) বাঙালীর ইতিহাস ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (৪) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস- সুকুমার দাস (৫) Prehistoric Man- John Waechter (৬) বাংলার ইতিহাস- প্রভাস চন্দ্র সেন (৭) গৌড়রাজমালা- আর চন্দ (৮) History of civilization of the people of Assam- P. C. Chowdhury (৯) প্রাগৈতিহাসিক বাংলা- পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (১০) বাংলার লোকসংস্কৃতি- ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (১১) Early history of Kamrup.

উত্তরবঙ্গের অধিবাসী

উত্তরবঙ্গ নামটির কোন প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকলেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানিক নাম থেকে বোঝা যায় যে প্রকারান্তরে সরকার জনগণের মৌখিক প্রথানুগত্যকে স্বীকার করেই নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্তমান উত্তরবঙ্গের আয়তন হলো ২১,৬২৫ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক চতুর্থাংশ। সবচেয়ে বড় জেলা জলপাইগুড়ির আয়তন ৬,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার এবং পার্বত্য জেলা দার্জ্জিলিঙের আয়তন ৩,০৭৫ বর্গ কিমি, কুচবিহারের আয়তন ৩,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার, মালদহ জেলার আয়তন ৩,৭১৩ বর্গ কি.মি. এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মিলিত আয়তন ৫,২০৬ বর্গ কিলোমিটার।

উত্তরবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ সমতল-পার্বত্য ও বনাঞ্চলে বসবাস করে এককোটির বেশী নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ। এর মধ্যে তপশীলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। বাকী অর্ধেকের মধ্যে রয়েছে বাঙালী-অবাঙালী, বর্ণহিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ। এ ছাড়াও আছে কিছু বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্মের মানুষও।

এই সকল তপশীলীজাতি ও উপজাতি মুসলমান এবং বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ-রীতি-নীতি ব্রত কর্ম্মাদি, শিল্পকলা, বিভিন্ন মৌখিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক ইতিহাসই হলো লোকায়ত উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস।

(১) তপশীলী জাতি :

উত্তরবঙ্গের তপশীলী জাতির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হচ্ছে রাজবংশী ও পোলিয়া সম্প্রদায়। এরা ছাড়াও রয়েছে তিয়র, তুরী, বৈতি, বিঁদ, বেলদার, ভূঁইমালী, দোসাদ, ঘাসী, গোনরি, কামি, কোচ, মুশাহর, নুনিয়া প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের তপশীলীগণ।

(ক) রাজবংশী সম্প্রদায় : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে নিয়ে বহু বিশেষজ্ঞই আলোচনা ও গবেষণা করেছেন দীর্ঘকাল ধরে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডালটন, গাইট এবং হ্যামিলটন সাহেবের মতই মনে করেন যে এই রাজবংশীয়রা 'কোচ' সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভুত।

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ 'রিজলে' সাহেব মনে করেন রাজবংশী পোলিয়া এবং কোচদের উৎপত্তিস্থল একই। রিজলে সাহেব আরও মনে করেন যে রাজবংশীয়রা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই লোক তবে তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বিগত প্রায় একশো বছর ধরে রাজবংশীরা যতই হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে এবং হিন্দুদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি অনুসরণ করেছে ততই এরা জাতি সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের কোন উপজাতীয় পরিবারভূক্ত করারও বিরোধিতা করেছে।

বাংলাভাষী রাজবংশীয়রা মূলত কৃষিজীবী হলেও বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষকতা এবং অন্যান্য পেশাও গ্রহণ করছে। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে রাজবংশীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং জীবন যাপনের গতানুগতিক ধারাতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজা, ব্রত পার্বণ, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে যে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে এরা অনুসরণ করে আসছিল এবং যে মৌখিক সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারের অধিকারী ছিল—সেসব ক্রমেই আজ অবলুপ্তির পথে। আধুনিক সভ্যতার সংঘাতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য আজ বিপন্ন।

(খ) পোলিয়া : উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী হলো পোলিয়া সম্প্রদায়। রাজবংশীদের পরেই এদের স্থান। রিজলে সাহেবের মতো এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই লোক এবং আসলে কোচ সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূক্ত—'Poliya, Polia, Polo a Dravidian caste of North Bengal, originally Koch."

—*Tribes and Castes of Bengal.*
Ethno graphic glossary.
Volume-II. Page-155.

মূলত কৃষিজীবী হলেও বর্তমানে অন্যান্য পেশাতেও প্রবেশ করছে এরা। পূজা পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান, ভাষা ও ধর্মাচরণের দিক দিয়ে রাজবংশী সম্প্রদায়েরই অনুগামী বলা যায় এদের।

(গ) তিয়র : রাজবংশী ও পোলিয়রা উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতেই কমবেশী ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকলেও 'তিয়র' সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই বাস করে মূলত মালদহ ও দুই দিনাজপুরে। রিজলে সাহেবের মতে এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই লোক এবং নৌকাচালনা ও শিকারে পটু। সম্ভবত সংস্কৃত 'তিভারা' থেকেই 'তিয়র' শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ শিকারী। তবে এরা কৃষি কাজ এবং মাদুর তৈরীও করে।

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী তিয়ররা বুড়োবুড়ী, গঙ্গাদেবী ও মনসার পূজারী। পীরবদর, 'খাজাপীর এবং মাদারের শরণ নেয় এরা বিপদকালে। শ্যাওড়া গাছের নীচেই এদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়ে থাকে। খালে বিলে বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এরা খাল কুমারীর পূজো করে থাকে। বর্তমানে এদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে।

(ঘ) তুরী : দুই দিনাজপুর সহ মালদহ এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বেশ কয়েক হাজার 'তুরী' সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। চেহারা ভাষা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মুণ্ডাদের সঙ্গে এদের মিল লক্ষ্য করা যায়। বাঁশের কাজে এরা দক্ষ। বাঁশের ছোট বড় ঝুড়ি, আঁটুল, বিত্তি, পলো তৈরীতে এরা ওস্তাদ।

বর্তমানে এরা হিন্দু দেবদেবীর পূজো করে থাকে। 'শিব-নারায়ণী' মতের অনুগামী এরা। 'বুড়োবুড়ী', বরান্দাভাট প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীরও পূজো করে এরা। বর্তমানে এরা বাংলা ভাষী। এরা মরা বা বাসি মাংস খায় না এবং মদের প্রতিও বিশেষ আসক্তি নেই এদের। তুরীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আজও অনগ্রসরই রয়ে গেছে।

(ঙ) বৈতি : দুই দিনাজপুরে কয়েকশো 'বৈতি' বাস করে। এরা ছুমারী বা ছুমিয়া নামেও পরিচিত। মাদুর তৈরী এবং শামুক থেকে চূণ তৈরী এদের আদি পেশা হলেও বর্তমানে এরা কৃষিকাজও করে, আবার কেউ কেউ নাচগান করেও সংসার চালায়। এরা বাংলাভাষী। বর্তমানে বৈষ্ণবীয় ধ্যান ধারণায় এরা অভ্যস্ত। পতিত ব্রাহ্মণদের দিয়েই এরা বিভিন্ন শুভ কাজ সম্পন্ন করিয়ে থাকে। শিক্ষাদীক্ষায় খুবই পিছিয়ে আছে বৈতিরা।

(চ) বেলদার : মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেই 'বেলদার' সম্প্রদায়ের অধিকাংশরা বসবাস করে। নৃতত্ত্ববিদ রিজলে সাহেব এদের ভ্রাম্যমান দ্রাবিড়ীয় জাতি বলেই উল্লেখ করেছেন। কৃষি কাজ এবং রাস্তাঘাট তৈরীর কাজেই এরা নিযুক্ত থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মতোই এরা বিভিন্ন হিন্দু আচারাদি পালন করে থাকে। এদের পূজার্চনা ও বিবাহাদি শুভ কাজ সম্পন্ন করে দেয় মৈথিলী ব্রাহ্মণরা। সবদিক দিয়েই বেলদার সম্প্রদায় অনুন্নত।

(ছ) ভূঁইমালী : মূলত মালদহ এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই ভূঁই মালীদের বাস। এরা 'বড়ভাগীয়' এবং ছোট ভাগীয় এই দু-ভাগে বিভক্ত। ক্ষেত মজুরী এবং রাস্তাঘাট ও বাড়ীর দেয়াল তৈরী করেই এরা সংসার চালায়। আগে পাল্কীও বহন করতো এরা। পতিত ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজাপার্বণ ও শুভ কাজ করিয়ে থাকে এরা। কৃষ্ণের পূজারী ভূঁই মালীরা হিন্দুব্রত পার্বণ মেনে চলে ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় অংশ নিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক দিয়ে এরা অনুন্নত।

(জ) বিঁদ : দুই দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতেই মূলত বসবাস করে বিঁদ সম্প্রদায়ের মানুষরা। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন বিহার ও উত্তর ভারতের বিন্দ, ভীন্দ, বিন্দু বা বিন্ বলে যে অনার্য সম্প্রদায়ের উপজাতিরা বসবাস করে উত্তরবঙ্গের বিঁদরা তাদেরই অংশ। আবার কেউ কেউ মনে করেন মধ্যভারতের বিন্ধ্যাচলের আদি বাসিন্দা এরা এবং সেই জন্যই বিন্দ বা বিঁদ বলে এরা পরিচিত। দিন মজুরের কাজ করে সংসার চালালেও এদের অনেকেই রাস্তা ও মাটির ঘর তৈরীতেও ওস্তাদ। মাছ ধরে এবং মাদুর, বাক্স তৈরী করেও জীবিকা নির্বাহ করে এদের কেউ কেউ।

হিন্দুদের দেব দেবীকেই এরা ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনা করলেও বান্দী, সাখা, ভূঁইয়া, গোরাইয়া, পাঁচপীর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজাও করে এরা। ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। বিঁধ বিধবা তার স্বামীর ছোট ভাইকে বিয়ে করতে পারে।

(ঝ) দোসাদ : জলপাইগুড়ি, মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই মূলত এদের বাস। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন এরা নিম্নবর্ণের আর্য সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ এদের উচ্চবর্ণের দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই লোক বলে মনে করেন। বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকেই সম্ভবত এরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিল কোন এক সময়।

চেহারায় নানা রক্তের সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ের রং ফর্সা এবং বাদামী। নাক লম্বা। কনৌজিয়া, ধর, কুরি, কনোয়ার, ভোজপুরিয়া, বাহালিয়া, সীল হোটিয়া, পেইলওয়ার প্রভৃতি আটটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এরা। নিজেদের মধ্যে বিয়ে থা করে না।

বাংলাভাষী দোসাদরা হিন্দু। রাহুই এদের প্রধান পূজ্য দেবতা। তবে গোরাইয়া সালেশ, চোয়ারমল প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজাও করে এরা। শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক মর্য্যাদায় এরা খুবই পিছিয়ে। চৌকিদারী ও ঘাস কাঠ কেটেই জীবিকা নির্বাহ করে এরা। তবে এরা কৃষিকাজও করছে বর্তমানে।

(ঞ) ঘাসী : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেই ঘাসীরা বাস করে। দ্রাবিড় সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভুত হয়েছে এরা। মাছ ধরা ও চাষ বাসই এদের জীবিকার উৎস। এরা বিবাহাদি শুভ কাজে বাজনদারের কাজও করে। ঘাসী মেয়েরা 'দাই' এর কাজেও পটু। হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা করলেও ধর্ম, মঙ্গলা, 'বড় পাহাড়' প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজোও করে। নিজেদের মধ্যে থেকেই পুরোহিত নির্বাচন করে এরা। মদ্য পানে আসক্তি খুবই এদের। ডোম-মুশহর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই পর্য্যায় ভূক্ত এই অনুন্নত ঘাসীরা।

(ট) গোনরি : উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় গোনরিদের বাস। গোনরিরা নৌকা চালনাতে পারদর্শী। এরা দাবী করে যে এদেরই পূর্বপুরুষ শ্রীরাম চন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সীতাকে এলাহাবাদে গঙ্গা পার করিয়েছিল নৌকা করে। মাছ ধরা এদের অন্যতম পেশা হলেও বর্তমানে এরা কৃষি কাজও করে থাকে। এরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও কৈলাবাবা, মারাং, চাঁদসিং, জয়সিং বান্দী, গোরাইয়া, কমলাজী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীরও পূজা অর্চনা করে থাকে। খুবই অনুন্নত এই গোনরিরা।

(ঠ) কামি : কামি সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানত বসবাস করে দার্জ্জিলিং জেলাতেই। এরা সাধারণত কামারের কাজ করে তবে এদের কেউ কেউ স্যাকরার কাজও করে। বিশ্বকর্মা এদের বিশেষ পূজ্য দেবতা হলেও কালীই প্রধান উপাস্য দেবী। নেপাল থেকেই দার্জ্জিলিং জেলাতে প্রবেশ করেছে এরা। বিশ্বকর্মাই এদের পূর্বপুরুষ বলে দাবী করে এরা। সুদূর অতীতে এরা ভারতের সমতল অঞ্চল থেকেই নেপালে ঢুকেছিল বলে দাবী এদের। অবশ্য চেহারাতেও সমতলের ছাপ আছে। এরা সহজ সরল এবং খুবই কর্মঠ।

(ড) কোচ : কুচবিহার এবং আশে পাশের এলাকার লোক এই কোচরা বর্তমানে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। কোচরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। আবার এদের অনেকে নিজেদের রাজবংশী বলেও পরিচয় দেয়। কোচ জাতির চেহারায় মঙ্গোলীয় ছাপ লক্ষ্য করা যায়। চেহারায়, আচার-আচরণে রাজবংশীদের সাথে এদের পার্থক্য খুবই কম। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন কোচ রাজবংশী এবং পোলিয়ারা একই নৃগোষ্ঠীর লোক।

বাংলাভাষী কোচরা হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা করলেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজোও করে থাকে। মূলত কৃষিজীবি হলেও বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরীও করে অনেকে। এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ও ক্রমেই বাড়ছে। দ্রাবিড় এবং বোড়োজাতির মিশ্রনেই কোচ

(ঢ) মুশাহর : দ্রাবিড় জাতির বংশোদ্ভব মুশাহররা প্রধানত মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলাতেই বসবাস করে। ছোট নাগপুর থেকেই এরা প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গে। নিজেদের এরা আহির জাতির লোক বলেই দাবী করে থাকে। মুটে মজুর এবং কৃষি কাজ করেই এরা সংসার চালায়। ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় এরা অনার্য জাতির উত্তরসূরী। পরলোক ও প্রেততত্ত্বে এদের অগাধ বিশ্বাস। বর্তমানে কালীই এদের প্রধান উপাস্য দেবী হলেও তুলসী রিকনুর, আসান, রামচন্দ্র, ভবান এবং চরক প্রভৃতি ছয় লৌকিক মহাবীরও তাদের পূজো পেয়ে থাকে।

পূজা পার্বণ ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এরা হিন্দু প্রথা পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে। তবে পুরোহিত নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত করে। আবার মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে মৃতের ভাগ্নে। সমাজের নিম্নস্তরেই এদের স্থান।

(ণ) নুনিয়া : বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ রিজলে সাহেবের মতে নুনিয়ারা আসলে বিহারের দ্রাবিড় বংশোদ্ভব তপশীল জাতি। বেলদার এবং বিঁদদের মতোই একই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক এরা। নুনিয়াদের মধ্যে প্রচলিত লোক গাথা অনুসারে জানা যায় যে এদের এক পূর্বপুরুষ বিদুরভগত তপস্যাকালে নুন খেয়ে সমাধি ভঙ্গ করায় রামচন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। সেই থেকেই নুনিয়া বলে পরিচিতি ঘটে এদের।

এরা কৃষি কাজ ছাড়াও নুন তৈরী, মাটির ঘরবাড়ী ও রাস্তা ঘাট তৈরীও করে থাকে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী নুনিয়াদের প্রধান উপাস্য দেবী হলেন 'ভগবতী'। তবে এরা বোন্দী, গোরাইয়্যা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে শীতলা দেবীরও পূজো করে থাকে।

(ত) অন্যান্য : উত্তরবঙ্গে এই সব প্রধান প্রধান তপশীল জাতি ছাড়াও দাসাই, সার্কি, ভুঁইয়া, কাউর, মাল প্রভৃতি অন্যান্য তপশীল সম্প্রদায়ের মানুষও বসবাস করে অল্পসংখ্যায়।

এই সকল তপশীল জাতির উদ্ভবের ইতিহাস নৃতাত্ত্বিক বিচারে যাহাই হোক্ না কেন বর্তমানে জাতিগত বিচারে এরা সকলেই বাঙালী এবং ধর্মীয় চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় হিন্দু ভাবাপন্ন। একমাত্র 'কামী' সম্প্রদায় ছাড়া উত্তরবঙ্গের সকল তপশীল জাতিই বাংলা ভাষী।

(২) উত্তরবঙ্গের তপশীল উপজাতি :

উত্তরবঙ্গের তপশীল-উপজাতির মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। (ক) মোঙ্গলীয় (খ) আদি-অষ্ট্রাল ও (গ) দ্রাবিড় গোষ্ঠীর উপজাতি।

(ক) মোঙ্গলীয় ধারার উপজাতিরা উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা রাজ্য থেকেই আগত অথবা ঐ সব রাষ্ট্র বা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ যখন বৃটিশ আমলে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তখন থেকেই তারা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে গেছে।

মোঙ্গলীয় ধারার উপজাতিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো (১) ভূটিয়া (২) লেপচা (৩) রাভা (৪) মেচ (৫) গারো (৬) টোটো।

(১) ভূটিয়া : ভূটিয়ারা মূলত তিব্বতের বাসিন্দা। পূর্ব তিব্বত থেকে এসে এরা সিকিমে আধিপত্য বিস্তার করে এবং কালক্রমে সিকিমি বলে পরিচিত হয়। তিব্বতীয়রা ঐ সব সিকিমিদের বলে 'ডেনজংপা' আর ভারতীয় এবং ইউরোপীয়রা বলে 'ভূটিয়া' বা 'ভোটিয়া'।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলাতেই এদের বসবাস। ভেড়াই এদের জীবিকার প্রধান উৎস হলেও বর্তমানে অনেকে ব্যবসা চাষবাস এবং চাকরীও করছে। এরা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ভাষা 'ভোটিয়া' যা আসলে তিব্বতী ভাষার পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষা। পশমের জিনিষ তৈরীতে এরা দক্ষ। অন্যান্য পার্বত্য জাতির তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে এরা বেশ অগ্রসরই বলা যায়। এদের নিজস্ব পালা পার্বণ এবং আচার অনুষ্ঠানও রয়েছে।

(২) লেপচা : উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলাতেই প্রধানত লেপচাদের বাস। এদের আদি নিবাস হলো সিকিমে। অনেকে মনে করে নেপালী 'লাপচা' থেকেই 'লেপচা' শব্দটি এসেছে। অন্যমতে নেপালে 'লাপচা' বলে একটা মাছ পাওয়া যায় যা সহজেই বশ মানে। ঐ মাছেদের মতো যারা সহজেই বশমানে তাদেরই 'লেপচা' বলা হয়।

লেপচাদের গায়ের রং হলদেটে, চোখ ছোট, চোয়ালের হাড় শক্ত। এরা কর্মঠ, বিনয়ী, বুদ্ধিমান, সামাজিক ও অতিথি পরায়ণ।

লেপচাদের নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও বর্তমানে এরা নেপালী ভাষাতেই কথাবার্তা চালায়।

লেপচাদের গ্রামগুলো জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা। জল এবং কৃষিকাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই এরা এদের বস্তিগুলো গড়ে তোলে। ধর্মের দিক দিয়ে এরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। প্রতিটি গ্রামেই বৌদ্ধ গুম্ফা আছে। সভা এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ আলোচনা ঐ গুম্ফাতেই করে এরা। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সাধারণ সমাধিক্ষেত্র থাকে গ্রামের পাশেই। গরু, ভেড়া, ছাগল, শূয়োর, মুরগী পুষে থাকে এরা। লেপচারা ঘরকে বলে 'ডুকেনকুলী'। বাঁশই এদের বাড়ী তৈরীর প্রধান উপাদান। ধান, ভুট্টা, আলু ও বিভিন্ন সব্জীর চাষ করে থাকে এরা। কৃষিকাজ, পশুপালন ও বিক্রী করাই এদের জীবিকার প্রধান উৎস।

পুরুষরা সাধারণত লম্বা জোব্বা পরে এবং মেয়েরা পরে 'টোগো'। মেয়েরা হাতে কানেও গলায় চুড়ি-দুল ও হার পরে। লোহা-পিতল-বাঁশ ও কাঠের ওপরে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্যে দক্ষ এরা। বাঁশের বাঁশী এদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হলেও ড্রাম করতালও বাজায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

সাধারণত লেপচা ছেলেমেয়েদের বিয়ে যোগাযোগ করেই হয়ে থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও বিয়ে সাদির কাজ চলতে পারে। তবে মেয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর কন্যাপণ দাবী করে এরা। বিধবা বিয়ে চালু থাকলেও একমাত্র মৃতস্বামীর ছোট ভাইকেই বিয়ে করতে পারে বিধবা নারী।

এদের অন্নপ্রাশন, ছেলে মেয়ের নামকরণ বা বিবাহাদি অনুষ্ঠান বেশ বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয়ও বটে। নাচে-গানে-হাসি ঠাট্টায় মধুময় হয়ে ওঠে এদের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসবগুলো।

বৌদ্ধ লেপচাদের প্রধান প্রধান উৎসব হলো বান, নারকাকিয়ট, লোসার, চেচু, মেন, ইনটেন ছেরাপ প্রভৃতি। আবার কিছু সংখ্যক 'জড়বাদী' লেপচাও আছে। এদের প্রধান প্রধান উৎসবগুলো হলো 'চেরমেনো মংত্রিমেনো, খিচারীমিন, নভাংঘি, মংব্রিজোসিন, ছুছু গ্রাম প্রভৃতি।

উৎসব অনুষ্ঠানে, নৃত্যে গানে, লোক কথায় ও প্রবাদে লেপচাদের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ। আর এ সবকিছুরই মূলে রয়েছে এদের শৃঙ্খলাময় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাত্রা।

(৩) রাভা : রাভা উপজাতির শতকরা সত্তরভাগ লোক বাস করে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায়, বাকী তিরিশ ভাগ ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়। রাভাদের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নানাকাহিনী প্রচলিত আছে। এদের একটি লোক কথা থেকে জানা যায় যে একদা দুই বোন ও এক ভাই ছিল। ছোট বোনের সঙ্গে ঘটনাক্রমে ঐ ভাইএর অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হলে দলের লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দেয় অনেক দূরে। ছোট বোনের নাম ছিল 'রংদার্নিয়া'। এদের বংশধররা তাই রংদানিয়া রাভা নামে পরিচিত হয়।

কিন্তু রেভারেন্ড এন্ডলে মনে করেন রাভারা আসলে হিন্দু পিতা ও কাছাড়ী মায়েরই বংশধর।

আবার নৃতত্ত্ববিদ ডালটন্ সাহেবের মতে রাভারা আসলে আসামের গোয়ালপাড়ার হাজং কাছাড়ী সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। এদের সঙ্গে গারোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেও মনে করেন তিনি।

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হাডসন সাহেব মনে করেন রাভারা মেচ জাতিরই একটি শাখা এবং পাণিকোচ ও গারোদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আছে এদের।

এস. কে রাহার মতে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের রাভারা আসলে কোচরাভা ও পাতিরাভাদের গোষ্ঠীভুক্ত।

রাভারা হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা করলেও বনবাসী রাভাদের প্রধান দেবতা হলেন মহাকাল। শিবকালী, গঙ্গা ও কামাখ্যাদেবী রাভাদের উপাস্য হলেও রাখাল বিষহরি, মশানকালী, বুড়া ঠাকুর, বকাসুর, কালাসুর, ধানাসুর, সত্যপীর, জলমশান, গাভুর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীরও পূজো করে থাকে এরা। রেভারেন্ড এন্ডেল সাহেব মনে করেন গারো এবং কাছাড়ী ভাষার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে এদের ভাষা তবে রাভাদের ভাষায় বাংলা এবং সংস্কৃতের প্রভাবও আছে।

আবার গ্রীয়ার সাহেব মনে করেন এদের ভাষা বোড়ো গোষ্ঠীরই ভাষা।

গারোদের 'এ্যাটং' উপভাষার সঙ্গেও রাভাদের ভাষার যোগ আছে বলে মনে করেন অনেকে।

তবে বর্তমানে দুচারজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা বনবাসী রাভা ছাড়া প্রায় সবাই বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। বর্তমানে চাষ বাস এবং ক্ষেতমজুরের কাজ ছাড়াও এরা ব্যবসা ও চাকরীও করছে।

(৪) মেচ : জলপাইগুড়ি জেলার বনাঞ্চল ও পাহাড় ঘেঁষা অঞ্চলেই মেচ সম্প্রদায়ের লোকেদের বেশীর ভাগের বাস। অবশ্য কুচবিহার জেলার মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জ থানা এবং দার্জ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থানার বিভিন্ন অংশেও কিছু মেচ সম্প্রদায়ের লোক ছড়িয়ে আছে।

মেচ সম্প্রদায়ের আদি বসতি কিন্তু আসামে। আসাম থেকেই এরা প্রবেশ করেছিল উত্তরবঙ্গে কোন এক সময়ে। ডালটন্ সাহেব মনে করেন মেচ এবং কাছাড়ীরা একই গোষ্ঠীর লোক।

হেরমেন সাহেব তাঁর 'The Indo Tibetan, গ্রন্থে যে মজাদার তথ্য দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় যে নেপালের রাই সম্প্রদায়ের আদি পিতা মাতা 'পারুনগো এবং সীমনিমার ছিল তিন ছেলে ল্যাপচে, জিমদার এবং মেচে। তিন ছেলেকে তাদের বাবা মা নিজেদের দেশ খুঁজে নিতে বললে তারা বেরিয়ে পড়ে দেশান্তরে এবং কালক্রমে ঐ তিন ছেলে থেকেই সৃষ্টি হয় লেপচা, মেচ ও জিমদার উপজাতির।

শিকার, মাছ ধরা, কাঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করাই এদের জীবিকার উৎস হলেও অনেকেই বর্তমানে চাষ বাসও করছে। দিন মজুর এবং চাকরীও করে অনেকে।

ভোট চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত অসমীয়া বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাই এদের মূল ভাষা। মেচ উপভাষার সঙ্গে কাছাড়ের বোড়োগোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য আছে। তবে বর্তমানে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলে এরা।

মেচরা ছোট বড় নানা গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত যেমন নরজিনারী, ছামরানারী, ঈশ্বরারী প্রভৃতি। স্বাধীনতার পূর্বে এরা হিন্দুদের গোত্র ও পদবীও গ্রহণ করতে শুরু করেছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে যখন তপশীল উপজাতি হিসাবে গণ্য হলো তারা তখন ঐ মোহ ত্যাগ করে।

বহু আগে মেচরা যাযাবর জাতির মতো স্থান থেকে স্থানে ঘুরে বেড়াতো। যেখানে শিকার এবং মাছের প্রাচুর্য্য সেখানেই অস্থায়ী আস্তানা গাড়তো। শিকার এবং মাছ ফুরিয়ে গেলেই অন্যত্র চলে যেত। কালক্রমে এরা কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মিলে মিশে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। মেচদের প্রধান বা দলপতি হলো 'ফরিয়া'।

আগে 'মেচ' সম্প্রদায়ের ভাবী জামাইকে বিয়ের আগে শ্বশুর বাড়ীতে শ্রমদান করতে হতো। মেয়ের বাবাকে যৌতুক দিয়ে বা জোর পূর্বক বিয়েও প্রচলিত ছিল। মেচ সমাজে 'হরে খুনে' বিয়েও প্রচলিত ছিল। এতে মেয়ের বাড়ীতে চিরদিনের মতো ছেলেকে ঘর জামাই থাকতে হতো। বর্তমানে অবশ্য দেখাশোনা করেই নাম মাত্র কন্যাপণ দিয়েই ছেলের বিয়ে হয়ে থাকে।

মেচ সমাজে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেলেরাই সম্পত্তির সমান ভাগ পায়। মেয়েরা অবিবাহিত থাকলে ভারণপোষণ পায়।

কাছাড়ীদের মতো 'সীজ'ই মেচদের প্রধান দেবতা। এছাড়া মহাকাল, মাইনাও, মায়িমনসা, বাটাহো, তিস্তাবুড়ী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজাও করে এরা।

মেচদের বংশানুক্রমিক পুরোহিত যদিও দেওশী তবে বর্তমানে এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়েই পূজার্চনা বা শুভকর্মাদি সম্পন্ন করিয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের সমতলের অন্যান্য উপজাতিরদের চেয়ে মেচদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণ স্বতন্ত্র। হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে এসে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাপনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নৃত্য-গীতে এদের আগ্রহ এবং পারদর্শিতা সত্যিই উল্লেখ করার মতো।

(৫) গারো : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলাতে বেশ কিছু সংখ্যক গারো'র বসতি আছে। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন গারোরা আসলে তিব্বতী। এদের নেতা গারুর নেতৃত্বেই এরা তিব্বত থেকে কোন এক সময়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসে।

আবার কেউ কেউ বলেন গারোদের আদি মাতা তিব্বতী রমণী এবং আদিপিতা একজন হিন্দুসন্ন্যাসী।

মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর গারোরা বেশ শক্ত সমর্থ এবং কর্মঠ। দিনমজুর ও কৃষি শ্রমিক হিসাবেই এরা জীবিকা নির্বাহ করলেও বর্তমানে ব্যবসা এবং চাকরীও করছে এদের কেউ কেউ।

এদের বেশীর ভাগই হিন্দু হলেও খৃষ্টানও হয়েছে অনেকে। বাংলা এবং গারো উভয় ভাষাতেই কথা বলে এরা তবে ইংরাজীও জানে অনেকে। মহাকালই এদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

(৬) টোটো : টোটো উপজাতির লোক সংখ্যা খুবই কম। জলপাইগুড়ির 'টোটো' পাড়া মৌজাতেই সামান্য সংখ্যক 'টোটো'রা বসবাস করে। বিলুপ্ত প্রায় উপজাতিদের অন্যতম হ'লো এই টোটো উপজাতি। টোটোরা তেরটি গোত্রে বিভক্ত। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে থা হয়ে থাকে এদের। মৃতা স্ত্রীর বোনকে মৃতার স্বামী বিয়ে করতে পারে। বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে। এদের চেহারা এবং পোষাক পরিচ্ছদে ভূটিয়াদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মাছ ধরা, শিকার এবং কৃষি কাজই এদের জীবিকার প্রধান উৎস।

গারোদের মতো 'মহাকালই টোটোদের প্রধান উপাস্য দেবতা। মাওনি পূজা, মাইও, মানকামিন, সুরদে, গারাম পূজা ইত্যাদি এদের প্রধান প্রধান পূজা ও উৎসবানুষ্ঠান। রোগ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টোটোরা পূজো দেয় 'ইস্‌পাকে' যিনি বাস করেন 'বাদু পাহাড়ে'।

টোটোদের ভাষা তিব্বতী চীনা গোষ্ঠীর উপভাষার অন্তর্গত। তবে বর্তমানে এরা বাংলাভাষা বোঝে এবং বাংলায় কথাবার্তাও বলতে পারে। লেখা পড়াও শিখছে এরা বর্তমানে। টোটো ভাষায় বেগুন হলো 'বেনগিনি, কুকুর হলো 'কিয়া', হাতি হলো 'হাট, ষাঁড় হলো পেকাদাম্বে।

(খ) উত্তরবঙ্গের আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর তপশীল উপজাতি : উত্তরবঙ্গের আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর তপশীল উপজাতিদের অধিকাংশই এসেছে বিহার ও মধ্যভারত থেকে। উত্তরবঙ্গে চা শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিহার ও মধ্যভারত থেকে এই সব উপজাতির লোকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) নাগাসিয়া (২) মুন্ডা (৩) মাহ্যলি (৪) সাঁওতাল (৫) কোড়া প্রভৃতি।

(১) নাগাসিয়া : নাগাসিয়ারা প্রধানত জলপাইগুড়ির চা বাগান এলকাতেই বসবাস করে। এরা ছোটনাগপুরের কৃষাণদের স্বগোত্রীয়। সূর্য্য এবং বাঘ এদের উপাস্য দেবতা। 'দরহো' এদের অন্যতম দেবতা। 'সাদরী' উপভাষাতেই কথাবার্তা বলে এরা। পরিশ্রমী

নাগাসিয়ারা চা শ্রমিক এবং কৃষি কাজের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এরা সহজ সরল প্রকৃতির।

(২) মুন্ডা : মূলত চা শ্রমিক হিসাবেই মুন্ডারা উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকায় আসে ছোটনাগপুর থেকে। বর্তমানে জলপাইগুড়ির চাবাগান এলাকা ছাড়াও এরা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

মুন্ডাদের মধ্যে প্রচলিত লোক কথা অনুসারে মানব সমাজের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায় যে—মানব সৃষ্টির মূল হোতা 'ওটেবোরাম এবং 'সিংবোঙ্গা' প্রথমে একটি ছেলে ও মেয়ে সৃষ্টি করে বংশ বৃদ্ধির জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক গুহায়। ক্রমে তাদের বারোটা ছেলে ও বারোটা মেয়ে হলো। তারা যখন জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত তখন 'সিংবোঙ্গা' তাদের সামনে নানা উপাদেয় খাদ্য বস্তু রেখে দিলেন। ঐ সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ওপরেই নির্ভর করছিল তাদের ভাবী জীবন। প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া গ্রহণ করলো ষাঁড় ও মোষের মাংস। তারা পৃথিবীতে জন্ম নিল 'কোল' ও 'ভূমিজ' রূপে। যারা ছাগলের মাংস ও মাছ নিল তারা হলো শূদ্র। যারা সব্জী গ্রহণ করলো তারা হলো ব্রাহ্মণ ও ছত্রী। যারা শূকরের মাংস নিল তারা হলো সাঁওতাল। এই ভাবেই পৃথিবীতে মানব সমাজের বিকাশ হলো।

মুন্ডারা ভাল শিকারী হলেও এরা মূলত চা বাগানেই কাজ করে। তবে কৃষি কাজও করে এদের অনেকেই।

'সিংবোঙ্গা' এবং সূর্য্যই এদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এছাড়া বুড়াবোঙ্গা বা মারাং বুরুও এদের উপাস্য। মাঘী পরব, ফাগুয়া, বো, শরহুদ প্রভৃতি পরবও পালন করে থাকে এই মুন্ডারা।

সাধারণত এরা বাংলা-হিন্দী-মুন্ডারী মেশানো 'সাদরী' ভাষায় কথা বলে থাকে চা বাগান এলাকায়, আজকাল অবশ্য বাংলাভাষাতেও কথা বলে এদের অনেকে।

(৩) মাহালি : এরা আসলে সাঁওতাল সম্প্রদায়েরই একটি গোষ্ঠী বলে মনে করেন অনেকে। তবে সাঁওতাল ছাড়াও মুন্ডা এবং ওঁরাও জাতির সঙ্গেও এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মাহালিরা বাঁশের কাজ, চাষবাস এবং দিন মজুরের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

হিন্দু দেবদেবীই এদের উপাস্য। তবে হরি, কালী ছাড়াও মনসাদেবী, আখানী, গ্রাম দেবতা, করাম, গড়েয়া প্রভৃতি লৌকিক দেব দেবীরও পূজো করে এরা। টুসু, দোল উৎসব এবং সারুল এদের প্রধান উৎসবের মধ্যে গণ্য। এদের ভাষায় মানভূম অঞ্চলের ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৪) সাঁওতাল : উত্তরবঙ্গের তপশীল উপজাতির অন্যতম বৃহৎ গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে মালদহ, জলপাইগুড়ি এবং দুই দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে।

শিকার, মাছধরা, বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা, কৃষি কাজ, রাস্তাঘাট তৈরী ও নানাবিধ শ্রমসাধ্য কাজে এদের জুড়ি নেই। চাবাগানেও বহু সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী কাজ করে। বর্তমানে এদের অনেকেই লেখাপড়া শিখে চাকরীও করছে।

ধর্মবিশ্বাসে এরা জড় উপাসক হলেও মনসা, আষাড়ী দেব, দুর্গা, লক্ষ্মী, শিব, জিতুয়া, করাম প্রভৃতি দেবদেবীরও পূজো করে থাকে। 'বোঙ্গা' হলেন জ্বর এবং নানা ব্যাধি নিরাময়ের দেবতা। 'বোঙ্গা' দেব অবস্থান করেন 'জাহের থানে'। জাহের বুড়ী এবং মারাং বুরুর পূজোও করে উত্তরবঙ্গের সাঁওতালরা। অনেকে এদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে।

এরা উৎসব পাগল জাতি। দিনান্তে ঘরে ফিরে এরা মেতে ওঠে নাচেগানে। ডিমিডিমি মাদলের বোলে আর বাঁশীর সুরে সাঁওতাল পল্লীতে যে স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার তুলনা হয় না। নানারকম উৎসব পালন করে এরা। করাম, নবান, ফাগুয়া, বাঁধনা, সহরায় প্রভৃতি এদের প্রধান প্রধান উৎসব। নৃত্যে, গানে, ছড়ায়, ধাঁধাঁয়, প্রবাদে ও নানাবিধ উপকথায় এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ।

উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল সম্প্রদায়ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের সাঁওতালদের মতোই 'অলচিকি' ভাষাতেও কথা বলে। তবে এরা বাংলা ভাষাতেও কথাবার্তা বলে।

উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যে 'দুম্‌কাহুড়' ও 'বগড়ীহুড়' এই দুটি বিভাগ আছে। গ্রামের মোড়লকে সবাই মানে। নিজেদের ঝগড়া বিবাদ এরা গ্রাম সভাতেই মিটিয়ে নেয়। এদের বিচার ও আলোচনা চক্রে এবং সমাজ গঠনে গণতন্ত্রের আদিম রূপটি লক্ষ্য করা যায়। এদের পোষাক পরিচ্ছদে, আচার, আচরণে, কথাবার্তায় যে সহজ সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা মনে দাগ কেটে যায়।

মাটির হলেও এদের ঘরবাড়ী ঝক্ ঝকে তক্ তকে। সাধারণত নির্জন বনপ্রান্তেই ছোট ছোট বস্তিতেই বস বাস করে এরা। গ্রাম প্রধান হলো আতো মাঝি। তাকে সাহায্য করে পারাণিক, ছোগ মাঝি, ও ছোগ পারানিক প্রভৃতিরা। এদের মতামত ছাড়া গ্রামের কেউ কোন কাজে হাত দেয় না। পিতার সম্পত্তি পুত্ররা পায়। কন্যারা ভরণ পোষণ পেয়ে থাকে। বিয়েথা পিতামাতার সম্মতিতে দেখেশুনে হলেও পছন্দ মতো ভালবাসার বিয়েও হয় বহু ক্ষেত্রে। উত্তরবঙ্গের সাঁওতালগণ মনে করে মুর্মুরা তাদের পুরোহিত শ্রেণী, কিসকুরা রাজবংশীয়, হেমরামরা মন্ত্রী বংশীয়, সোরেনরা সৈনিক বংশীয়, মান্ডীরা ধনিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, টুডুরা গায়ক-বাদক, এবং অন্যান্য উপাধিধারীরাও বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল অতীতে। এদের বিশ্বাস তাদের নিজস্ব রাজ্য ও রাজধানী ছিল কিন্তু মাণসিংহের আক্রমণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। বহু বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের ইতিহাসে সমৃদ্ধ এদের ইতিহাস।

(৫) কোড়া : উত্তরবঙ্গের মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক কোড়া উপজাতির লোক বসবাস করে। দার্জিলিং এবং কুচবিহার জেলাতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক।

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ রিজলে সাহেব মনে করেন কোড়াদের উদ্ভব হয়েছে মুন্ডাদের থেকেই। আবার রাঁচী ও মানভূম অঞ্চলের ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনেক সময় 'কোড়া' ও 'মোদী' বলে পরিচিত হয়ে থাকে। গ্রীয়ারসন সাহেব মনে করেন কোড়ারা মোদীদের উপাধি ব্যবহার করলেও এদের ভাষা মুন্ডারীদেরই ভাষা।

মাটি এবং মাটি খোঁড়ার কাজে এরা দক্ষ। পুকুর কাটা, কূয়ো খোঁড়া, রাস্তাঘাট তৈরী করা এবং মাটির দেয়াল তৈরীতে এরা দক্ষ হলেও বর্তমানে এদের অনেকেই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত।

সাধারণত নির্জন এলাকাতেই ছোট ছোট ঘর তৈরী করে বসবাস করে এরা। তুলসীমঞ্চ থাকে প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই। গৃহপ্রবেশের সময় প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

ধান বোনার আগে এরা 'মুঠ' বলে একটা অনুষ্ঠান করে থাকে। প্রথমে চাষী এক মুঠ ধান নিয়ে মাঠে যায়। চষা জমির চারপাশে ঐ মুঠো ধান ঘুরিয়ে ঘরে নিয়ে আসে এবং পরের দিন বলদকে স্নান করিয়ে কপালে ও শিঙে সিঁদুর মাখিয়ে ধান বোনার কাজ শুরু হয়। গ্রামঠাকুরের কাছে ফসলের জন্য মানত করাও হয়ে থাকে।

কোড়াদের কৃষি সম্পর্কিত আরেকটা উৎসব হলো 'জানতাল'। ধান কাটার আগে কোড়ারা এই উৎসব করে থাকে। গ্রামঠাকুরের পূজো হয়। মোরগ বলি দেওয়া হয় ও মোরগের রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রামঠাকুরের থানের ওপরে। গ্রামঠাকুরের কৃপা প্রার্থনাই 'জানতাল' উৎসবের লক্ষ্য।

এরা শিকারেও পটু। বছরের একটা বিশেষ দিনে এরা দলবদ্ধ হয়ে তীর ধনুক, বর্শা, লাঠি, কুঠার নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ে। ৭ই, ১৪ই অথবা ২১শে বৈশাখ তারা শিকারে যায়। ঐ শিকার উৎসবকে তারা বলে 'বীরসেন্দ্রা'।

জন্মগ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা ধরনের ছোটখাটো উৎসব অনুষ্ঠান ও পারিবারিক প্রথার মধ্য দিয়ে কোড়াদের জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে।

সাধারণত বাবা মায়ের পছন্দ অনুযায়ীই ছেলে মেয়েদের বিয়ে থা হয়ে থাকে। বিধবা তার স্বামীর ভাইকে বিয়ে করতে পারে। একে বলে 'সাঙ্গা'। আজকাল অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিয়ে থা হচ্ছে। বাবার সম্পত্তি পায় ছেলে মেয়েরা। মেয়েরা ভরণপোষণ পায়। কোনো ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি পায় মেয়ে।

শীতলা, শিব-দুর্গা, কালী-মনসা, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ভাদু, ভৈরব ঠাকুর এবং গ্রাম দেবতারো পূজো করে থাকে এরা। পূজোয় ছাগল-পায়রা মোরগ প্রভৃতি বলি দিয়ে থাকে। এদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত।

(গ) দ্রাবিড় গোষ্ঠী : মোঙ্গলীয় ও আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠী ছাড়াও দ্রাবিড় গোষ্ঠীরও দুটি উপজাতি বসবাস করে উত্তরবঙ্গে। এরা ওঁরাও ও মাল পাহাড়িয়া।

(১) ওঁরাও : উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এরা। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন এরা দাক্ষিণাত্যের লোক। আবার কেউ কেউ মনে করেন এরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের আদি বাসিন্দা। এদের পূর্বপুরুষদের টোটেম হলো হনুমান। ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা নিজেদের 'কুরুখের বংশধর বলে দাবী করে থাকে।

ওঁরাওদের ব্যবহৃত 'ওরগোরা' শব্দ থেকেই ওঁরাও শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো বাজপাখী এবং বাজপাখী ওঁরাওদের অন্যতম টোটেম।

সমতল অঞ্চলের ওঁরাওরা যেমন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত তেমনি পার্বত্য এলাকার ওঁরাওরা চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা জড় উপাসক হলেও কালী-হরি, শিব, মনসা, দুর্গা ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীরও পূজো করে থাকে। বাধ্না, ছাতিয়া, চড়ক, নবান্ন, সরাহু, ফাগুয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎসবও পালন করে থাকে তারা।

ওঁরাওদের আদি ভাষা কুরুখ। সাদরী ভাষায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বার্তা চালায় এরা। তবে বাংলা ভাষাতেও কথা বলে এরা আজকাল।

(২) মালপাহাড়ী : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাতেই মালপাহাড়ীদের বেশীর ভাগ লোক বাস করলেও মালদহ্‌ এবং উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরেও বহু সংখ্যক মালপাহাড়ী বসবাস করে।

মালপাহাড়ীদের একটি লোক কাহিনী থেকে এদের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায় যে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলে রাম লক্ষ্মণ ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাদের ঘামের ময়লা থেকে জন্ম নিল এক পুরুষ ও রমণী। এরাই হলো মালপাহাড়ীদের আদি পিতা ও মাতা।

অন্য একটি লোককথা অনুসারে জানা যায় যে ঈশ্বর প্রথমে চার জোড়া দম্পতিকে পাঠালেন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির জন্য। পৃথিবী তখন কাদার মতো নরম থাকায় ঐ দম্পতিরা পাহাড়েই বসবাস করতে লাগলো। তারা ঈশ্বরের কাছে আরো চারজোড়া দম্পতিকে পাঠানোর জন্য প্রার্থনা করলে ঈশ্বর কুশ থেকে আরো চারজোড়া দম্পতি সৃষ্টি করলেন। ঐ আটজোড়া দম্পতি থেকেই সৃষ্টি হলো মালপাহাড়ীদের আটটি গোষ্ঠী।

'মাল' শব্দের অর্থ বীর বা শক্ত সমর্থ মানুষ। আবার 'মাল' শব্দের অর্থ পাহাড়ী মানুষও হয়। এরা বনপাহাড়ে সুখেই ছিল। কিন্তু বৃটীশরা যখন থেকে বন-পাহাড়ের দখল নিতে শুরু করলো তখন থেকেই এরা সমতলে নেমে এসে জীবিকার তাগিদে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। কেউ কেউ লেগে গেল চাষের কাজে। জমির মালিক ও জোতদাররা বসবাসের জায়গাও দিল এদের। বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য অংশ থেকে এরা ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের নানা অংশে।

ধর্মবিশ্বাসে এরা জড় উপাসক হলেও বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীরও পূজো করে থাকে। সূর্য্য, বসুমতী, মনসা, ধর্ম ও চড়ক পূজায় এদের উৎসাহের অন্ত নেই।

এদের আদি মাতৃভাষা 'মালতো' দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। কিন্তু উত্তরবঙ্গে এরা প্রধানত সদরী ও বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।

রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে সাধারণত ছেলেমেয়েদের বিয়েতে আপত্তি করা হয় না। বিধবা তার মৃত স্বামীর ভাইকে বিয়ে করতে পারে। কন্যাপণ চালু আছে মালপাহাড়ীদের মধ্যে। ঘটকের মাধ্যমেই বিয়ে ঠিক হয়। বাবা মার পছন্দই শেষ কথা। তবে ভাবভালবাসার বিয়েও যে হয় না তা নয়। ঘটককে এরা বলে 'সিটহু'।

পিতার মৃত্যুর পরে ছেলেদের মধ্যে সমান ভাগে সম্পত্তি ভাগ হয়। বিবাহিত কন্যা কোন ভাগ না পেলেও অবিবাহিতা কন্যা বিশেষ একটা ভাগ পেয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়ে না থাকলে বিধবা স্ত্রীই সব সম্পত্তির মালিক হয় তবে বিধবা যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাহলে মৃতের সম্পত্তি পায় মৃতের ভাই বা ভাইএর ছেলেরা।

(৩) অন্যান্য তপশীল জাতি ও উপজাতি : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ঐসব প্রধান প্রধান তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাড়াও ভূঁইয়া, দোয়াই, কাউর, মাল, সার্কি, খেন, মোরঙ্গী, গোঁড়ি, পাণিকোচ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস যেমন আছে সমতলে তেমনি দার্জিলিঙের পাহাড়ী অঞ্চলে লিম্বো, গুরুং, মনজার, তামাং, নেওয়ার, সুনওয়ার, রাই, ছেত্রী, শেরপা দামাই প্রভৃতিরাও বসবাস করে।

(৪) বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় : তপশীল জাতি-উপজাতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বসবাস করছে এক বিরাট সংখ্যক বাঙালী ও অবাঙালী বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়।

উত্তরবঙ্গে বৃটিশযুগে চা শিল্প গড়ে ওঠার সূত্রে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উনবিংশ শতকে বহু বর্ণহিন্দু উত্তরবঙ্গে ব্যবসা ও চাকরীর উদ্দেশ্যে এসে বসবাস শুরু করে। এর পর দেশ বিভাগের সময় সীমান্তবর্তী জেলা গুলো থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তু এসে ভীড় করে এই অংশে। আবার বিভিন্ন সময়ে আসাম থেকে বিতাড়িত হয়েও বহু লোক উদ্বাস্তু হয়ে প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গে।

এছাড়া ব্যবসা ও চাকরীর সূত্রে বহু গুজরাটী, মারাঠী, বিহারী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, রাজস্থানী ও অন্যান্য প্রদেশের লোকজনও বসবাস করছে এই অংশে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের লোক সংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। তপশীল জাতি-উপজাতি বর্ণ হিন্দু সকল সম্প্রদায়েরই জনসংখ্যা বেড়েছে অসম্ভব হারে। আর মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা তো বেড়ে চলেছে সেই তুর্কী আমল থেকেই।

(৫) উন্নত যোগাযোগ ও সংস্কৃতি : বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। গঙ্গার ওপরে ফারাক্কাব্রীজ তৈরী হবার ফলে ও উত্তরবঙ্গে অন্যান্য ব্রীজ হবার ফলে বাসে ও ট্রেনে যোগাযোগ বেড়েছে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর ও গঞ্জ। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, ইসলামপুরের মতো ছোট বড় শহর গড়ে উঠেছে সব জেলাগুলোতেই। আর বিস্তৃতি ঘটেছে বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, মালদহ, কুচবিহার এবং শিলিগুড়ির মতো জেলা শহরগুলোর। শিলিগুড়ি তো আজ উত্তর পূর্বভারতের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। গঞ্জ ও শহরের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে বহুশিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু স্কুল কলেজ। গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরবঙ্গের শহর-গঞ্জে আজ নানাবহিরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেলেও কৃষি নির্ভর গ্রামীন জীবন ধারায় আধুনিক সংস্কৃতির চটুল চমক প্রাচীন লোক সংস্কৃতিকে এখনো পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি বলেই আজো কিছু কিছু লোক সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদানের সন্ধান মেলে এই উত্তরবঙ্গে।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(1) Anthropology on the March— A.K. Mukherjee.
(2) Tribes and castes of Bengal Ethnographic glossary- Z. Risley.
(3) Hand book of scheduled castes and scheduled Tribes of West Bengal- A.K. Das.
(4) The Ravas of West Bengal- B. C. Roy.
(5) Descriptive Ethnology of Bengal- (E.T (Dulton. II)
(6) The oraons of Chotonagpur (S. C. Roy)
(7) Lepchas of West Bengal- B.C. Roy
(8) Raj bans is of West Bengal- B.K. Roy choudhary and M. K. Raha.

উত্তরবঙ্গের ভাষা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একের পর এক বহু মানবগোষ্ঠী প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গে। কোন গোষ্ঠী চলে গেছে বা বিতাড়িত হয়েছে অন্য গোষ্ঠীরদ্বারা। কোন গোষ্ঠী থেকে গেছে। এভাবেই একদা এখানে এসেছে নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপাইনগোষ্ঠীর মানুষ। এসেছে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক। ঘটেছে আর্যসভ্যতার বিস্তার। হয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার। হয়েছে ইসলাম অভিযান। বৃটিশ যুগে চাশিল্পের সূত্রে এসেছে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক। দার্জিলিং, কালিম্পং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবার সূত্রে এসেছে নেপালী, ভূটিয়া, লেপচা প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মানুষ। চাবাগান ও অন্যান্য চাকরীর সূত্রে এসেছে বাংলার অন্যান্য অংশ থেকে বহু বাঙালী। দেশভাগের ফলে এবং আসামের আন্দোলনের ফলেও বহু বাঙালী এসেছে এই অংশে দফায় দফায়। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে ভারতের নানা প্রান্ত থেকেও বহুলোক এসেছে উত্তরবঙ্গে।

উত্তরবঙ্গ আজ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সত্যিই যেন এক ক্ষুদে ভারতের প্রতিচ্ছবি। এখানে প্রাচীন ও নবীন, সনাতন ও আধুনিক, গ্রাম ও নগর কেন্দ্রিক জীবনধারার এক বিচিত্র সহাবস্থান। এখানে যেমন দেখা যায় আদিম যুগের মানব সন্তানকে তেমনিই দেখা যায় অতি আধুনিক মানব সন্তানকেও। এক দিকে আধুনিক সভ্যতার চোখ ধাঁধানো চটুল সংস্কৃতি অন্যদিকে নিভৃত গ্রাম প্রান্তে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ধারা। বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে, গাঁয়ে গঞ্জে, পাহাড়ে ও শহরে পূজা পার্বণে, উৎসব-অনুষ্ঠানে বয়ে চলেছে বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সুর! বৈচিত্র্যের মধ্যে চলেছে মহামিলনের মহাসঙ্গীত।

এই পটভূমিতে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে বিশাল ভারতবর্ষে যে মূল চারটি ভাষা গোষ্ঠী প্রচলিত সেই আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় ভাষার সবকটিই প্রায় প্রচলিত আছে উত্তরবঙ্গে। বাংলা, হিন্দী, নেপালী, সাঁওতালী, কুরুখ, উর্দু, মুন্ডা, বোড়ো, লেপচা, ওড়িয়া, রাভা, তিব্বতী, ভোটিয়া, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি ভাষাভাষী লোক যেমন আছে তেমনি সংখ্যায় অল্প হলেও শবর, তেলেগু, কোড়া, অসমিয়া, মালয়ালম, তামিল, মারাঠী, গারো, ভূমিজ, গুজরাটী, কন্নড়, গোন্ডী, চীনা, ডোগরী, কোচ, খাসি, মণিপুরী, কোঙ্কনী, মিজো, ভিলি, কুর্গী, নাগা ও অন্যান্য ভাষাভাষী লোকও আছে এই অংশে।

তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেসব ভাষা ব্যবহার করে তা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গের সংখ্যা গরিষ্ঠলোক ব্যবহার, করে বাংলা ভাষা। তার পরেই যথাক্রমে হিন্দি, নেপালী, সাঁওতালী, কুরুখ/ওঁরাও ও উর্দুর স্থান।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় বাংলা ভাষীর সংখ্যা ছিল ৫৪,২৯,১৯৬ জন। ঐ সময়ে হিন্দী ভাষীর সংখ্যা ছিল ৫,৯৭,৮৮৩ জন। নেপালী ভাষীর সংখ্যা ছিল ৫,৭৮,৫২৫ জন। সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা ছিল ৩,১৮,০৭০ জন। কুরুখ বাওঁরাও ভাষীর সংখ্যা ছিল ১,৯৩,০৭৫ জন, উর্দুভাষীর সংখ্যা ছিল ১,৪৩,৬৮৫ জন।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলা ভাষীর সংখ্যা যেমন লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিগত তিরিশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনিই বেড়েছে অন্যান্য ভাষীদের সংখ্যাও। কিন্তু এই বৃদ্ধি যেসব ক্ষেত্রেই সমানুপাতিক হারে হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সমীক্ষার।

উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষীদের মধ্যে নানাস্তর রয়েছে। এস্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্তরটি হলো রাজবংশী, পোলিয়া, নানাশ্রেণীর বর্ণ হিন্দু, মুসলমান ও বিভিন্ন তপশীল উপজাতির ব্যবহৃত ভাষা। এদের ভাষা হলো একটি আঞ্চলিক উপভাষা যা কামরূপী উপভাষা বলেই পরিচিত।

দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে চাকরীর সূত্রে যেসব বাঙালী পশ্চিম-মধ্য-পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে এসে দীর্ঘকাল বসবাস করছে তাদের ব্যবহৃত ভাষা। এরা অবশ্য প্রয়োজনে কামরূপী ও রাঢ়ী উপভাষাও ব্যবহার করে।

তৃতীয় স্তরে রয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালী শরণার্থীদের ভাষা। অবশ্য এরা বাড়ীতে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করলেও বাইরে কামরূপী ও চলতি বাংলাতেও কথা বলে থাকে।

তবে দীর্ঘ কাল একত্রে বসবাস করার ফলে উত্তর বাংলার বাংলা ভাষীদের মধ্যে যেমন মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি তাদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও মিশ্রণের প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘকাল ধরেই। এই প্রসঙ্গে ডঃ নির্মল দাস যথার্থই বলেছেন— "দীর্ঘ দিনের পারস্পরিক সহবাসের ফলে উত্তরবঙ্গের বাংলার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সংক্রমণ নিশ্চয়ই ঘটেছে ও ঘটে চলেছে। তবে তার মাত্রা আজও নির্ণীত হয়নি, কারণ, এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক (Macro)ও নিবিড় (Micro) ভাষা সমীক্ষা।"

উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ—পৃষ্ঠা-১২
১ম সং—১৯৮৪, ডঃ নির্মল দাস।

উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষা জনগণের প্রথম স্তরের ভাষাকে গ্রীয়ারসন সাহেব 'রাজবংশী' উপভাষা বলে চিহ্নিত করলেও ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই উপভাষাকে বলেছেন 'কামরূপী উপভাষা। এই উপভাষাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় 'রাজবংশী' উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করার দাবী জানালেও এই দাবী মানা যায় না কেননা ঐ উপভাষাতে শুধু রাজবংশীরাই কথা বলে না পোলিয়া, তপশীল উপজাতি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের মুসলমান এবং বর্ণহিন্দুরাও ঐ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। উত্তর বঙ্গের বৃহৎ গোষ্ঠীর ব্যবহৃত এই বাংলা ভাষা আসলে বাংলারই একটি উপভাষা মাত্র। ভাষা তত্ত্ববিদগণের অভিমত হলো এই উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকেই কালক্রমে বিশেষ পরিস্থিতিতে অসমীয়া ভাষা স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের রূপটি উত্তরবঙ্গের এই উপভাষার মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে আজো লক্ষ্য করা যায় বহুক্ষেত্রেই।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) রাজবংশী অভিধান— নীরেন বর্মন।
(২) উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ— ডঃ নির্মল দাস।
(৩) Linguistic survey of India— E. T. Dalton.
(৪) চোমেংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ— চোমেংলামা।

উত্তরবঙ্গ ধর্মসাধনা

প্রাগার্য ধর্ম :

বাংলার অন্যান্য অংশের মতো প্রাগার্য যুগে উত্তরবঙ্গের আদিবাসিন্দারাও মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। মন্ত্র এবং ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির সঙ্গে নানা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া কর্মেও ছিল তাদের গভীর আস্থা। প্রকৃতি এবং মানুষের সৃজন ক্ষমতাকে তারা পূজা করতো। লিঙ্গ পূজা করতো, টোটেমের প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। আকাশ-নদী, বৃক্ষ, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য ও ভূমির ভিতরে নিহিত শক্তির পূজা করতো। রোগ-শোক, দুর্ঘটনাদির পিছনে অশুভশক্তির হাত আছে মনে করে প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতো। বলি দিত। দেব-দেবীর কৃপা প্রার্থনা করতো। ছিল নানাবিধ নিষেধ এবং বিচিত্র সব ধর্মীয় আচার ও আচরণ আর এই সবকিছুর সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল উত্তর বাংলার প্রাগার্য যুগের ঐকান্তিক ধর্ম সাধনা।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম :

বাংলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে কালক্রমে আর্য্য সভ্যতার যখন বিস্তৃতি ঘটলো উত্তরবঙ্গে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গবাসীরাও ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করলো। ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংঘাতের পরিবর্তে লক্ষ্য করা গেল একটা মিশ্রণের ভাব। নবপত্রিকা, চড়ক, গাজন, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি প্রভৃতি প্রাগার্য ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলো যেমন আর্যরা গ্রহণ করলো তেমনিই সুবচনীর পূজো, আটকৌড়ি, ষষ্ঠী পূজো, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান, গুটি খেলা, দধি মঙ্গল ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান গুলোও গ্রহণ করলো।

মোটামুটি বলা যায় গুপ্তযুগ থেকেই বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে— "এই অনুমান নিঃসংশয় যে পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই ধর্মের দেবদেবীরা পূজিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেছেন, আনিয়া বসবাস করাইতেছেন এবং অযোধ্যাবাসী ভিন্ প্রদেশীরাও আসিয়া এই দেশে মন্দির সংস্কার করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন। যেসব ব্রাহ্মণরা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বেদবিদ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও আছেন।"

বাঙালীর ইতিহাস প্রথমপর্ব ২৫৯ পৃষ্ঠা
১ম সংস্করণ। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

জৈনধর্ম :

অবশ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের পূর্বেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল উত্তরবঙ্গে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই জৈনধর্ম উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন

ও কোটিবর্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিউয়েন সাং বাংলায় বহু জৈন ভিক্ষুদের দেখেছিলেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে একটি জৈন বিহারও ছিল। কিন্তু পাল যুগের পূর্বেই জৈন প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে এই অংশে।

বৌদ্ধধর্ম :

জৈন ধর্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। হিউয়েন সাং পুন্ড্রবর্ধনের কুড়িটি বিহারে তিনশোরো বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাস করতে দেখেছিলেন। পাল যুগে বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম পাল যুগে বজ্রযান ও তন্ত্রযানে পরিণত হয় এবং কালযান ও সহজযান নামে বজ্রযানের দুটি শাখা আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালী 'লুইপাদ' ছিলেন এই সহজযানের প্রবর্তক। এই সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম গুরুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে নানা অনাচারে ভরে গেল। ওদিকে তন্ত্র সাধনাতেও দেখা দিল অনাচার। ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেল বৌদ্ধ বিধি বিধানগুলো।

বৌদ্ধ ধর্মের এই অবক্ষয়ের সময়েই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মও রীতি মতো যে প্রাধান্য পেয়েছিল তার প্রমাণ হলো অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের আবিস্কৃত মূর্তি ও লিপি সমূহ।

প্রকৃতপক্ষে তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রায় সমান তালেই চলেছিল। শৈব-বৈষ্ণব ও সৌর প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সদ্ভাবও ছিল। উত্তরবঙ্গের রাজসাহী এবং দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্তিগুলো থেকে বোঝা যায় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পাশপাশি সৌর ধর্মও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল উত্তরবঙ্গে এক সময়।

নাথধর্ম :

একদা নাথ ধর্মও উত্তরবঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নাথপন্থীরা যে মীননাথকে নিজেদের আদিগুরু বলে মনে করেন সেই মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন উত্তরবঙ্গের রংপুরের রাজা গোপীচন্দ্রের সমসাময়িক। নাথগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতা এবং গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে বহুগ্রন্থ। কিন্তু নাথধর্ম শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারেনি। বর্তমানে নাথপন্থীদের সকলেই প্রায় 'যুগী'।

ইসলাম :

তুর্কী আমলে পীর দরবেশরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসে নিম্নশ্রেণীর গরীব ও অবহেলিত নরনারীকে নানাবিধ ভোজবাজি ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে লেগে গেল। অবশ্য হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভন্ডামি এবং অত্যাচারের ফলেও অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীও বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। কিছু বৌদ্ধ হিন্দুও হলো। বাকীরা পালালো নেপাল ও তিব্বতে। তুর্কী আমল এবং পরবর্তী মুসলিম আমলেও সুদীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গেই শাসনকেন্দ্র থাকার ফলে হুহু করে এই অংশে বাড়তে থাকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা।

খৃষ্টধর্ম :

পরবর্তী কালে বৃটিশরা এদেশের শাসনভার নেবার পরেই শুরু হয় খৃষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপক আয়োজন। নিম্ন বর্ণের সঙ্গে বহু উচ্চবর্ণের নরনারীও গ্রহণ করলো খৃষ্ট ধর্ম। তবে উত্তরবঙ্গে মূলতঃ আদিবাসীদের মধ্যেই খৃষ্টধর্মের প্রভাব বেশী।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পরেই রয়েছে মুসলমানগণ। তবে জড়বাদী, খৃষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কম নয়। একদিকে যেমন দেখা যায় মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ও গুম্ফা তেমনিই দেখা যায় লৌকিক দেবদেবীর 'থান'। পাথরে-পাহাড়ে, বৃক্ষমূলে অরণ্যে ও নদীতীরে ছড়িয়ে আছে আদিবাসী ও জড়বাদীদের ধর্মীয় স্থান। উত্তরবঙ্গে একদিকে যেমন চলেছে সাকার মূর্তির উপাসনা তেমনিই চলেছে নিরাকার উপাসনা ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা অর্চনাও।

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গবাসীদের মধ্যে যে সহনশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যায় তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই অংশে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরন করে থাকে। মুসলিম-খৃষ্টান ও বৌদ্ধরা যেমন তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্মপালন করে থাকে ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান করে তেমনই হিন্দুধর্মাবলম্বী ও জড় বাদীরাও করে থাকে।

উত্তরবঙ্গের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিধিবিধান যেমন পালিত হতে দেখা যায়, তিথি-নক্ষত্র বিচার করে স্নানাহার, দান, ব্রত, তীর্থযাত্রা, পূজাপার্বণ উৎসব ইত্যাদি চলে তেমনই বিভিন্ন তপশীল জাতি ও উপজাতিদের মধ্যেও চলে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও প্রতীক পূজা, চলে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক উৎসব ব্রত, স্ত্রী আচার ও পালা পার্বণ ইত্যাদিও।

উত্তরবঙ্গ বাসীদের ধর্মীয় সংস্কার, পূজাপার্বণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাদের যাবতীয় লোকধর্ম ও লোকবিশ্বাস। প্রাগার্য যুগের উত্তরবঙ্গবাসীদের নানাবিধ সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, টোটেম, ট্যাবু, পূজা ও আচার অনুষ্ঠানের ওপরে পরবর্তীকালে পড়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব। বৌদ্ধ-জৈন ও তন্ত্রসাধনার প্রভাবও পড়েছে। এভাবেই বহু যুগ ধরে প্রাগার্য ধ্যান ধারণাও ধর্মাচারের সঙ্গে বৈদিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মাচার এমন ভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে যে তাদের আজ আর পৃথক করে বিচার করার অবকাশ নেই।

আবার উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি, সত্যনারায়ণ ও পীরের পূজা এবং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে পড়েছে ইসলামী প্রভাবও নানা ভাবেই।

এভাবেই উত্তরবঙ্গ বাসীদের ধর্মসাধনায় এসেছে বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সহনশীলতা।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার সামাজিক ইতিহাস— ডঃ অতুল সুর।
(২) হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
(৩) বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
(৪) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)— ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।
(৫) লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ— ডঃ দিগ্বিজয় সরকার।

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) লোক সংস্কৃতি
সংজ্ঞা—বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

(১) লোক সংস্কৃতির সংজ্ঞা :

সাধারণভাবে 'লোক সংস্কৃতি' বলতে আমরা বুঝি ব্যাপকতর জনসাধারণের জীবনচর্যার ব্যাপকতম ধারাকে যে ধারার মধ্যে দিয়ে সাধারণ নরনারীর ভাষা, জীবন ও জীবিকা, ধর্মবিশ্বাস, আচার আচরণ, ধ্যান-ধারণা, উৎসব অনুষ্ঠান, শিল্পকলা ও মৌখিক সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে থাকে।

গ্রামের সাধারণ নরনারীরাই লোক সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক। লোকসংস্কৃতির যেসব উপাদান বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসে সমাজ জীবনে এবং প্রাচীন কালের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে সেগুলোকে পরিপুষ্টও করে ঐ সাধারণ নরনারী গণই।

সংক্ষেপে বলা যায় লোকাচার, লোক-সংস্কার, লোকউৎসব, লোকনৃত্য, লোকধর্ম, লোকশিল্প ও লোক সাহিত্য ইত্যাদি যা সুদীর্ঘকাল ধরে একই সামাজিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যানুযায়ী বংশপরম্পরায় লালন করে থাকে বা অনুশীলন করে থাকে যা কোন বিশেষ কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে থাকে, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মৌখিক বা অলিখিত রূপ তাকেই 'লোকসংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(২) শ্রেণী বিভাগ :

বিখ্যাত লোক-সংস্কৃতি বিশারদ ডব্লিউ বসওয়েল সাহেব লোকসংস্কৃতিকে মোট চারভাগে ভাগ করেছেন—

(১) এ্যাকসান্, বা ভঙ্গী প্রধান, (২) সায়েন্স বা বিজ্ঞান নির্ভর, (৩) লিঙ্গুইস্টিক বা ভাষাভিত্তিক, (৪) লিটারেচার বা সাহিত্য নির্ভর।

(১) ভঙ্গী প্রধান বা এ্যাকসান্ বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন অনুকরণ এবং দৈহিক আলোড়নের শৈল্পিক ছন্দকে। 'গ্রাম্য খেলাধূলা', ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, রীতি-নীতি, প্রথা, আনন্দ অনুষ্ঠান, হাস্যপরিহাস, তামাসা, আকার ইঙ্গিত, মূকাভিনয় প্রভৃতিকে তিনি ফেলেছেন ভঙ্গী প্রধান বিভাগে।

(২) সায়েন্স বা বিজ্ঞান নির্ভর বিভাগে ফেলেছেন বিভিন্ন লোকবিশ্বাস যাদুবিদ্যা, লোকদর্শন, মিথ্, ধারণা, আশীর্বাদ, অভিশাপ, ভবিষ্যৎবাণী ও ভৌতিক কাহিনীকে।

(৩) লিঙ্গুয়িস্টিক বা ভাষাভিত্তিক বিভাগে ফেলেছেন লোকভাষা, উচ্চারণ বিধি, ধ্বনিধর্ম, উপভাষা, প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, কবিতা ধাঁধা, যাদুমন্ত্র, চিন্তাভাবনা ইত্যাদিকে।

(৪) লিটারেচার বা সাহিত্য বিভাগে ফেলেছেন গল্প, উপকাহিনী, গাথা, মহাকাব্য, নাটক, সঙ্গীত, কিংবদন্তী, মেলা বিবরণী ইত্যাদিকে।

অবশ্য লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়গুলো যে একে অপরের ওপরে নির্ভরশীল সেকথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

মার্কিন পণ্ডিত ডক্টর রিচার্ড, এম. ডরসন লোক সংস্কৃতির বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার জন্য তুলনামূলক নৃতাত্ত্বিক, জাতীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক, মনোসমীক্ষাগত এবং আঙ্গিক গঠনের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণের পক্ষপাতী।

কেউ কেউ আবার লোকসংস্কৃতিকে বস্তুগত এবং অবস্তুগত দিক দিয়েও বিচার করতে চেয়েছেন। (১) বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে লোকশিল্প, ভাস্কর্য, গৃহনির্মাণ, মন্দির, মূর্তি, আলপনা, পাত্র বা দেয়াল চিত্র, পোষাক পরিচ্ছদ ও যন্ত্রাদিকে রাখতে চেয়েছেন অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে বস্তু নির্ভর সংস্কৃতির আলোকে বিচার করতে চেয়েছেন। (২) অবস্তুগত বিষয়ের মধ্যে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, গল্প, প্রবচন, কবিতা, গাথা, নৃত্য, নাটক, উপকথা, রূপকথা, সঙ্গীত, হেঁয়ালী, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা, নাম, বিশ্বাস, উৎসব, পূজা, পার্বণ প্রভৃতিকে রাখতে চেয়েছেন।

(৩) বৈশিষ্ট্য :

লোকসংস্কৃতির যে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো হলো যথাক্রমে—

(১) লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মৌখিক ঐতিহ্য।

(২) দ্বিতীয়ত লোক সংস্কৃতির ধারাটি উত্তরাধিকার সূত্রে বংশপরম্পরায় একপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে চলে আসে।

(৩) তৃতীয়ত, লোকসংস্কৃতি স্থানু নয়। চলমান জনসাধারণের ভৌগোলিক স্থানগত পরিবর্তন হলেও এর অনুশীলন শেষ হয় না।

(৪) চতুর্থত, লোকসংস্কৃতি কোন বিশেষ কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। কাল থেকে কালান্তরে তার যাত্রা।

(৫) পঞ্চমত, লোকসংস্কৃতি প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্রস্থাপন করে।

(৬) ষষ্ঠত, লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে নিরক্ষর গ্রামীন মানুষদের দ্বারা এবং তারাই এর ধারক ও বাহক।

(৭) সপ্তমত, কোন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন চর্যার ব্যাপকতম ধারাটিই লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

(৮) অষ্টমত, ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লোকসংস্কৃতির কোন বিশেষ বিষয় সৃষ্ট হলেও কালক্রমে সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই তা গণ্য হয়ে থাকে।

(৯) নবমত, লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে লোকশিক্ষার ধারাটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

(১০) দশমত, বিভিন্ন লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার অনুসরণের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

(১১) একাদশত, নতুন নতুন বিষয়বস্তু এবং ধ্যান ধারণা ও রীতি নীতিও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লোক সংস্কৃতির ধারাটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখে।

(১২) দ্বাদশত, লোক সংস্কৃতিকে সাধারণ নরনারী ধরে রাখে তাদের স্মৃতিতে। আবার পরিপুষ্টও করে তারাই।

(৪) লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব :

কোন একটি দেশের লোক জীবন ও তার প্রাচীন ধারা বা ঐতিহ্যকে যথাযোগ্য ভাবে পর্য্যালোচনা করতে গেলে লোকসংস্কৃতির সাহায্য নিতেই হবে।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন সাধারণকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করার কাজ অনেক সহজতর হয়।

রাজনৈতিক ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রেও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলো নিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে উন্নততর সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টি হতে পারে অনায়াসেই।

জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও জাতীয় গৌরবের পুনরুত্থানে লোক সংস্কৃতিকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো শ্রেণী সংগ্রাম প্রসারে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, কোন দেশ বা জাতির শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ও সংস্কৃতির যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে গেলে লোকসংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলো যে কোন দেশ বা জাতিরই অতি গৌরবের সামগ্রী।

পশ্চিমের উন্নত দেশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তাইই আজ লোকসংস্কৃতি গুরুত্ব পাচ্ছে ভীষণ ভাবেই। দেরীতে হলেও বর্তমানে আমাদের দেশেও লোকসংস্কৃতি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে এবং লোক সংস্কৃতির চর্চাতেও এগিয়ে আসছেন আজ বহু বিদগ্ধ মানুষ।

(খ) লোকসংস্কৃতির সমন্বয় মিশ্রণ ও অবক্ষয়ের কারণ :

লোকসংস্কৃতির পরিধি এতই ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময় যে সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ভাষা বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক কিছুই কোন না কোনভাবে এর আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে। আসলে লোক সংস্কৃতি হলো কতকগুলো বিশেষ বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের সামগ্রিক যোগফল। ঐ সব উপাদানের রূপ ও প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে পড়ে কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে তেমনি আবার ভাবের আদান প্রদান ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এক অঞ্চলের সংস্কৃতি অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিতও হয়ে থাকে।

যখন কোন এক অঞ্চলের লোকজন অন্য এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে তখন ঐ সব নবাগতরা যেমন নতুন অঞ্চলের কৃষ্টি, আচার-আচরণ, সংস্কার, প্রথা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি নবাগতদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কার, আচরণাদি দ্বারাও ঐ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এইভাবেই যেমন গড়ে ওঠে মিশ্র সংস্কৃতি তেমনিই আবার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধও হয়ে থাকে।

আবার দেখা যায় কোন সংস্কৃতির আগ্রাসী চাপের ফলে অন্য সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ধ্বংসও হয়ে যায়। এভাবেই পৃথিবীর দেশে দেশে তথাকথিত নাগরিক সংস্কৃতির প্রবল তাড়নায় গ্রামীন লোকসংস্কৃতি আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যতই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে ততই দূরত্ব যাচ্ছে কমে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়া লাগছে গ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ও উৎসবকে তথাকথিত নাগরিক সংস্কৃতির চটুল চমক আজ প্রতিযোগিতায় ফেলে দিচ্ছে অনেক—অনেক পিছনে।

গ্রামের বহু উৎসব, ব্রত-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত, লোক নাটক ও লোকসংস্কৃতির বহু মূল্যবান উপাদান দ্রুত অবলুপ্তির পথে আজ! কুড়ি বাইশ বছর আগেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীরা গ্রামে যেসব ব্রতআচার ও উৎসব অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতো আজ তথাকথিত আধুনিক সভ্যতাও সংস্কৃতির চমক লাগানো আগ্রাসী পটভূমিতে তেমনভাবে করতে পারে না বা করতে চায়ও না। কেমন যেন সংকোচের আবর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তারা। এখন টিভি বা সিনেমা দেখার সুযোগ পাচ্ছে সুদূর গ্রামের নরনারীরা। পাচ্ছে নাগরিক সংস্কৃতির চোখ ধাঁধাঁনো বিনোদনের প্রচুর খোরাক! মাইকে চলছে হিন্দি গানের তাণ্ডব। আধুনিক পোষাকে সাজছে গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই। অবাধে উৎসবাঙ্গনে চলছে ডিস্কো-টুইস্ট এবং আধুনিক নাচ। গতির তাণ্ডবে আর ক্ষণিক চমকে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন দিনের লোক সংস্কৃতির যাবতীয় আবেগ আর

অবশ্য গ্রামীন লোকসংস্কৃতির দ্রুত অবক্ষয় বা অবলুপ্তির জন্য শুধু যে আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসী ভূমিকাই দায়ী একথা বলাও বোধ হয় ঠিক হবে না। এর পিছনে আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

বহু যুগ ধরে গ্রামগুলোতে গড়ে উঠেছিল কৃষি কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। ব্রত, পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে, বিদ্যুতের প্রসার ঘটেছে, শিল্পের প্রসার হয়েছে, রাস্তা ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, কলেজ বেড়েছে, বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছে সাক্ষরতার হার বেড়েছে, বেড়েছে বেকার, তীব্রতর হয়েছে জীবন সংগ্রাম, ব্যস্ততার অক্টোপাসে নাভিশ্বাস উঠছে গ্রামীন মানুষদেরো। দুতিন বার ফসল তুলতে হচ্ছে ঘরে, প্রয়োগ করতে হচ্ছে সেচ, উন্নত সার ও বীজ। ব্যবহার করতে হচ্ছে কীটনাশক, সাহায্য নিতে হচ্ছে ট্রাক্টরের। সর্বদা লেগে থাকতে হচ্ছে ফসলের ও জমির পিছনে, ছুটতে হচ্ছে হাটে বাজারেও। আবার যারা কৃষি মজুর তাদেরও লেগে থাকতে হচ্ছে কাজে। এখন দিনের পর যাত্রা,

নাটক লোকগীতি বা লোক উৎসবে মেতে থাকার সময় কোথায় ব্যস্ত গ্রামীন মানুষদের ? সময়ের দাম যে বেড়ে গেছে অনেক।

বিভিন্ন ব্রত পার্বণ এবং উৎসব অনুষ্ঠানের ঝোঁকও কমে এসেছে ঐ একই কারণে।

এখন গ্রামেই প্রাথমিক স্কুল হয়েছে। হাইস্কুলও হয়েছে গ্রামের কাছাকাছি এবং কলেজের সংখ্যাও বেড়েছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে যাচ্ছে। শিক্ষার আলোকে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির প্রতি ক্রমেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তারা। যাত্রা, গানে মন বসে না তাদের। লৌকিক খেলাধূলা, গল্প বা লোক নাটক ও লোকগীতি বা লোকনৃত্যে আজ আর তেমন আগ্রহ নেই তাদের।

সত্যি কথা বলতে কি আজ আধুনিক সভ্যতার দ্রুত বিস্তার এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, তীব্র জীবন সংগ্রাম, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুতের প্রসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ইত্যাদি নানাবিধ কারণেই গ্রামের সনাতন জীবন ধারায় লেগেছে ব্যাপক পরিবর্তনের ছোঁয়া এবং এর সার্বিক প্রভাব পড়েছে লোক সংস্কৃতির ওপরেও। আর সর্বোপরি নাগরিক সংস্কৃতির প্রবল তাড়নায় গ্রামীন লোকসংস্কৃতি কোণঠাসা হতে হতে আজ অবলুপ্তির দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি বিশ্বব্যাপী গ্রামীন লোকসংস্কৃতি আজ বিপন্ন। বিপন্ন ভারত বাংলা—তথা উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোক সংস্কৃতিও !

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী :

(১) Standard dictionary of Folk Lore.

(২) Folk lorists of Bengal— শঙ্কর সেনগুপ্ত।

(৩) Folklore of Bangla Desh— Ashrafsiddiki.

(৪) The science of Folklore— Alexander.

(৫) Folklore and folklife an introduction— Richard and Dorson.

(৬) Folk Literature, george/I.Russel.

(৭) লোকায়ত বাংলা— সুনীল চক্রবর্তী।

(৮) বাংলার সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।

(৯) বাংলার লোকসংস্কৃতি— আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি—বিষয় বৈচিত্র্য ও বর্তমান অবস্থা

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি :

প্রাগার্য যুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্য্যন্ত নানাবিধ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লব, উত্থান-পতন-জয়-পরাজয় ও শত দুর্য্যোগের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন তপশীল জাতি ও উপজাতি এবং বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী তাদের বৈচিত্র্যময় লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন-পালন করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। এই অংশে নগর ও গ্রামকেন্দ্রিক, উচ্চতর ও নিম্নতর এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়গতভাবে পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বরাবরই ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে।

আর্য সভ্যতা বিস্তারের কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে যেমন কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি আবার মুসলিম যুগে ইসলামী সংস্কৃতিও প্রভাব বিস্তার করেছে দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি, সত্যনারায়ণ পূজা ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় সহজেই।

আবার দেশবিভাগের পরে ওপার বাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে যারা উত্তরবঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেছে তারা যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এখানে এসেছে সেসবের চর্চাও করে চলেছে এই অংশে। ঐ সব সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবও উত্তরবঙ্গীয় সংস্কৃতিতে পড়েছে অবশ্যই।

সত্যি কথা বলতে কি দেশবিভাগের পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনাতেও এসেছে বৈচিত্র্যের ধারা। ওপার থেকে আসা বাস্তুত্যাগী মানুষরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপ এপারেও বজায় রেখেছে দেখা যায় বহুক্ষেত্রে। তারা মাঘীব্রত, কুলোচাপন, ইতুপূজো, পুণ্যিপুকুরব্রত, লক্ষ্মীপূজো ইত্যাদি নানাবিধ ব্রত ও পূজা পার্বণ যেমন পালন করে থাকে তেমনি বিভিন্ন ধরণের লোকগীতি যাত্রা বা পালাগান ইত্যাদিরো অনুষ্ঠান করে থাকে। আবার বাঁশের কাজে, মৃৎশিল্পে ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এনেছে তারা। পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-ব্যবহারেও উত্তরবঙ্গীয় সমাজে আজ লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্যের সমাহার।

সর্বোপরি আছে আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির চটুল চমকও ও তার সর্বগ্রাসী প্রভাব।

যুগযুগ ধরে এভাবেই উত্তরবঙ্গের তপশীল জাতি-উপজাতি-বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত পার্বণাদি নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠেছে এক বিপুল বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার।

(ক) বিষয় বৈচিত্র্য :

উত্তরবঙ্গের ছটি জেলায় যে সকল লোকসংস্কৃতির উপাদান শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজো টিঁকে আছে সংস্কৃতি প্রেমীদের কাছে তাদের আবেদন কম নয়। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, রাভাদের বাঁশী, গম্ভীরার উৎসব, আলকাপ, লোককথা, খেনের গান, রামায়ণ, মনসা ভাসান, মুখোস নৃত্য, লৌকিক দেবদেবীর পূজা উৎসব, মৈষাল গীতি, সাঁওতাল নাচ, লোক নাম, কীর্তন ও লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধাঁ, ও বিভিন্ন ব্রত পার্বণ লোক শিল্প ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির বহু বিচিত্র উপাদান আজো মুগ্ধ করে সংস্কৃতি প্রেমীদের।

উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির যে সকল উপাদান প্রচণ্ড জীবনী শক্তি নিয়ে আজো প্রকৃত সংস্কৃতি প্রেমীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) লোককাহিনী : যথা দেবীচৌধুরাণী, খেন রাজার কাহিনী, ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী, বাণ রাজার কাহিনী প্রভৃতি।

(২) লোকনাম : যথা গ্রাম-নাম, স্থান নাম, দীঘি বা নদীর নাম এবং ঐ সব নামের উৎস ও তৎসম্পর্কিত কাহিনী।

(৩) বিভিন্ন লোক উৎসব ও পূজানুষ্ঠান : যথা তিস্তা বুড়ীর পূজা, বুড়া ঠাকুর ও সাপকালীর পূজা, মশান কালীর পূজা, খেতিপূজা, কাণ পূজা, গ্রাম ঠাকুরের পূজা, মহারাজার পূজা, মদন কাম ও হুদুমদেও পূজা, বুড়ীমার পূজা, মহাকাল পূজা, সত্যপীর ও মানিকপীরের পূজা, মনসার পূজা, ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও উৎসবানুষ্ঠান।

(৪) পালা পার্বণ ও ব্রতানুষ্ঠান : যথা নবান, বাঁধনা, করম, জিতুয়া, পৌষপার্বণ, আষাড়ী, ফাগুয়া, পাতা, ছাতনা পরব, ইতু পূজা, শিবরাত্রির ব্রত, মহরম।

(৫) ছড়া ধাঁধাঁ ও প্রবাদ প্রবচন : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এগুলো যাদের মাধ্যমে জানা যায় উত্তরবঙ্গের লোক জীবনের রীতি নীতি ও বহু তথ্য।

(৬) লোকগীতি : যথা ভাওয়াইয়া, মৈষাল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, ও বিভিন্ন লোকগীতি।

(৭) পারিবারিক আনুষ্ঠানিক গীতি : যথা বিয়ের গান, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য জাতকর্মাদির গান।

(৮) পার্বণ সঙ্গীত : যথা নবান, ফাগুয়া, গাজন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যেসব গান গাওয়া হয়।

(৯) পূজাশ্রয়ী সঙ্গীত : যথা মনসা পূজা, ঈদ পূজা ও সত্যপীরের পূজা উপলক্ষ্যে গীত গান এবং কীর্তন ইত্যাদি।

(১০) রহস্যময় বা মিস্টিক সঙ্গীত : যথা দেহতত্ত্ব মূলক গান, বাউল, মুর্শিদি, মারফতী ইত্যাদি।

(১১) কর্মসঙ্গীত : যথা মাটিকাটা, কলপোতা, পাথর ভাঙা ও ধান কাটা বা ঝাড়ার গান ইত্যাদি।

(১২) বারমাসী বা প্রেম বিরহ গীতি।

(১৩) লোকনৃত্য : যথা মুখানাচ, গম্ভীরা নাচ, হুদুমদেও নাচ, সারিবদ্ধ নাচ, থালিনাচ, পাতানাচ, বিভিন্ন উপজাতীয় নাচ ইত্যাদি।

(১৪) লোকনাট্য : গম্ভীরা, আলকাপ, খেনের গান, সত্যপীরের পালাগান, বিষহরির পালা বা ভাসান, রামায়ণ গান, ইত্যাদি।

(১৫) লোকশিল্প : যথা সূঁচি শিল্প, মনসার পট, শোলার কাজ, দেয়াল চিত্র, মুখোস, আলপনা, কাঁথা, বাঁশ, বেত ও মাটির শিল্পকাজ, দারু শিল্প, মূর্তি শিল্প।

(১৬) লোকভাষা : উত্তরবঙ্গের মূলভাষা বাংলা হলেও বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ও আঞ্চলিক পার্থক্য চোখে পড়ে। ভাষার মিশ্র রূপটিও চোখে পড়ে বহু ক্ষেত্রে। উপজাতীয়দের ভাষা এবং লেপচা, ভূটিয়া, গুরুং ও নেপালীদের ভাষাও কম বৈচিত্র্য পূর্ণ নয়।

(১৭) রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোক সংস্কৃতির উপাদানও ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে।

(১৮) লোকমেলা : উত্তবরঙ্গের লোক মেলাগুলিও লোক সংস্কৃতির এক বিশাল ক্ষেত্র।

(খ) বর্তমান অবস্থা :

বাস্তব জীবনে উৎপাদনের মূল সূত্র ধরেই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকশিত হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের উৎপাদন ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরেই ছিল কৃষি কেন্দ্রিক। কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্যা। কিন্তু আজ সেই কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে! শিল্পের প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বিদ্যুতের বিস্তার হয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন গঞ্জ ও শহর। বেড়েছে স্কুল কলেজের সঙ্গে পড়ুয়ার সংখ্যাও। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে উত্তরবঙ্গের সাধারণ নরনারীর অনেক প্রাচীন রীতিনীতি, আচার আচরণ ও আদিম বিশ্বাস যেমন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে তেমনই নাগরিক সংস্কৃতির ব্যাপক চাপের মুখে উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতি আজ বিপন্নও হয়ে পড়েছে বহুক্ষেত্রেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বময় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে উত্তরবঙ্গের জনজীবনেও ঢেউ লেগেছে তার। তার পরে এসেছে দেশ বিভাগের যন্ত্রণা। ১৯৬২-৬৫-৩৭১ এর সীমান্ত যুদ্ধগুলো ভারতীয় অর্থনীতিতে যে পাহাড় প্রমাণ চাপ ফেলেছে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিও শিকার হয়েছে তার। ৭১এর যুদ্ধের পূর্বে ওপার থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে পশ্চিমবঙ্গ-আসাম ও ত্রিপুরায়। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে গেলেও অর্থনীতির ওপরে যে চাপ তখন সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব কিন্তু রয়ে গেছে পরবর্তীকালেও। এছাড়া আসাম থেকেও দফায় দফায় উদ্বাস্তুরা এসে ভীড় করেছে এই উত্তরবঙ্গে। এই সব নানাবিধ কারণে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে প্রবল অস্থিরতা এসেছে তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সাংস্কৃতিক জীবনেও।

যে অখণ্ড অবসরে একদিন উত্তরবঙ্গের আবালবৃদ্ধ জনতা রসিয়ে রসিয়ে যাত্রা-পাঁচালী-রামায়ণ গান কিংবা মনসাগান শুনতো কিংবা বিহ্বল হতো কীর্তনের আসরে বা লোকগীতির অনুষ্ঠানে অথবা নাতি নাতনীদের নিয়ে দাদু-দিদিমারা মশগুল হতো রূপকথা লোককথা বা ধাঁধাঁর আসরে সেই সময় আজ কোথায়? বিভিন্ন ব্রত পার্বণ ও লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানেই বা প্রচুর সময় ব্যয় করার অবকাশ আজ কোথায়? সুতীব্র জীবন সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে লৌকিক দেব দেবীর পূজা, ব্রত পার্বণ ও বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে খোলা মনে যোগ দেবার মানসিকতাই যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আজ ধীরে ধীরে।

স্বাধীনতা উত্তর উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ অনেক উন্নত। গঙ্গার ওপরে ফারাক্কাব্রীজ হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগও বেড়ে গেছে অনেক বেশী। গঞ্জ এবং শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগযোগও ক্রমেই নিবিড় হচ্ছে। চিত্ত বিনোদনের জন্য সহজেই গাঁয়ের মানুষ চলে যাচ্ছে গঞ্জ বা শহরের সিনেমা বা ভিডিও হলে। হিন্দী গানের জয়ধ্বনি উঠছে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিবাহ অন্নপ্রাশন এমনকি বিভিন্ন ব্রত পার্বণেও।

তথাকথিত নাগরিক সংস্কৃতির চটুল চমক আজ উত্তরবঙ্গীয় সমাজে এমনই প্রভাব ফেলেছে যে আলকাপ, খেনের গান কিংবা বিভিন্ন পালাগানও যাত্রার আসরেও হিট করা হিন্দী বা বাংলা সিনেমার গানের সুর নায়ক নায়িকার কণ্ঠে ধ্বনিত তো হয়ই উপরন্তু সিনেমার স্টাইলে চলে অঙ্গভঙ্গী এবং নৃত্যও।

উত্তরবঙ্গের খেলনা, বেত, মাটির ও বাঁশের কাজের কদরও যেন কমে আসছে ক্রমে। যান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে উত্তরবঙ্গের কুটীর শিল্প।

জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় গ্রাম গঞ্জের ছেলে মেয়েরাও প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, পূজা পার্বণ ও বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে ক্রমেই।

গ্রামের মেয়েরাও আজ বিভিন্ন পালা পার্বণ ও লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান এবং ব্রতাদি পালনের ক্ষেত্রে কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাব যেন আর নেই। ফলে কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও যেসব মেয়েলি অনুষ্ঠান তথা ব্রত-পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হতো উৎসাহের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আজ তাদের অনেক অনুষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে বা লুপ্ত হতে চলেছে। তবুও এখনো লোক সংস্কৃতির যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলোও সংখ্যায় কম নয়।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার লোক সংস্কৃতি— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(২) লোকায়তদর্পণে উত্তরবঙ্গ— ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার।
(৩) উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ— ডঃ নির্মল দাস।
(৪) লোকায়ত বাংলা— সুনীল চক্রবর্তী।
(৫) বাংলার সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান

(ক) উৎসবের তাৎপর্য :

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতীয়দের ধর্ম সাধনা ও সমস্ত উপাসনার মূলে রয়েছে সমাজ-দেশ ও বিশ্বের সকলেরই মঙ্গলকামনা। ভারতের ধর্মসাধনা ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষকে বৃহত্তর জগতের সকল মানব সমাজের সঙ্গে একীভূত হবার প্রেরণা দিয়েছে। উৎসবের দিনে সমস্ত রকম ক্ষুদ্রত্বের সীমা অতিক্রম করে বৃহৎ সীমায় বহুর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দেবার শিক্ষা দিয়েছে। উৎসবের দিনে তাইই ভারতবাসী ধর্ম-বর্ণ-ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে, ধনী-নির্ধনের ব্যবধান ভুলে, দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও দুঃখ বেদনাকে দূরে ঠেলে মেতে উঠেছে উৎসবের আনন্দে। হয়ে উঠেছে উদার-মহৎ এবং বিশাল-বিরাট।

বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বণ। বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চলে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ। স্মরণাতীত কাল থেকেই বাঙালী নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণের দিনে সমাজের সকল শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উপভোগ করে এসেছে উৎসবের আনন্দ। তাৎপর্যে মহান হয়ে উঠেছে উৎসবের দিনটি। বিশাল-বিরাট হয়েছে সবার হৃদয়।

(খ) উত্তরবঙ্গের উৎসব ও পূজা পার্বণ :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ সম্পর্কেও উপরের মন্তব্য সমান ভাবেই সত্য। উত্তর বাংলার উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ গুলোর দিকে একটু নজর দিলেই দেখা যাবে সাধারণত ভাদ্র থেকে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বেশীর ভাগ পূজা পার্বণ ও উৎসব। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যেসব পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা হাজারের বেশী। যদিও জেলাগুলির সব পূজা পার্বণ বা উৎসবাদিই যে পৃথক পৃথক তা কিন্তু নয়। তিথি বা মাসের হিসাবে যে সব পূজা পার্বণাদি হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সেগুলো আসলে একই পূজা পার্বণ তবে পূজা পার্বণ ও উৎসবের ধরণে বা ঐ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলার প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

(গ) জেলাভিত্তিক হিসাব :

এক দার্জিলিং জেলাতেই অনুষ্ঠিত হয় ১৩৮ টি বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ ও উৎসব। এর মধ্যে বৈশাখে ১০টি, জৈষ্ঠে ৪টি, আষাঢ়ে ৪টি, শ্রাবণে ৮টি, ভাদ্রে ৩টি, আশ্বিনে ১৪টি, কার্তিকে ১১টি, অগ্রহায়ণে ১৮টি, পৌষে ১৯টি, মাঘে ১৫টি, ফাল্গুনে ১৯টি, চৈত্রে ১৩টি। বিভিন্ন মেলাও বসে থাকে পূজা পার্বণ উপলক্ষ্যে।

কুচবিহার জেলায় ২২০টি বিভিন্ন ধরনের পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বৈশাখে ৪টি, জৈষ্ঠ্যে ২টি, আষাঢ়ে ৭টি, শ্রাবণে ৮টি, ভাদ্রে ১০টি, আশ্বিনে ২৪টি, কার্তিকে ২৩টি, অগ্রহায়ণে ৩১টি, পৌষে ৩২টি, মাঘে ৩০টি, ফাল্গুনে ১৯টি, চৈত্রে ৩০টি। ছোট বড় মেলাও বসে থাকে বহু।

জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ২০৫টি পূজা পার্বণ ও উৎসব হয়ে থাকে। বৈশাখে ৩টি জৈষ্ঠে ২টি, আষাঢ়ে ৪টি, শ্রাবণে ১৩টি, ভাদ্রে ১৯টি, আশ্বিনে ২৭টি, কার্তিকে ২১টি, অগ্রহায়ণে ১৭টি, পৌষে ১৯টি, মাঘে ১৯টি, ফাল্গুনে ৩১টি ও চৈত্রে ৩০টি বিভিন্ন ধরনের পূজা পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলাও বসে ঐ সব পূজা পার্বণ উপলক্ষ্যে।

মালদহে মোট ২৭৭টি বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ ও উৎসবাদি হয়ে থাকে। বৈশাখে ১২টি, জৈষ্ঠ্যে ৪টি, আষাঢ়ে ৩টি, শ্রাবণে ৪টি, ভাদ্রে ৭টি, আশ্বিনে ২৩টি, কার্তিকে ২৮টি, অগ্রহায়ণে ৩৩টি, পৌষে ৩৮টি, মাঘে ৩৯টি, ফাল্গুনে ৪১টি, এবং চৈত্রে ৪৫টি। মেলাও বসে।

আর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয় মোট ২৬৩টি বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ। বৈশাখে ১৪টি, জৈষ্ঠে ৭টি, আষাঢ়ে ৩টি, শ্রাবণে ৫টি, ভাদ্রে ২১টি, আশ্বিনে ৩১টি, কার্তিকে ২৮টি, অগ্রহায়ণে ৩৭টি, পৌষে ৩৯টি, মাঘে ৩১টি ফাল্গুনে ৩০টি এবং চৈত্রে ১৭টি পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে ছোট বড় মেলাও বসে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে এই সব পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের আবালবৃদ্ধ জনতার মধ্যে পড়ে যায় বিপুল সাড়া। ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেতে ওঠে উত্তরবঙ্গবাসী। বিশাল হয়ে ওঠে তাদের হৃদয়। বহুর মধ্যে মিলে মিশে এক হয়ে যায় তারা। উৎসব অঙ্গনে লোকগানে—লোকনৃত্যে হাসি আর গানে গানে বাদ্যের ঝংকারে মর্ত্যলোকে নেমে আসে স্বর্গের বৈভব।

(ঘ) বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ :

প্রাগার্য যুগ থেকেই উত্তরবঙ্গের নরনারীরা পালন করে আসছে বহুবিধ ব্রত পার্বণ। অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহু উৎসব ও মেলা। পূজাও হয়ে আসছে বহু দেবদেবীর। পরবর্তীকালে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েও বহু নূতন নূতন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে এই অংশে। আবার খৃষ্ট ধর্ম প্রসারের ফলে বেশ কিছু খৃষ্ট উৎসবও চালু হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। দেশ বিভাগের পরে ওপার থেকে আগত বাঙালীরাও চালু করেছেন নানা নূতন ধরণের পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান। এভাবেই উত্তরবঙ্গের পূজা পার্বণ ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এসেছে বৈচিত্র্য।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় এবং সম্প্রদায়গত দিক দিয়েও বিচার করে দেখা যেতে পারে। বর্ণ হিন্দুরা শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব হিসাবে যেসব পূজানুষ্ঠান করে থাকে সেগুলো হলো যথাক্রমে—

(১) বৈষ্ণব : লক্ষ্মী, নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বৈষ্ণব প্রধান পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে উত্তরবঙ্গে। অক্ষয় তৃতীয়া এবং অনন্ত চতুর্দশীতে যেমন অনুষ্ঠিত

হয় বিষ্ণু পূজা ও উৎসব তেমনি জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাস যাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণকেন্দ্রিক পূজানুষ্ঠান। প্রতি বৃহস্পতিবারেই লক্ষ্মীপূজা হয়ে থাকে ঘরে ঘরে। সত্যনারায়ণ পূজা তো অন্যতম জনপ্রিয় পূজানুষ্ঠান।

(২) শৈব : ফাল্গুনী চতুর্দশীর শিবরাত্রির উৎসবই সবচেয়ে বড় শৈব উৎসব। শিব মন্দিরে ঐ দিন চলে বিশেষ পূজা, উপবাস এবং শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন। তবে শাস্ত্রীয় পূজা উৎসব ছাড়াও শিবের লৌকিক রূপেরও নানা পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে যেমন চড়ক, গম্ভীরার পূজা উৎসব, গাজন, নীল পূজা ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন শিব মন্দিরে নিত্য পূজারও ব্যবস্থা আছে।

(৩) শাক্ত : দুর্গা, কালী, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণার সঙ্গে গঙ্গা দেবীর পূজাও হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গে বেশ হৈ হৈ করেই।

(৪) কার্তিক : প্রাচীন কাল থেকেই কার্তিক পূজা হয়ে আসছে উত্তরবঙ্গে। 'রাজতরঙ্গিনী'তে কার্তিক মন্দিরের উল্লেখ আছে। যাদুঘরে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত যে কার্তিক মূর্তিটি আছে সেটি পালযুগের। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে পাল যুগেও কার্তিক পূজা প্রচলিত ছিল এই অংশে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কুচবিহারের বিভিন্ন অংশে কার্তিক পূজা ব্যাপক ভাবেই হয়ে থাকে। অন্যান্য জেলাগুলোতেও কার্তিক পূজো হয়।

(৫) সূর্য্য : প্রাচীন কালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যে সূর্য্য পূজার প্রচলন ছিল তা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্তিগুলো থেকেই বুঝতে পারা যায়। বর্তমানে ইতু পূজা ও মাঘ মণ্ডল ব্রতাদি ঐ সূর্য্য পূজারই রকম ফের।

(৬) অন্যান্য পূজানুষ্ঠান : এইসব দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠান ছাড়াও ষষ্ঠী, গণেশ, বিশ্বকর্মা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির পূজানুষ্ঠানও হয়ে থাকে।

(৭) লৌকিক দেবদেবীর পূজা : বর্ণ হিন্দুদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের তপশীলীজাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের রাজবংশী পোলিয়া সাঁওতাল, ওঁরাও, মালপাহাড়ী, লেপচা ও অন্যান্যরা বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান করে থাকে যেমন মহারাজ, গ্রামঠাকুর, সাপকালী, মনসা, বুড়ীমা, ক্ষেত্রদেব, মশান কালী, গাভুরা, তিস্তাবুড়ী, মহাকাল, হুদুমদেব, সত্যপীর, মানিকপীর খেড়ী পূজা, বাঁধনা, করম, জিতুয়া, বোপূজা, সোনা রায়, ফাগুয়া, বসুমতী, চড়ক প্রভৃতির।

(৮) বৌদ্ধ : বুদ্ধ পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফায় নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠান করে এবং অন্যান্য তিথিতেও তারা নানাবিধ পূজানুষ্ঠান করে থাকে।

(৯) ইসলাম : উত্তরবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় ইদুজ্জোহা, ইদ, ইদলফিতর, উরস, সবেমিরাজ, মহরম ও গাজীর উৎসবে মেতে ওঠে নানাভাবে বছরের বিভিন্ন সময়ে।

(১০) খৃষ্ট উৎসব : খৃষ্টান সম্প্রদায়ও গুডফাইড্রে, বড়দিন, ইস্টারস্যাটারডে প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে নানাভাবে।

(১১) আবার **উত্তরবঙ্গের উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ গুলোকে ঋতু উৎসব, শস্যোৎসব, স্বজন্যোৎসব, বিপদতারণ উৎসব হিসাবেও বিভাগ করে বিচার করা যেতে পারে।**

(১) ঋতু উৎসব : বিভিন্ন ঋতুতে যেসব উৎসবানুষ্ঠান হয়ে থাকে সেগুলোকেই ঋতু উৎসবের পর্য্যায়ে ফেলা যায় যথা নববর্ষ, শারদীয় দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বিষহরি, ফাগুয়া প্রভৃতি। আবার বুদ্ধপুর্ণিমা, বড়দিন, ইদলফিতর, ইদুজ্জোহা প্রভৃতিকেও ফেলা যায় ঋতু উৎসবের পর্য্যায়ে।

(২) শস্যোৎসব : শস্য বপন থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত শস্যকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোকেই বলা যায় শস্যোৎসব যথা হুদুমদেও, আষাড়ী, করম, অম্বুবাচী, সহরায়, নবান, পৌষ পার্বণ, মাঘীব্রত ইত্যাদি।

(৩) বিপত্তারণ : বিভিন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে যেসব পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোই বিপত্তারণ উৎসব যথা— মনসা, সাপকালী, গেরাম দেবতা, শীতলা দেবী প্রভৃতির পূজা ও উৎসবানুষ্ঠান।

(৪) স্বজনোৎসব : যথা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাই ষষ্ঠী, জয়মঙ্গল চণ্ডী, হরিষচণ্ডী ইত্যাদি।

(৬) সন্তানোৎসব : সন্তান কামনা, সাধভক্ষণ, ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন, সুন্নত, হাতদাগা, নামকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি।

(ক) আবার গাজন, চড়ক, বাঁধনা, ইঁদ পূজা, ঝাপান, মহাকাল প্রভৃতি পূজা পার্বণ যেমন শুধু পুরুষদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয় তেমনই

(খ) সহেলা, দই উৎসব, ষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, বারুণীস্নান, অম্বুবাচী, মদনকাম, হুদুমদেও, সিঁদুরখেলা প্রভৃতি একান্ত মেয়েদেরই উৎসব।

(গ) অন্যদিকে কীর্তন দশহরা, ঝুলন, রথযাত্রা, রাস যাত্রা, জন্মাষ্টমী, হোলি, বড়দিন প্রভৃতিতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অংশ নিতে পারে।

(ঘ) আবার কৃষি ও শিল্প মেলা, পৌষ পার্বণ, নবান, পীরের মেলা, বড়দিন, গুডফ্রাইডে, বুদ্ধ পূর্ণিমা, লোকউৎসব, ও বারুণীস্নান প্রভৃতিতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। বাধা নেই কারো।

তবে পূজা পার্বণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পূজা পাঠ প্রভৃতি সব কিছুর সমন্বয়েই পূর্ণতা পায় বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি। আর এসবের পিছনে রয়েছে বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার প্রয়াস ও সকলের মঙ্গল কামনা, রয়েছে শস্য কামনা, আর রয়েছে বহুর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার বাসনা। পূর্ণ ও বিরাট হয়ে ওঠার আকাঙ্খা।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি— শঙ্কর সেনগুপ্ত।
(২) বাংলার পালাপার্বণ— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
(৩) হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
(৪) হিন্দুর দেবদেবী— ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

ধর্মচর্চায় উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী

(ক) ধর্ম :

ধর্ম হলো মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্খা-কামনা ও বাসনার আদর্শায়িত রূপ— যা মানুষের শুভবুদ্ধির বিকাশ ঘটায়, তাকে ধারণ করে। রক্ষা করে। মুক্তি দেয়। ধ্যান, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, পূজার্চনা প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যদিয়ে মানুষ পেতে চায় বাস্তবজগতের সমস্যা, পীড়ন ও দুঃসহ ভার থেকে মুক্তি। দুঃখে-বেদনায়-শোকে-যন্ত্রনায়-বিপদে আপদে শোষণে-বঞ্চনায় ও উৎপীড়নে মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখনই সে চায় দেবতার কৃপা। চায় মুক্তির পথ। দুঃসময়ে দেবতা অভয় দেন। দেন সান্ত্বনা। যোগান সাহস। দেন ভারবহনের ক্ষমতা।

ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ও যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়েই বিকশিত হয়ে থাকে ধর্মের পূর্ণ রূপটি। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ট-ইসলাম-শিখ-জৈন প্রভৃতি সকল ধর্মের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য।

হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা ও ধর্মীয় নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে একদিকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ও ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রয়াস যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে মহৎ এবং বৃহৎ হয়ে ওঠার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

(খ) লৌকিক ধর্ম :

লোকসংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো লৌকিক ধর্ম যার কেন্দ্রে রয়েছে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর পূজা অর্চনা। এদেশের সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর ধর্মাচরণের মূল ভিত্তি ভূমিই হলো লৌকিক ধর্মচর্চা।

কোন দেশ বা অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ ও তাদের পূজাচার পদ্ধতি বিচার করলে সেই দেশ বা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নৃতত্ব, জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব ও সংস্কৃতির আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মিলতে পারে সামাজিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্যেরও সন্ধান।

(গ) লৌকিক দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য :

বিভিন্ন দেশের লৌকিক দেবদেবী নিয়ে আলোচনা করলে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

প্রথমত, লৌকিক দেবদেবীরা শাস্ত্রীয় দেবদেবী নয়। কোন শাস্ত্রে উল্লেখ থাকে না এঁদের।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ অঞ্চলেই পূজিত হয়ে থাকেন সাধারণত লৌকিক দেবদেবীরা।

তৃতীয়ত, লৌকিক দেবী বা দেবতার পূজার মন্ত্র কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়। অঞ্চলভিত্তিক আঞ্চলিক ভাষাতেই সাধারণত যেসব মন্ত্র উচ্চারিত হয় তা অনেক সময় দুর্বোধ্যও হয়ে থাকে।

চতুর্থত, মূর্তি বা পূজার অনুষ্ঠানে কোন উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চোখে পড়ে না।

পঞ্চমত, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পরিবর্তে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই পুরোহিত নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

ষষ্ঠত, সব লৌকিক দেবদেবীরই নির্দিষ্ট মূর্তি থাকে না। শিলাখণ্ড, গাছ, ঢিবি ও অন্যান্য প্রতীকেও পূজা হয়ে থাকে।

সপ্তমত, দেবদেবীদের স্থান বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই গাছতলায়, নির্জন মাঠে বা চালাঘরে। কদাচিৎ মন্দিরের বেদীতে দেখা যায় তাঁদের।

অষ্টমত, গ্রামের সহজ সরল মানুষের অন্তরেই লৌকিক দেবদেবীর অধিষ্ঠান।

নবমত, লোক বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র সব লৌকিক দেবদেবী।

দশমত, লৌকিক দেবদেবীরা অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। এঁরা অভয় দেন, রক্ষা করেন, আয়ু, যশ ও অর্থ দেন। আরোগ্য দেন। সকলকে সুখে রাখেন।

একাদশত, দেশে দেশে লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে রচিত হয়েছে বহু কাব্য, ছড়া, গান, নাটকও ব্রতকথা। প্রচারিত হয়েছে তাঁদের মাহাত্ম্য।

দ্বাদশত, লৌকিক দেবদেবীদের পূজানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহুক্ষেত্রে শুরু হয়েছে লোক উৎসব ও লোক মেলার।

ত্রয়োদশত, লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যেই শুরু হয়েছে লোক নৃত্য। গড়ে উঠেছে লোক শিল্পও।

(ঘ) উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী :

উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক ধর্মচর্চায় লৌকিক দেবদেবীদের রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এঁদের বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের ধর্মচর্চার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য ও পূজাচারের আলোচনা করার চেষ্টা করবো এবার।

(১) 'বুড়ীমা' : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লৌকিক দেবী বুড়ীমার পূজা হয় বেশ আড়ম্বর করেই। দেবীর কোন বিশেষ মূর্তি নেই। খড়ো চালের মেটে ঘরেই 'বুড়ীমার' থান। যেসব গ্রামে বুড়ীমার পূজো হয় বুড়ীমাকে সেই সব গ্রামের গ্রামদেবী হিসাবেও মর্য্যাদা দেওয়া হয়। ভক্তদের কল্পনায় দেবী অতিবৃদ্ধা, থুড় থুড়ে কুঁজো বুড়ী। তাঁর চুল শণের মতো সাদা, হাতে লাঠি। অনেকটা চণ্ডীমঙ্গলের লহনা-খুল্লনা কাহিনীর ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীরই মতো। বুড়ীমার পাশেই মুখোস সাজানো থাকে।

বুড়ীমার পূজো অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। যেমন উত্তর দিনাজপুর জেলার 'বৈরহাট্টা' গ্রামে বুড়ীমার পূজো হয়ে থাকে কার্তিকমাসের শেষ বুধবারে। আবার

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত 'দেবীপুরে' বৈশাখ বা জৈষ্ঠ্য মাসের কোন এক সোমবার থেকে পরবর্তী সোমবার পর্য্যন্ত হৈ হৈ রৈ রৈ করে চলে বুড়ীমার পূজো। কোন মূর্তি নেই। ঘটেই পূজো হয়।

'বুড়ীমার' অসীম ক্ষমতা। তিনি আপদে বিপদে রক্ষা করেন ভক্তদের। বুড়ীমার কৃপায় ধনে জনে পূর্ণ হয় ভক্তের সংসার। পূর্ণ হয় ভক্তদের মনোবাসনা। বুড়ীমার পূজারী রাজবংশীদেরই মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পূজার মন্ত্র শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়। পূজানুষ্ঠানও একান্তই সাধারণ বাহ্যিক উপকরণের বাহুল্য নেই। অন্তরের ভক্তিই বড় কথা তবে ঘন্টা কাঁসর বাজে। ঢাকের বাদ্যি ও বাতাস কাঁপায়। দেবীর সম্মুখে মানত করা পাঁঠা বা পায়রা বলি দেওয়া হয়। ভক্তরা মুখোস পরে নাচেও দেবীর সম্মুখে।

মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'বুড়ীমার' পূজো প্রচলিত থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুড়ীমার পূজো ও উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। সকলে অধীর প্রতীক্ষায় থাকে ঐ পূজোর দিনটার জন্যে। পূজোর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও মুখোস নাচে মুগ্ধ হতে হয়। এই বর্তমান লেখক অন্তত মুগ্ধ হয়েছেন বেশ কয়েকবার বুড়ীমার পূজানুষ্ঠানে।

(২) মশানকালী : দুই দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে বছরের শেষ দিনে বেশ সাড়ম্বরে মশান কালীর পূজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৈরহাট্টা এবং কালিয়া গঞ্জের কাছে টুঙ্গাইল বিল পাড়া ও করদহে বেশ হৈ হৈ করেই মশান কালীর পূজো হয়ে থাকে।

দেবীর কোন বিশেষ মূর্তি নেই। থানের ওপরে ঘট রেখে ঐ ঘটকে নূতন গামছা বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ঘটে সিঁদুর লেপা হয়। সাধারণত ডোম, হাড়ি, বাউরি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই এই দেবীর পূজা প্রচলিত। পূজোর পুরোহিতও নির্বাচিত হন এদের মধ্যে থেকেই। পূজোর মন্ত্র অশ্লীল গালাগালি ছাড়া আর কিছু নয়। মজার কথা হলো পূজারী গালাগাল না দিলে নাকি দেবী জাগ্রতা হন না। গালাগাল শুনে ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী জেগে উঠে শত্রু নাশ করেন। রোগ ব্যাধি দূর করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও অকল্যাণের হাত থেকে দেবী সকলকে রক্ষা করেন। সুখ সম্পদ দান করেন।

পূজোর উপকরণ এবং আয়োজনও একান্তই সাধারণ মানের। কোন শাস্ত্রীয় নিয়ম বা বিধি মানার বালাই নেই মশান কালীর পূজোয়।

দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে পায়রা এবং পাঁঠা বলি দেওয়া হয়ে থাকে। বলিদান পর্ব শেষ হলে গায়েন তার দল বল নিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান গাইতে শুরু করে তাললয় সহকারে। বুড়ীর ছদ্মবেশে চণ্ডী মশান থেকে শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেছিলেন সেই কাহিনী শোনানো হয়ে থাকে। সমবেত ভক্ত ও শ্রোতারা মুগ্ধ হৃদয়ে শোনে সেই কাহিনী।

এর পরে মুখোস পরে শুরু হয় যুদ্ধ নাচ। চলে দুপক্ষের লড়াই। দেবী পক্ষের জয়েই এই যুদ্ধ নাচ শেষ হয়। সেদিনের পূজোরও সমাপ্তি ঘটে। ঐ যুদ্ধ নাচে দেবী চণ্ডীর বাহিনী এবং সিংহলী বাহিনীরই যুদ্ধের ছবি ফুটে ওঠে যেন। অবশ্য শুভশক্তি এবং অশুভ শক্তির লড়াই এর প্রতীক রূপেও বিচার করে দেখা যেতে পারে ঐ যুদ্ধ নাচকে।

পূজো চলার মধ্যেই কোন কোন ভক্তের ওপর দেবীর ভরও হয়। তখন ঐ আবিষ্ট ব্যক্তি ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকে প্রচণ্ড বেগে। মাটিতে ঠেকে যায় চুল এবং মাথা।

বহু কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে দেয় অনেক সময় ঐ ব্যক্তি। অনেক কঠিন ব্যাধির ওষুধও বলে দেয় ঐ আবিষ্ট ভক্ত। কখনো কখনো একাধিক ব্যক্তিরও 'ভর' হয়ে থাকে। স্ত্রী বা পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই এই ভরের ক্ষেত্রে।

পূজোর দিন বিকালে বা পরের দিন মেলা বসে। বাঁশীর আওয়াজ, পট্‌কার শব্দে হৈ হৈ রৈ রৈ কোলাহলে জমে ওঠে মেলা।

উত্তর দিনাজপুরের বৈরহাট্টার প্রাচীন দীঘির পাড়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর দ্বারা এই মশানকালীর পূজো চলে আসছে বহু যুগ ধরে। দীঘির আশে পাশে এখনো পড়ে আছে বহু ভগ্নপাথরের মূর্তি। অতি প্রাচীন এই গ্রাম থেকে পাওয়া সুদৃশ্য বিষ্ণু মূর্তি কলকাতার যাদুঘরে এখনো গবেষকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এই পূজোয় চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তনের সূত্রে মশানকালীর সঙ্গে চণ্ডীর একাত্মতার কথাও অনুমান করেন কেউ কেউ। একদা যে ব্যাধ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবী চণ্ডীর পূজো প্রচলিত ছিল মশানকালীর পূজো হয়তো বা সেই ধারারই অন্তিম রূপ।

উত্তরদিনাজপুরের বৈরহাট্টায় মশানকালীর কোন মূর্তি না থাকলেও দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে কিন্তু দুটি কালীমূর্তি নির্মিত হয় এবং পূজা চলে। দুই ভক্ত মুখোস পরে কালী ও শিব সেজে দেবীর সম্মুখে নাচে। কখনো কখনো ঐ দুই ভক্তকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে চলে জনতা। ঐ দুজনের হাতে থাকে সাপ। জনতা তাদের হাতে পয়সা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ছুঁড়ে দেয়। মুখোস কিন্তু বিশেষ ভক্তরা ছাড়া কেউ পরতে পারে না। অনধিকারীরা মুখোস পরলে নাকি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যায়।

এখানেও পূজাচার সাধারণ মানের। পূজারীও অন্ত্যজ শ্রেণীর। পায়রা পাঁঠা বলির প্রথা এখানেও আছে। চণ্ডীর মাহাত্ম্যও কীর্তিত হয়ে থাকে নয়া বাজারের পূজোয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার দুই দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে হাতে লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খণ্ড পুঁথি ছড়িয়ে আছে আজো। বৈরহাট্টা কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহারের আশে পাশের নির্জন গ্রামে চণ্ডীমঙ্গলের পালাগান আজো জনপ্রিয়।

উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবী মশানকালীকে নিয়ে গবেষক মহলে নানা মত প্রচলিত আছে। প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর অমলেন্দু মিত্র মনে করেন— "শ্মশান থেকেই মশানের উৎপত্তি। গাছের গোড়ায় অথবা মাঠে অপদেবতা মনে করে পূজা করা হয়। খুব সম্ভব শ্মশান কালী এইরূপে পরিবর্তিত হয়েছেন।"

—রাঢ়ের সংস্কৃতি—পৃষ্ঠা-৩২
(১ম সং)

কিন্তু যেভাবে মশানকালীর পূজোয় চণ্ডী মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় এবং মুখোস নৃত্য ও যুদ্ধাদি অভিনয় হয়ে থাকে তাতে ধনপতি সদাগরের ছদ্মবেশী চণ্ডীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অবশ্য এমনও হতে পারে হয়তো আদিতে শ্মশান কালীর পূজোই হতো পরবর্তীকালে মুখোস নৃত্য, যুদ্ধাভিনয় এবং চণ্ডী মাহাত্ম্যাদি সংযুক্ত হয়েছে ও কালক্রমে চণ্ডীর সঙ্গে মশান কালী একীভূত হয়ে গেছেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মশানকালীর যে সব পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে তাতে দু একটি স্থান ছাড়া 'মূর্তি' পূজো হয় না। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রাম বাংলায় মহামারী, বন্যা, ওলাওঠা বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্ষা কালী বা শ্মশান কালীর পূজোর প্রথা প্রচলিত আছে। কোন নির্জন মাঠে, গাছের নীচে বা দীঘির পাড়েই সাধারণত ঐ দেবীর পূজো হয়ে থাকে। কাজেই এমন মনে করাই সঙ্গত যে ঐ শ্মশানকালী বা রক্ষাকালীই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে 'মশান' কালী হিসাবে পূজিত হচ্ছেন পরিবর্তিত রূপে।

মশান কালী বা মশান দেবতাকে অবশ্য কেউ কেউ জলের অপদেবতা হিসাবেও চিহ্নিত করতে চান। প্রখ্যাত গবেষক প্রদ্যোত ঘোষ মহাশয় মনে করেন "মশান দেবতার দ্বিবিধ রূপ স্ত্রী ও পুরুষ লোক ধর্মে বিদ্যমান। স্ত্রীরূপে তাকে কালী জ্ঞানে পূজা করা হয়। তখন তিনি সিংহবাহিনী ও চতুর্ভুজা। পদতলে শিবের শয়ান মূর্তি। পুরুষ দেবতা রূপে তাঁকে শিব বা শিবানুচর কখনো বা অপদেবতা জ্ঞানে উপাসনা করা হয়।"

—লোক সংস্কৃতি—গম্ভীরা—পৃষ্ঠা ২০

(৩) গেরামঠাকুর বা গ্রাম দেবতা : গ্রাম দেবতা বা গেরাম ঠাকুর হলেন উত্তরবঙ্গের গ্রামবাসীদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। গ্রাম দেবতা বন্যা, মহামারী, অনাবৃষ্টি, ঝড় ঝঞ্ঝা প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন গ্রামবাসীকে। ব্যক্তিগত মঙ্গল কামনার চাইতে সমষ্টির মঙ্গল কামনাই গ্রাম দেবতার পূজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গ্রাম ঠাকুরের পূজোয় একটা সাম্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বশ্রেণীর লোকই অংশ গ্রহণ করে এই পূজোয়।

বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম দেবতার পূজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও মূর্তি তৈরী করা হয় আবার কোথাও বা মাটির বেদী বা শিলখণ্ডেই পূজো হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে পূজো হয় না। গাঁয়ের অব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তিই পূজো করে থাকেন। পাঁঠা, পায়রা, মোরগ বলি দেওয়া হয়। ফল, মূল, চাল, কলা, বাতাসা, মিষ্টি ইত্যাদিই নৈবেদ্যের উপাচার।

গাছের ছায়ায় ছোট ছোট মাটির চালা ঘরে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে গ্রাম দেবতা অবস্থান করেন। যে সব গাছের নীচে দেবদেবীরা অবস্থান করেন সেসব গাছের ডাল পালা কেউ কাটে না বা দেবদেবীর 'থান' স্পর্শ করে না কেউ অন্য সময়ে। দেবতার থানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে সবাই।

সাধারণভাবে বছরের নির্দিষ্ট কোন দিনে পূজোর ব্যবস্থা থাকলেও হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলেও আপৎকালীন অবস্থায় গ্রাম ঠাকুরের বিশেষ পূজো অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে আপৎকালীন পূজোয় উৎসব বা আনন্দের দিকটা বন্ধ থাকে।

পূজো উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। উৎসাহে উচ্ছ্বাসে আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গন। দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় বহু মাটির ঘোড়া। উত্তরদিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার বহু গ্রামেই দেখেছি গ্রামঠাকুরের পূজো ও মেলায় রীতিমতো জাঁক জমক।

(৪) মহারাজ ঠাকুর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোক দেবতা 'মহারাজ ঠাকুর' অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইনি আসলে কৃষি দেবতা, কৃষকের পরম উপকারী এই মহারাজ ঠাকুর কোথাও

হাতির পিঠে কোথাও বা বাঘের পিঠে বসে রাজকীয় মেজাজে পূজিত হয়ে থাকেন। সাধারণত নতুন ফসল বোনার আগেই তিনি বিশেষ ভাবে পূজিত হয়ে থাকেন।

জলপাইগুড়ি জেলার চিকলিগুড়িতে হাতির পিঠে উপবিষ্ট যে 'বুড়াঠাকুরের' পূজো করে থাকে স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের লোকেরা তিনিও কৃষি দেবতা শিবের প্রতিভূ মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হয়। মহারাজ ঠাকুরের পূজারীর মতোই ঐ বুড়াঠাকুরের পূজারীও নিজসম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পূজা পদ্ধতিও একই ধরনের।

সাধারণত খড়ো চালের মন্দিরেই মহারাজা বা বুড়া ঠাকুরের অবস্থান। কোথাও বা উন্মুক্ত স্থানেও মহারাজার মূর্তি বসিয়ে পূজো করা হয়ে থাকে। তবে চোপড়া থানার 'লোকনাহারে' মহারাজার ছোট্ট একটা ইঁটের মন্দির আছে। বাঘের পিঠে বসে আছেন মহারাজ। পূজোর সময় পায়রা এবং পাঁঠাও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। তবে বলি দেওয়ার জন্যও নির্দিষ্ট লোক থাকে। যেসে এ বলিদানের কাজ করতে পারে না। যেমন লোকনাহারে বলি দেয় 'রমেশ রায়'। বংশপরম্পরায় তারা এই কাজ করে আসছে জানালো রমেশ রায়। আমাদের চোখের সামনেই যূপকাষ্ঠে পায়রার মাথা ঢুকিয়ে পটাপট বলি দিয়ে চললো সে। দুটো পাঁঠাও বলি দিল। রক্ত ছুটলো ফিন্‌কি দিয়ে। সঙ্গী ইমাম-অমল-সুরেশ সামাদদের প্যান্টে লেগে গেল রক্তের ছিঁটে। ঘোর লেগে গেল রমেশের চোখে যেন।

তবে লোকনাহারে যে ব্যাপারটা আমাদের চোখে আশ্চর্য্য লেগেছিল সেটা হলো মহারাজা এবং তিস্তাবুড়ীর পূজো ও মেলা চলছে একই সঙ্গে।

এই মহারাজা শুধ কৃষিরই দেবতা নন। তিনি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, মহামারী, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা প্রভৃতি থেকে যেমন রক্ষা করেন ভক্তদের তেমনি বন্যপশুদের হাত থেকেও রক্ষা করেন।

(৫) মনসা : উত্তরবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই রয়েছে মা মনসার থান। ঐ থান কোথাও রয়েছে উন্মুক্ত স্থানে কোথাও বা মনসা গাছের নীচে। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে মনসার ঘটে বা মূর্তি তৈরী করে সাড়ম্বরে পূজো করা হয়। মূর্তি না হলে ঘটে সিঁদুর লেপে, ঘটের চারধারে সাপের ফণা তৈরী করে সাজানো হয়। ঘটের ওপরে থাকে মনসার ডাল। কোথাও বা থানের ওপরে মনসার ডাল পুঁতেও পূজো করা হয়ে থাকে।

পূজারী সাধারণত গাঁয়েরই কোন অব্রাহ্মণ ব্যক্তি হয়ে থাকেন। চিঁড়ে ভাজা, দুধ, বাতাসা, কলা ও মিষ্টান্নাদিই পূজার নৈবেদ্য। এই পূজোয় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারীই অংশ গ্রহণ করে থাকে। পূজোর থানেও অন্যান্য অংশে আলপনাও দেওয়া হয় এই উপলক্ষ্যে।

কোথাও কোথাও ঝাঁপান হয় এই সময়। মনসার পালা গানও হয়ে থাকে কোথাও কোথাও।

(৬) খেড়ী : মনসা পূজোর সাতদিন পরে উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে হয়ে থাকে 'খেড়ী' পূজো। গাঁয়ের কোন ফাঁকা জায়গায় একটা কলাগাছ পোঁতা হয়। ঐ কলাগাছের সামনে স্থাপন করা হয় একটা ঘট। মা মনসার নামে মন্ত্র উচ্চারণ করে ঐ ঘটের ওপরে

ফুল জল দেওয়া হয়। পূজারী সাধারণত গাঁয়েরই কোন অব্রাহ্মণ ব্যক্তি হয়ে থাকেন, মন্ত্রও কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়। আনুষ্ঠানিক পূজো শেষ হলে চারজন লোক ঐ ঘটের সামনে বসে মাটিতে হাত পাতে। তখন গুণীন মন্ত্রের গুণে ঐ হাতগুলোকে নাচাতে থাকে। ঐসব হাত গুলো এত জোরে নাচতে থাকে যে বলপ্রয়োগ করেও তাদের থামানো যায় না।

পূজোর আগের দিন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে গুণীনদের আহ্বান জানানো হয়। শ্রেষ্ঠগুণীনের স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় বহুগুণীন এসে ভীড় করে ঐ পূজোর স্থানে। আসে তাদের চ্যালারাও। মনসার গান গেয়ে সুর করে মন্ত্র পড়তে থাকে গুণীনরা। শোনা যায় ডমরুর ধ্বনি—টোং-টুকু-টুং-টোং-টুকু-টুং।

এরপরে মন্ত্রের জোরে গুণীনরা ঐ হাত গুলোকে নিজেদের দিকে টানতে থাকে। যার মন্ত্রের জোর বেশী তার কাছেই চলে আসে ঐ হাতগুলো। তখন ঐ গুণীনকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।

আগে নাকি পূজোর থানে ছেড়ে দেওয়া হতো জ্যান্ত 'গোমা' বা গোখুরা সাপ। গুণীন মন্ত্রের জোরে ঐ বিষধর সাপকে টেনে আনতো নিজের কাছে। সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়াতো ঐ গুণীনের সামনে। কোথাও কোথাও বিষধর সাপের পরিবর্তে সাপের মুন্ডু কেটে কলাগাছের নীচে পুঁতেও রাখা হয় বর্তমানে।

উত্তরদিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অন্তর্গত 'মনসাপুর' গ্রাম ও তার আশে পাশে খেড়ী পূজোর খ্যাতি আছে। স্থানীয় জন সাধারণের মধ্যে এই পূজো ও মন্ত্রের প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে থাকে।

খেড়ী পূজো ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকল্লাপ গুলো আসলে মনসা পূজো ও ঝাঁপানেরই আরেক রূপ। সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই যেমন মনসা পূজো তেমনই এ খেড়ী পূজোর উদ্দেশ্যও সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। সাপের কামড়ে প্রতিবছর মারা যায় বহু লোক। গ্রাম বাংলায় আজো গুণীনদের ওপরেই মানুষের মূল ভরসা। সেই গুণীনদের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষারই একটা বিশেষ অনুষ্ঠান এই খেড়ী পূজো।

ইটাহার থানার মনসাপুরের প্রাথমিক শিক্ষক সুবোধ কুমার চক্রবর্তী এবং বদল পুরের আরতি মজুমদার যেমন আমাকে মনসাপুর ও বদলপুরের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজাচারের তথ্য দিয়েছেন তেমনিই বৈরহাট্টা গ্রামের পলাশবর্মনও দিয়েছেন বৈরহাট্টার লোক মেলা ও লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে বহু তথ্য। আজো চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে সেই সব পূজোর অনুষ্ঠান, মেলা, যুদ্ধ নাচ, গুণীনের দল। ভেসে ওঠে আলতা দীঘি মৈলান দীঘির টলটলে কালো জল। দেখতে পাই মহুয়াতলায় সাঁওতালী নাচ। শুনতে পাই দ্রিমি দ্রিমি মাদলের বোল। বাঁশীর সুরে উদাস হয় মন। শুনতে পাই শিশুদের সঙ্গে দুর্গম ঐ সব গাঁয়ের অসংখ্য নরনারীর আন্তরিক কথা বার্তাও। মনে হয় ওরা যেন সবাই দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আর আমাকে যেন বলছে'না যান্ বাবু! না যান্ বাবু।'

(৭) গম্ভীরা : গম্ভীরার পূজোর জন্যে যদিও মূলত মালদহ জেলারই খ্যাতি ছড়িয়ে আছে তবুও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিনাজপুরের বহু স্থানেও গম্ভীরার পূজা বেশ ধূমধামের সঙ্গেই হয়ে থাকে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে কোথাও বা ত্রিপল ও চাঁদোয়া খাটিয়ে তার নীচেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে গম্ভীরার পূজানুষ্ঠান। আগে কোন মূর্তি ছিল না তবে বর্তমানে মূর্তি তৈরী করেই পূজো হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় বিধানেই ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত ত্রিশূলধারী শিবের মূর্তি তৈরী হয়ে থাকে।

গম্ভীরার পূজানুষ্ঠান আগে চারদিন ধরে চললেও বর্তমানে কোথাও কোথাও সাতদিন ধরেও চলে। প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তির আগের চারদিন ধরে চলে গম্ভীরা পূজানুষ্ঠান।

প্রথম দিন চলে ঘটভরা অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দিন চলে ছোট তামাসা।

তৃতীয় দিন চলে বড় তামাসা।

চতুর্থ দিন চলে আহারা বোলাই।

গম্ভীরার পূজানুষ্ঠানে আগে ফুল ভাঙা, সামশোল ছাড়া, ঢেঁকি চুমান প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান হলেও বর্তমানে হয় না। অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে যুগের পরিবর্তনের ধারায়।

প্রকৃতপক্ষে গম্ভীরার উৎসব শিবের গাজনেরই একটা বিশেষ রূপ। কৃষি দেবতারূপে শিবকে কল্পনা করেই গম্ভীরার পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। গম্ভীরার পূজোয় নাচ গানও হয়ে থাকে। গম্ভীরার গানের কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা-বন্যার কথা যেমন থাকে তেমনি মূল্যবৃদ্ধি ও নানা সামাজিক অন্যায় অবিচার এবং রাজনৈতিক সমস্যাদিও তুলে ধরা হয়ে থাকে।

(৮) ভাণ্ডানী : ভাণ্ডানী দেবী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক দেবী। কুচবিহার জেলার সিতাইপুর থানার অন্তর্গত পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে এবং জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পদমতী গ্রামে ও ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডানী গ্রামে ভাণ্ডানী দেবীর পূজো হয়ে থাকে সাড়ম্বরে।

পদমতী গ্রাম ও গোপালপুরের ভাণ্ডানী দেবী চতুর্ভুজা হলেও ভাণ্ডানী গ্রামের দেবী কিন্তু দ্বিভূজা। তবে দেবী ব্যাঘ্রাসীনা তিনটি ক্ষেত্রেই। দুপাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও সরস্বতী।

সম্ভবত এই ভাণ্ডানী দেবী দুর্গারই লৌকিক রূপ। 'বনদুর্গা' হিসাবেও দেখা যায় তাঁকে। দেবী জাগ্রতা এবং প্রচণ্ড ক্ষমতা ধরেন বলে ঐ অঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস। ভাণ্ডানী দেবীর নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে ভাণ্ডানী গ্রাম। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে দুশো বছরেরো আগে ধীরেন দেব মল্লিক নামে এক ব্যক্তি ভাণ্ডানী দেবীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে দেবীর পাকা মন্দির করে দেন।

অরণ্য সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ভাণ্ডানী দেবী। তিনি ফসলের রক্ষয়িত্রী দেবী। দেবীর নিত্য পূজোর ব্যবস্থা থাকলেও প্রতি বছর দুর্গা পূজোর পরের দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন বিশেষ পূজোর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। বহু ভক্তের ভীড় হয় ঐ পূজোর দিন। পায়রা ও পাঁঠা বলিও হয়ে থাকে।

সুদীর্ঘকাল ধরে এই দেবীর পূজো হয়ে আসছে উত্তরবঙ্গের ঐ দুই জেলায়। অনেকে মনে করেন ভাণ্ডানী দেবী কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বনাঞ্চলের আদিবাসীদেরই উপাস্য দেবী।

(৯) (ক) চড়ক : ভারতের সর্বত্রই কোন না কোনভাবে বিশেষত হিন্দু জনপদে শিবের আরাধনা হয়ে থাকে। চৈত্রমাসের চড়ক পূজো শিবভক্তদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজো ও উৎসব। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও চড়ক ও গাজনের উৎসব বেশ আড়ম্বর করেই হয়ে থাকে বিভিন্ন জেলায়।

চৈত্রমাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ। মেতে ওঠে গাঁয়ের মানুষ। সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণী থেকেই মূল সন্ন্যাসী নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনিই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের দীক্ষা দেন। সন্ন্যাসীরা আটদিন থেকে একমাস পর্য্যন্ত ব্রত পালন করে থাকেন। মাথায় তেল না মেখে গেরুয়া পরে ফল মূল খেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির এগারো দিন আগে সাধারণত ঘটস্থাপন ও 'দেইলপাট' অনুষ্ঠান হয়। ঐ দেইলপাট তৈরী হয় বেলকাঠ দিয়ে। নদী বা পুকুর পাড়ে দেইলপাটটি কোন কিছুর ওপর বসিয়ে তার সম্মুখে জলভর্তি ঘট বসিয়ে পূজো করা হয়। তারপরে ঐ পাটটি নূতন গামছা দিয়ে মুড়ে মাথায় করে ঢাক বাজাতে বাজাতে পূজো মণ্ডপে আনা হয়। সাতবার মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে নির্দিষ্ট থানের ওপরে রাখা হয় ঐ পাট। এদিন থেকেই সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে ব্রতাদি মেনে চলতে হয়। পরেরদিন থেকেই সন্ন্যাসীরা ঐ পাট নিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ী বাড়ী যায়। সঙ্গে চলে ছেলে বুড়োর দল। ঢাক বাজে। গানও হয়। চাল-ডাল-ফল, মূল সংগৃহীত হয়। আবার পাটটি যথাস্থানে রেখে সন্ধ্যায় আরতি হয়।

সংক্রান্তির আগের দিন সন্ন্যাসীরা যে পুকুরের জলে চড়ক গাছ ডুবানো আছে সেই পুকুরের জলে নেমে চড়ক গাছটি ওপরে তুলে তেল মাখিয়ে বাদ্য সহকারে নিয়ে আসেন পূজোমণ্ডপে। সন্ধ্যায় চলে মুখানাচ। হরগৌরী বা ভূতপ্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী সেজে চলে নাচ। ঢাক বাজে। কাঁসর বাজে। চলে গানও।

সংক্রান্তির দিন হরগৌরীর পূজো ও দেইলপাট পূজোর পরে হয় চড়ক পূজো। চড়ক গাছটি এবার মাটিতে পুঁতে তার ওপরে সমকোণ করে দশ বারো হাত লম্বা বাঁশ বা কাঠ জুড়ে দেওয়া হয়। দুপ্রান্তে দড়ি ঝুলে থাকে। দুজন সন্ন্যাসী দুদিকে ঐ দড়ি ধরে বা দড়িতে বাঁশ বা কাঠ বেঁধে বসে থাকে। এবার বন্ বন্ করে ঘুরানো হয় তাদের। আগে পিঠে বড়শী বেঁধেও ঘুরতো অনেকে। আগুন, বটি, কাঁটার ওপরে ঝাঁপও দিত। তবে এখন সেসব বিশেষ দেখা যায় না বড় একটা।

অনুষ্ঠান শেষে মূল সন্ন্যাসী মাথায় শান্তি জল ছিঁটিয়ে দেন সবার। চড়ক গাছটি তুলে পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। দেইলপাটটি স্থায়ী মণ্ডপে রেখে দেওয়া হয়। মূল সন্ন্যাসীর বাড়ীতেও রাখা হয় অনেক সময়।

পূজোর শেষ দিনে মেলা বসে। হৈ হৈ রৈ রৈ উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে আবাল-বৃদ্ধ-জনতা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার বেশ কিছু অংশে জ্যৈষ্ঠ মাসেও চড়ক পূজো হয়ে থাকে। তবে চৈত্রমাসের চড়ক পূজোরই আকর্ষণ বেশী।

বর্তমানে চড়ক পূজো মূলত শৈব উৎসব হলেও প্রথমে কিন্তু ছিল ধর্ম ঠাকুরেরই উৎসব। মূলতঃ নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যেই চড়ক পূজোর প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

(খ) সাঁওতালী চড়ক : উত্তরদিনাজপুরের ইটাহার থানার মনসাপুরের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার চড়ক পূজোর অনুষ্ঠান একটু ভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তির আগে মূল ভক্তা পাঁচদিন বা আট দিন ফলমূল, দুধ ইত্যাদি আহার করে ব্রত পালন করেন। একটি শিব ও কালীর মূর্তি তৈরী করা হয়। প্রতিদিন দুধ-কলা ও ফলমূল নৈবেদ্য দিয়ে পূজো করা হয় শিব কালীর। শিবের সম্মুখে একটা পাত্রে উঁচু করে চাল রাখা হয়। ঐ চালের স্তুপের ওপরে রাখা হয় একটা সুপারী। এবার ভক্তা মন্ত্র বলতে থাকেন। যদি মন্ত্রের গুণে ঐ সুপারী না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে পূজোর কোন ত্রুটি হয়েছে।

পূজো শেষে মাদলের তালে তালে ভক্তাগণ ও অন্যান্যরা নাচতে শুরু করে। পায়রা, পাঁঠা বলিও দেওয়া হয়। হৈ হৈ লেগে যায় চারদিকে।

অন্য ভক্তারা ঐ পাঁচ বা আটদিনের মধ্যে যেকোন দিনেই মূল ভক্তার কাছে দীক্ষা নিতে পারে। তবে দীক্ষার পর থেকে প্রত্যেক ভক্তাকেই নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় কঠোর ভাবেই। ভক্তারা অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গনে ও পাড়ায় পাড়ায় মাথার ওপরে ছড়ি ঘুরিয়ে সমস্বরে ধ্বনি দেয়— 'চলুই শিবুই পার্বতী।

ভোক্তা মহাদেব।'

শুরু হয় পূজোর শেষে চড়কে ঘোরা। মূল ভক্তা সামনে-পিছনে তিনবার করে মোট ছবার পাক খাওয়ার পরে অন্য ভক্তরা ঘুরপাক খেতে থাকে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন সারা রাত ধরে চলে নাচগান। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান শেষ। শিবকে নিয়ে যান প্রধান ভক্তা তাঁর বাড়ীতে। কালী বা পার্বতীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। চড়কটা ভাসিয়ে দেওয়া হয় পুকুরের জলে। এক বছরের জন্য ঐ পুকুরেই চড়কের অবস্থান। চড়ক পূজো উপলক্ষ্যে ছোট খাটো মেলাও বসে ঐ দিন মনসাপুরে। আবেগে উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে চড়কের মেলা প্রাঙ্গন।

চড়ক পূজোয় শিব-পার্বতীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গান গীত হয়ে থাকেই বহুস্থানেই। কিন্তু এই মনসাপুরের চড়কে যেসব গান গাওয়া হয় তার মধ্যে কিন্তু হর-পার্বতীর মাহাত্ম্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। একটি গানের নমুনা তুলে ধরছি এখানে—

"—ছাঁট কাঁহি নিম গাছ।
ইয়াং নাহি কদম গাছ।
ভারে ভারে বৈঠল নিমন চেড়ে।
বেলি বাছা রাজা বোলে
—এই সে নিমন চেড়ে।"

অর্থাৎ এই যে একটা নিমগাছ। এখানে নেই কদম গাছ। ডালে ডালে বসে ভালপাখী। রাজা বলে এই সেই ভাল পাখী। "—এখানে ভাল পাখী কি শিব? নাকি আত্মার প্রতীক?

সম্ভবত, পার্শ্ববর্তী গ্রামের অন্য সম্প্রদায়ের চড়ক পূজোর অনুষ্ঠান থেকেই প্রেরণা পেয়ে থাকবে মনসাপুরের সাঁওতাল সম্প্রদায়। তবে পূজানুষ্ঠান নিজেদের মতোই করে নিয়েছে।

(১০) মাসান ঠাকুর : কুচবিহারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবতা হলেন এই মাসান ঠাকুর। কেউ জলে ডুবে মারা গেলে বা আঘাতে কারো মৃত্যু হলে বলা হয় 'মাসান' নিয়েছে।

মাসান ঠাকুরের 'থান' আছে কুচবিহার জেলার বহুস্থানে। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে সেখানে পূজো হয়। আর চৈত্র-বৈশাখে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। চারদিকে তখন ওড়ে লাল নিশান। চিড়ে, দই, দুধ, কলা, বাতাসা দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। বিশেষ পূজোর সময় পায়রা, পাঁঠা প্রভৃতি বলিও দেওয়া হয়ে থাকে। মাসান পূজোর সময় ভরও হয় অনেকের। 'ভর' প্রাপ্ত ভক্ত অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। কঠিন কঠিন রোগের ওষুধ বলে দেয় অনেক সময়।

মাসান ঠাকুরের মূর্তি ভয়াল ভীষণ। সম্ভবত যমরাজারই লৌকিক কোন বিশেষ প্রতিভূ এই মাসানঠাকুর। মাসানকে তুষ্ট করতে না পারলে বিপদ থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

(১১) কাণ : কাণ নামে এক লৌকিক দেবীর পূজো হয়ে থাকে উত্তরদিনাজপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে। এই দেবী ভীষণ রাগী। যখন কারো ওপরে তাঁর কোপ পড়ে তখন তার নিস্তার নেই। তাই পূজার্চনা এবং বলি দিয়ে এই দেবীকে তুষ্ট রাখতে হয়। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেই এই পূজোর প্রচলন বেশী। আগে শূয়োর বলি দেওয়া হতো এখন ফল, চিড়ে, মুড়ি, মিষ্টান্ন দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়ে থাকে। পুরোহিতও অন্ত্যজ শ্রেণী থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মন্ত্রের ভাষাও অশাস্ত্রীয়। ব্যক্তিগত এবং সমাজের সকলের মঙ্গল কামনাতেই এই দেবীর পূজো করা হয়ে থাকে। পূজোর কোন নির্দিষ্ট দিন বা তিথি নেই। যেকোন দিনেই এই দেবীর পূজো হতে পারে। দেবীর কোন মূর্তি নেই। বেদীর ওপর ঘট বসিয়ে এই দেবীর পূজো করা হয়ে থাকে। নাচ গানও হয়ে থাকে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য।

(১২) বো : উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার কোন কোন গ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে এই 'বো' পূজো করে থাকে।

'বো' ঠাকুরের মূর্তিটি বড় অদ্ভুত। পেটটা মোটা। অদ্ভুত দর্শন এই মূর্তিটিকে মাটির ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার পেটের ওপরে পুঁতে দেওয়া হয় একটা কলাগাছ। বেজে ওঠে ঢাক ঢোল-কাঁসর। পুরোহিত মন্ত্র পড়তে থাকেন তারস্বরে। চাল-কলা-ফল-দুধ ও সন্দেশের নৈবেদ্য সাজানো হয়। পূজো শেষে চলে প্রসাদ বিলি। দুতিন দিন পরে ঐ মূর্তিটি তুলে নদীতে বা পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়।

পুরোহিত ঐ রাজবংশী সম্প্রদায়েরই কেউ একজন হন। মন্ত্র বা পূজো পদ্ধতি শাস্ত্রীয় নয়। এই 'বো' পূজো ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবেও করা হয়ে থাকে বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো।

(১৩) পাঁচকালী : বসন্ত আর কলেরার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পাঁচকালীর পূজোর প্রচলন আছে উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে। আগে মূর্তি গড়া হতো না তবে এখন মূর্তি গড়া হয়। ফলমূল চাল কলা এবং মিষ্টান্ন

দিয়েই নৈবেদ্য সাজানো হয়ে থাকে। পাঁঠা-পায়রা বলিও দেওয়া হয় কোথাও কোথাও! গ্রামের সাধারণ দেবদেবীর পূজোর স্থানেই এই পাঁচকালীর পূজো হয়। রাজবংশীদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হন পুরোহিত। পূজো পদ্ধতি সাধারণ। মন্ত্রও শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়।

উত্তরদিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার মোস্তফা নগর ও রায়গঞ্জের আশে পাশে এই পূজো সাড়ম্বরেই হয়ে থাকে।

(১৪) সাপকালী : কালী নামের আবরণে বহু লৌকিক দেবী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে রাজবংশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

'সাপকালী' একাধারে কালী আবার মনসাও বটে। ইনি দ্বিভুজা, খড়্গধারিণী ও বর৷ভয়দায়িনী। আবার মাথার ওপরে ফণা তুলে আছে বিষধর সর্প।

সাধারণত চৈত্রমাসের শেষ দিনে এবং পয়লা বৈশাখে গ্রামঠকুর ও অন্যান্য দেবদেবীদের ়াঙ্গে পূজিত হন ইনি। সাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ও অন্যান্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই সাপকালীর পূজো হয়ে থাকে। পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়েরই কেউ হন। মন্ত্র এবং পূজা পদ্ধতি সাধারণ স্তরের। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার মেস্তফানগরে এবং অন্যান্য জায়গায় সাপকালীর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

(১৫) রটন্তীকালী : উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার সেকেন্দরপুর গ্রামে 'রটন্তীকালী' নামে এক লৌকিক দেবীর পূজো হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ইনি শিশুদের রক্ষয়িত্রী। ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণ সাধন করে থাকেন। দেবীর নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। গাছের নীচেই দেবীর থান। মাঘ মাসে বেশ সাড়ম্বরেই রটন্তী কালীর পূজো হয়ে থাকে। পূজাচারে শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের বাঁধা কোন নিয়ম নেই। নৈবেদ্য ও সাধাণত ফল মূল ও মিষ্টান্ন দিয়েই সাজানো হয়। দেবীর কাছে মানতও করে অনেকে। মানত পূর্ণ হলে রটন্তী কালী পূজোর সময় পায়রা বা পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

অনেকে মনে করেন দেবী ষষ্ঠীরই প্রতিভূ এই রটন্তী কালী।

(১৬) জহরা কালী : মালদহ জেলার জহরা কালীর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা বাংলায়। দেবীর কোন মূর্তি নেই। সিঁদুর চর্চিত অর্ধ ডিম্বাকৃতি মৃত্তিকা স্তুপকেই দেবী জ্ঞানে পূজো করা হয়ে থাকে। ঐ মাটির স্তুপের ওপরে দেয়ালে ঝুলানো আছে রক্তবর্ণা ভয়ঙ্করী মাকালীর একটি মুখোস। ঐ মুখোসের দুপাশে আছে অনুরূপ আরো দুটো ছোট মুখোস। মন্দিরের একপাশে আছেন দেবীর ভৈরব জহরেশ্বর।

প্রতি শনি-মঙ্গলবারে দেবীর পূজো হলেও বৈশাখ মাসের পূজোতেই জাঁকজমক বেশী। সারাদেশ থেকে তখন হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ ঘটে। বিরাট মেলাও বসে তখন। পূজো চলে ঐ দিন ভোর ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টি পর্য্যন্ত। অসংখ্য পাঁঠাও বলি দেওয়া হয় ঐ দিন।

ভক্তদের বিশ্বাস দেবী খুবই জাগ্রতা। ঐ মায়ের কৃপায় দূরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যায়। দেবীর কাছে পূজো দিতে আসে হিন্দু মুসলমান সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়েরই মানুষ। এক অর্থে দেবীজহরা সমন্বয়ের দেবী। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মায়ের সন্তান।

আগে জহরামায়ের মন্দিরের চারপাশে ছিল গভীর জঙ্গল। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গল পরিস্কার করে সুদৃশ্য মন্দির তৈরী হয়েছে। মন্দিরের চারদিকে উঁচু ও চওড়া বারান্দা করা হয়েছে। তৈরী হয়েছে ভক্তদের বিশ্রামের জায়গাও।

জহরা কালীকে নিয়ে এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে বহু জনশ্রুতি। শোন যায় আদিতে ইনি নাকি ছিলেন ডাকাত-কালী। ডাকাতরা মায়ের পূজো দিয়ে ডাকাতি করতে যেতো দূর-দূরান্তরে। ডাকাতদের ডাকাতি করে আনা ধনরত্ন বা জহর সঞ্চিত থাকতো ঐ মন্দিরেই। সেই থেকেই কালীর খ্যাতি রটে যায় জহরা কালী রূপে।

আবার কেউ কেউ বলেন জহরা বা জহুরা নামে এক মুসলমান রমণী ছিল ঐ দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত। তার নাম থেকেই দেবীর নাম হয়েছে জহরা কালী।

কারো কারো মতে দেবীর মূর্তিকে যবনদের হাত থেকে বাঁচাতেই দেবীকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল এককালে। সেই থেকেই তিনি অবস্থান করছেন মাটির নীচে। আবার অনেকে বলেন পুরণো মন্দির সংস্কারের সময় এক রাজমিস্ত্রী নাকি কৌতুহল বশে ঐ মাটির স্তুপ সরিয়ে দেবীকে দেখে ফেলে। কিন্তু দেবী তাকে ঐ দর্শনের কথা বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ঐ মিস্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত দর্শনের কথা প্রকাশ করে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। সেই থেকে মাটির নীচেকার দেবী মূর্তি দর্শনের চেষ্টা আর করেনি কেউই।

গভীর জঙ্গলকে পরিস্কার করে যিনি সর্বপ্রথম জহরাকালীর থানের ওপরে মন্দির তোলেন তিনি হলেন সাধক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি বাবা এবং দাদুর সঙেগ দুর্গম জঙ্গলের পথে জহরা মায়ের থানে আসেন পূজো দিতে। তার পরে কি যেন ঘটে গেল। নেমে পড়লেন সাধনায়। দর্শন লাভ করলেন জহরা মায়ের। লেগে গেলেন মায়ের মাহাত্ম্য প্রচারে। সেই থেকেই জহরা মায়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের নানা প্রান্তে।

জহরাকালীর বর্তমান সেবায়েত তেওয়ারী বংশের পূর্ব পুরুষ হীরা লাল তেওয়ারীকে মা একদিন স্বপ্নে যে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিয়েছিলেন সেই রূপকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মায়ের মূর্তিতে। আজও সেই ধ্যানে ও মন্ত্রেই জহরা-মা পূজিতা হন এখানে।

'জহরা কালী'র পূজো যে কতযুগ ধরে চলে আসছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি আজো। তবে, দেবীর বৈশাখে বাৎসরিক বিশেষ পূজানুষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায় যে 'হীরালাল তেওয়ারী' মহাশয় বৈশাখ মাসেই কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে ঐ মাসেই দেবীর বিশেষ পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে আসছে আজ বহুযুগ ধরে।

অনেকে মনে করেন বল্লাল সেন তাঁর রাজধানীর চারদিকে যে চারটি দ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই চার দেবীরই একটি হলেন এই জহরাকালী যাঁর আদিতে পরিচিতি ছিল 'জহরাচণ্ডী' বলে। সম্ভবত, ঐ জহরাচণ্ডীই পরবর্তীকালে 'জহরাকালী' রূপে খ্যাত হয়েছেন।

(১৭) কাপড়ীকালী : উত্তরবাংলার বিভিন্ন অংশেই স্থানীয় অবস্থা থেকে যেসব স্ত্রী দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের অনেকেই দেখা যায় কালী নামের মধ্যে আশ্রয়

পেয়েছে যদিও তাদের প্রকৃতি ও প্রভাব স্বতন্ত্র। উত্তরবঙ্গের মশানকালী, সাপকালী, পাঁচকালী, রটন্তীকালী, জহরাকালী প্রভৃতি সেই প্রমাণই দেয়। মালদহ জেলার বাণপুরের কাপড়ী কালীও এমনই এক লৌকিক স্ত্রী দেবতা।

লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় দেবীর থান। অনুচ্চ প্রাচীরের মাঝখানে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। ঐ ঘরগুলোর একটাতেই দেবীর থান। সিঁদুর লেপা মাটির ঢিবিই কাপড়ী কালীর থান। কোন মূর্তি নেই। ঐ ঢিবিটাই প্রতীক জ্ঞানে পূজিত হয়। তবে দেবীর ধ্যানমন্ত্র থেকে জানা যায় দেবী চতুর্ভূজা, কৃষ্ণবর্ণা, কণ্ঠদেশে সর্পহার, কোমরে বাঘছাল, চোখ দুটি রক্তবর্ণ। ভূত প্রেত পরিবৃতা দেবী মুক্তকেশী এবং শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর ভৈরব সদাশিব।

কাপড়ী কালীর পূজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেবীকে যাকিছু উসির্গ করা হয় সবই জোড়া জোড়া দিতে হয়।

চৈত্র মাসের রামনবমীতে এখানে খুব ধুম ধাম সহকারে পূজো হয়। ঐ সময় মেলাও বসে। হৈ হৈ রৈ রৈ চলে। প্রতি বছর বৈশাখের শনি মঙ্গলবারে দেবীর যে পূজানুষ্ঠান হয় তাতে বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তের আগমন ঘটে।

মন্দির প্রাঙ্গনে পড়ে আছে বহু পাথরের ভগ্নমূর্তি। আছে রূদ্রচণ্ডীর বাঁধানো বেদী এবং বাশুলীর থান। বর্তমান মন্দির কক্ষটি ১৩৩৪ সালে সিংহাবাদের জমিদার ৺ ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় নির্মাণ করে দিয়ে ছিলেন।

কাপড়ীকালীর পূজো প্রচলন সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। সিংহাবাদ স্টেশনের কিছু আগে রেল লাইনের ধারে অবস্থিত এই কাপড়ী কালীতলা। জানা যায় দেবীর স্বপ্নাদেশে নবকান্ত মৈত্র নামে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণের ওপর পূজার ভার পড়েছিল ঐ মৈত্রর বংশধররা পূজো করে আসছেন এখনো।

(১৮) বুলবুলচণ্ডী : উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে দেবীচণ্ডী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তেও বিভিন্ন নামে ও বেশে ইনি পূজিতা হয়ে আসছেন দীর্ঘ কালধরে। কালী নামের আশ্রয়ে যেমন বহু লৌকিক দেবী পূজো পেয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে তেমনি সাধারণ চণ্ডী নামের আশ্রয়েও বিভিন্ন সময়ে বিবিধ স্থানীয় অবস্থা থেকে উদ্ভূত লৌকিক দেবীরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই পূজিতা হচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। মালদহ জেলার বুলবুলচণ্ডী এমনই এক দেবী।

মালদহের কোর্ট রেল স্টেশন থেকে এগারো কিমি দূরে অবস্থিত বুলবুলচণ্ডী গ্রাম। প্রায় একশো বছর আগে ঐ গ্রামের পুরণো পুকুর থকে শিশুমূর্তি সহ পালঙ্কে শায়িতা যে মাতৃ মূর্তিটি পাওয়া যায় সেই মূতিটিকেই চণ্ডী জ্ঞানে পূজো করা হচ্ছে আজো।

সম্ভবত ঐ দেবীকে শিশুদের রক্ষয়িত্রী এবং সকলের মঙ্গলদাত্রী হিসাবেই পূজো করা হয়ে থাকে। বর্তমানে একটা দালান ঘরে অবস্থান করছেন দেবী। বছরের বিভিন্ন সময়ে ঐ দেবীর পূজো হয়ে থাকে। তবে বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গল বারেই ধূমধাম করে পূজো হয়ে থাকে। দেবীর নাম বুলবুলচণ্ডী থেকে গ্রামেরও নাম হয়েছে বুলবুলচণ্ডী। 'বুলবুলচণ্ডীর'

সঙ্গে মা যশোদার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। আবার অনেকে মনে করেন উনি মা যশোধরাও হতে পারেন। শিশুটি সেক্ষেত্রে রাহুল।

প্রসঙ্গত বলা দরকার উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার অন্তর্গত 'লোকনাহার' গ্রামের এক পুকুর সংস্কারের সময়ও ঐ ধরনের শিশুসহ একটি মাতৃ মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বছর কয়েক আগে এবং চোপড়া থানাতেই জমা পড়েছিল সেটি কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি পরবর্তীকালে।

তবে ঐ মূর্তিটি যে চণ্ডীমূর্তি নয় তা স্বীকার করেন সকলেই। যদি বৌদ্ধযুগের মূর্তি হয় ওটি তবে রাহুল এবং যশোধরার মূর্তি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

(১৯) মাধাইচণ্ডী : মালদহ জেলার ইংরেজ বাজারের উত্তর পূর্বে ৬ কিমি দূরের মাধাইপুরে রয়েছেন মাধাই চণ্ডী। কিন্তু দেবীর কোন মূর্তি নেই। উঁচু মাটির ঢিবিকেই দেবী জ্ঞানে পূজো করা হয়ে থাকে। এখানে পরপর সাতটি ঢিবি আছে। সাতবোনের প্রতীক ঐ সাতটি ঢিবি। ঐ সাতবোন হলেন যথাক্রমে বুড়ীমা, জহরমা, ঝাপরীমা, বুড়াবুড়ী, গোয়ালচণ্ডী, দুয়ারবাসিনী এবং বাশুলী। সাতবোনের এই বেদীটিকে স্থানীয় লোকেরা বলে কাঁচা-খাকীর স্থান।

মূল মন্দিরের ভিতরে একটা বাঁধানো বেদীর ওপরে ছোট্ট উঁচু ঢিবি। এ ঢিবির ওপরেই রাখা আছে দেবীর মুখোস এবং দুপাশে রয়েছে আরো দুটি মুখোস। এছাড়া আছে শোলা বা মাটির তৈরী মানতের বেশ কয়েকটা মুখোসও বেদীর ওপরে।

মন্দিরে নিয়মিত ভাবেই শনি ও মঙ্গলবারে পূজো হয়ে থাকে তবে বৈশাখ মাসের শনি, মঙ্গলবারে ধুম ধাম করে বিশেষ পূজো হয়ে থাকে ঐ সময় বিরাট মেলাও বসে। হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভীড় করে ঐ সময়।

মাধাইপুরের মাধাই চণ্ডীই কালক্রমে কালী হিসাবে খ্যাত হয়েছেন। ঐ মন্দিরটিকেও এখন মাধাই কালী মন্দির বলেই জানে সকলে।

শোনা যায় বল্লাস সেন প্রতিষ্ঠিত চার দ্বারের চার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই একটি হচ্ছেন এই মাধাই চণ্ডী। তবে প্রাচীন মন্দির বা মূর্তি নেই। বর্তমানে মন্দিরটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে।

মাধাইপুর অঞ্চলের আশে পাশে বহু প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও সূর্য্য মূর্তিও এখানে মিলেছে। প্রাচীনকালে এখানে যে একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই মায়ের অলৌকিক শক্তির মহিমা নিয়ে বহু লোক কাহিনীও প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে এখনো জীবিত আছেন দু একজন। মাধাইচণ্ডী বা মাধাই কালীর জন্যই মাধাইপুরের খ্যাতি ছড়িয়েছে গোটা জেলা তথা উত্তরবঙ্গে।

(২০) কমলাচণ্ডী : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কাছেই কমলাচণ্ডী গ্রামে প্রতিবছর আশ্বিন মাসে দেবী কমলাচণ্ডীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরী করে পূজো করা হয় ধুমধাম সহকারে। দেবী মূর্তিতে চণ্ডী ও লক্ষ্মীর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। পূজোর সময় পাঁঠা, হাঁস, পায়রা

বলি দেওয়া হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে হয়ে আসছে এই কমলাচণ্ডীর পূজো। দেবীর নাম থেকেই গ্রামের নামও হয়েছে কমলাচণ্ডী গ্রাম। আদিতে কমলাচণ্ডীর পরিকল্পনায় কোন বিশেষ বা বিখ্যাত মানবীও থাকতে পারেন কিন্তু আজ সেই তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন।

(২১) হরিষ মঙ্গল ও জয় মঙ্গলচণ্ডী : উত্তরবঙ্গের উচ্চ বর্ণের হিন্দু মেয়েরা কোথাও কোথাও হরিষ মঙ্গল ও জয়চণ্ডীর পূজো করে থাকেন। হরিষ মঙ্গল চণ্ডীর পূজো করলে মনে হর্ষ বা আনন্দ জাগে এবং পরিবারের মঙ্গল হয়। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারেই হরিষ মঙ্গলের পূজো হয়। সাধারণত ঘটেই দেবীর পূজো হয়। উপোস করে শুদ্ধ চিত্তে দেবীর পূজো করা হয়ে থাকে।

জৈষ্ঠ্য মাসের মঙ্গলবারে জয় মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করা হয়। জয়মঙ্গল চণ্ডীর পূজো করলে বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ হয় বলে বিশ্বাস। ঘটেই পূজো করা হয়ে থাকে। ফুল বেলপাতা, আমের পল্লব, তুলসী, যব, ফল, চিনি, সিঁদুর ইত্যাদি লাগে এই দুই পূজোতেই।

(২২) ধাপচণ্ডী : জলপাইগুড়ি জেলার ধাপগঞ্জে ধাপচণ্ডীর মন্দিরেই দেবীর অবস্থান। প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে প্রায় ৫০০ বছর আগে ধাপচন্দ্র দাস নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি নিত্য চণ্ডীর পূজো করতেন। একরাতে দেবী স্বপ্নে তাঁকে নরবলি দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ধাপচন্দ্র দেবীর আদেশ পালন না করাতে তাঁর সাতপুত্র চার কন্যা এবং দুই স্ত্রীই মারা যায়। এই শোক সহ্য করতে না পেরে তিনি দেবীর খড়্গ টেনে নিয়ে দেবীর সম্মুখে বলি দেন নিজেকেই। সেই থেকেই ঐ দেবী চণ্ডী খ্যাত হন 'ধাপচণ্ডী' নামে। আর ঐ গ্রামের নাম হয় ধাপগঞ্জ।

অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে হুসেন শাহের বৈকুণ্ঠপুর আক্রমণের সময় চণ্ডীর মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেলে জঙ্গলে ভর্তি হয়ে যায় চারিদিক। বহু পরে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগ্নস্তূপটি সরিয়ে দেবীর থানে সন্ধ্যাদীপ দিতে থাকে। তিন পুরুষ ধরে দেবীর সেবা করার পরে ঐ ব্যক্তির বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে চলে গেলে দেবী আবার চলে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। দীর্ঘকাল পরে জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ীর রাস্তা তৈরীর সময় জনৈক ঠিকাদার দেবীকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ থানটি খুঁজে বের করেন এবং থানের ওপরে প্রায় পাঁচফুট উচ্চতার একটি ছোট্ট মন্দির তৈরী করে প্রত্যহই সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপরেই দেবী চণ্ডীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

ধাপগঞ্জের আশে পাশের বহু নরনারীই দেবীকে অত্যন্ত জাগ্রতা বলে মান্য করেন। দেবীর বাৎসরিক পূজোর সময় ধাপগঞ্জে শতশত ভক্ত নরনারীর ভীড় জমে। মানতও করেন অনেকে। পাঁচটি উপকরণ দিয়ে পূজো দিতে হয় মানত করলে। ঐ উপকরণগুলো হলো একটি চালকুমড়ো, একটি আম, দুটি পায়রা ও একটি পাঁঠা।

(২৩) তিস্তাবুড়ী : উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই চলে সাড়ম্বরে তিস্তাবুড়ীর পূজো। পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে সারা বৈশাখ মাস ধরেই চলে তিস্তাবুড়ীর পূজো। একটি ঘটই হলো দেবতার প্রতীক। আবার কোথাও বা কলার খোলা বা শোলা দিয়ে তিস্তাবুড়ীর মূর্তি তৈরী করা হয়ে থাকে। ঐ ঘট বা মূর্তিকে ঘিরে চলে মেয়েদের নাচ গান। কোথাও

কোথাও ঐ ঘট বা মূর্তি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরেও পূজারিণীরা/তারপর দলবেঁধে নির্দিষ্ট দিনে গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে যায় নদীর তীরে বা নির্দিষ্ট দীঘির ধারে—

আজ কেনে চাউলের বাস উঠেগে ?
নাজানি তিস্তাবুড়ী কোন্ সাজনি সাজেগে।
আজ কেনে কেলার বাস উঠেগে ?
নাজানি তিস্তাবুড়ী কোন্ সাজনি সাজেগে।
আজ কেনে দুধের বাস উঠেগে ?
নাজানি তিস্তাবুড়ী কোন্ সাজনি সাজেগে।
আজ কেনে চিনির বাস উঠেগে ?
নাজানি তিস্তাবুড়ী কোন্ সাজনি সাজেগে।
আজ কেনে খইয়ের বাস উঠেগে ?
আজ কেনে ভূরার বাস উঠেগে ?
নাজানি তিস্তাবুড়ী কোন্ সাজনি সাজেগে।

(হরদিগছ/দার্জিলিং)

দীঘি বা নদীর কিনারে একে একে ঘট, মালা, মালিয়ান ফুল, ভেলাও প্রদীপ নামিয়ে দলে দলে মেয়েরা দুধ, খৈ, কলা, চিনি ইত্যাদির ভোগ দেয় তিস্তাবুড়ীকে। তারপরে মন্ত্র উচ্চারণ করে কলার ভেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয় তিস্তার জলে। জলের ওপরে আলোর চ্ছটা ফেলে একে একে ভেসে যায় অসংখ্য প্রদীপ। জল ছিটিয়ে হৈ হৈ করে ওপরে উঠে আসে মেয়েরা।

তিস্তাবুড়ীর পূজো উপলক্ষ্যে পয়লা বৈশাখে মেলাও বসে নদীতীরে বা দীঘির কিনারে। হৈ হৈ-রৈ রৈ উচ্ছ্বাসে. আবেগে মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যার মুখে আবার দলবেঁধে বাড়ী ফিরে যায় পূজারিণীরা গান গাইতে গাইতে—

'সোগোল ফুল ফুটিল, কি আরে সখী।
নাই উঠিল বেলারে হায়!
যেদিন হৈতে সখী গেইছেরে মোর
মাথায় নাই মোর তেল রেহায়।
যেদিন হৈতে সখী গেইছেরে মোর
সিথ্যাত নাই মোর সিঁদুর রে হায়।
যেদিন হৈতে সখী গেইচেয়ে মোর
নাই মুখে মোর হাসিরে হায়।
যেদিন হৈতে সখী গেইছেরে মোর
কোমরে নাই শাড়ী রে হায়।
সোগোল ফুল ফুটিল আরে সখী
নাই উঠিল বেলারে হায়।"

(লোকনাহার, চোপড়া)

লৌকিক দেবী তিস্তাবুড়ীকে বৃষ্টি ও ফসলের দেবী রূপেই পূজো করা হয়ে থাকে। তিস্তাবুড়ী প্রসন্না হলে সুবৃষ্টি হয়ে বন্যা বা খরার হাত থেকে দেশ বাঁচবে। ভাল ফসল হবে। সকলের কল্যাণ হবে। সুখে শান্তিতে থাকবে সবাই।

তিস্তাবুড়ীর পূজোকে কেন্দ্র করে রাজবংশী মেয়েরা যেসব গান গায় ও ছড়া বলে সেই সব গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে নারী হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাও আবেগ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের ছবিও ফুটে ওঠে দেখা যায়। উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জ, কালুগছ, কদমগাছি, বেলবাড়ী, ও লোকনাহারের সঙ্গে দার্জিলিং জেলার হরদিগছ ও তার আশে পাশে যেসব গান ও ছড়া শুনেছি তাতে বারে বারে মুগ্ধ হয়েছি আমি।

(২৪) হুদুমাদেও : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একদা হুদুমাদেও দেবের পূজোর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এই পূজো মূলত, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। হুদুমাদেও বৃষ্টির দেবতা বরুণ দেবেরই লৌকিক প্রতিভূ। বৃষ্টির কামনায় যেমন বঙ্গভূমির অন্যত্র ব্যাঙের বিয়ে ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে থাকে মেয়েরা তেমনই রাজবংশী মেয়েরা 'হুদুমা' দেবের পূজো করে থাকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে এই পূজানুষ্ঠান এখন আর তেমন হয় না। গ্রীষ্মের দিনে অমাবস্যার রাতে কৃষক বধূরা নির্জন মাঠে উপস্থিত হয়ে একটা কলাগাছ মাটিতে পুঁতে তাকেই 'হুদুমাদেও রূপে পূজো করে। ঐ কলাগাছের সঙ্গে প্রতীকী মিলনেও আবদ্ধ হয় তারা নিরাবরণদেহে। দুজন নারী গরু সেজে লাঙল টানে। তৃতীয় জন হাল চালায়। অন্যরা নাচতে নাচতে গাইতে থাকে—

"হিল্ হিলাইছে কোমরাটা মোর
শির শিরাইছে গাও।
কুঠে গেইলে এলা মুই
হুদুমার দেখা পাও ?

এই গানে দেহ সুখের চাইতে ফসল ফলানো ও বৃষ্টির কামনাই কিন্তু প্রধান। সারারাত ধরে চলে নাচগান ও পূজানুষ্ঠান। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই যে যার পোষাক পরে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

হুদুমা শব্দের অর্থ উলঙ্গ। মেয়েরা বিবস্ত্রা হয়েই হুদুমার পূজো করে বৃষ্টির কামনায়।

প্রকৃতি রূপী ধরিত্রীর সঙ্গে বরুণদেব মিলিত হলেই দূর হবে অনাবৃষ্টি। ফলবে ফসল। তাই রমণীরা ধরিত্রীর প্রতীক হয়ে বরুণদেবের প্রতিভূ হুদুমার সঙ্গে মিলিত হয়। নারী উর্বরতার প্রতীক। বৃষ্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি। তাইই বরুণ দেবের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কল্পনা।

বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাতেও হুদুমার পূজো প্রচলিত আছে ভিন্নরূপে। বাড়ীর উঠোনে গর্ত কেটে জল ঢেলে দুটো ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মেয়েরা মাঙ্গনে যায় বাড়ী বাড়ী। পরের দিন ঐ মাঙ্গনের চাল, ডাল রান্না করে ব্যাঙ দুটোর বিয়ে দিয়ে হুদুমার গান গায়। ঐ গান কিছুটা অশ্লীল। হুদুমা নাকি ঐ গান শুনে লজ্জায় বর্ষণ করে থাকে।

(২৫) বাঁশপূজা—বা মদনকাম পূজা : উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলার শুখানদীঘি, উনেশ বিঘা ও বাঁশদহনতি গ্রামে 'মদনকাম বা বাঁশ পূজোর প্রচলন আছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই পূজোর প্রচলন আছে। চৈত্র মাসের চতুর্দশীর দিন থেকে শুরু হয়ে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চলে এই পূজো ও উৎসব। বাঁশের গায়ে লাল কাপড় জড়িয়ে মাথায় চামর দিয়ে ঐ বাঁশটি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। কখনো বা বাঁশের মাথায় এক জোড়া পান ও একটা আয়নাও বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর ঐ বাঁশটিকেই দেবতা জ্ঞানে পূজো করা হয়ে থাকে।

ঐ বাঁশটি আসলে মদন দেবের প্রতীক। নৃত্যে গানে জমে ওঠে মদন কাম পূজা। গানগুলি অবশ্য বেশীর ভাগই আদি রসাত্মক।

এই পূজোকে বাঁশ পূজোও বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে নাচ গানে এই পূজো জমে উঠলেও বা মেলা বসলেও ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে এই পূজানুষ্ঠান।

(২৬) সোনারায় : উত্তরবঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবতা হলেন সোনা রায়। তিনি বাঘের ওপরে বসেন। সুদর্শন। মালদহ জেলায় সোনা রায় বাঘের দেবতা বলেই খ্যাত। সোনা রায়ের মূর্তি তৈরী করে উন্মুক্ত স্থানে ছোট্টখড়ের চালের অস্থায়ী মন্দিরে বেদীর ওপরে বসিয়ে পূজো করা হয়। বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় আচার বা মন্ত্র নেই। সিমলা গ্রাম ও বীরনগরের সোনা রায়ের পূজোর খ্যাতি আছে।

সাধারণত রাখাল বালকরাই এই পূজোর আয়োজন করে। সোনা রায়ের গান গেয়ে রাখাল ছেলেরা বাড়ী বাড়ী মাগন মাগে। এবং মাগনের চাল ডাল দিয়ে বনভোজন করে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে রাখালরা সমবেত ভাবে যে গান করে তার বন্দনা বা ধুয়া হলো—

'খেলা করে রে কালা কৃষ্ণ
খেল্ কদমের তলে।

পরের গান হলো

বাসুদেব গেইল বাথান রে।
যশোদা গেইল জলকে।
কৃষ্ণ দেখে ননী ভাণ্ড ঐ না শিকায় ঝুলায়।
ননীর ভাণ্ড ভাইঙা কৃষ্ণ হাতে মুখে লাগায়।
তাই না দেইখ্যা মা যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধয়।
বেঁধো না বেঁধো না মাগো বাছুর বাঁধা দড়ি।
বেঁধোনা বেঁধো না মাগো ছাগল বাঁধা দড়ি।
হাতেরো বালা বেইচা দিমু ঐ না ননীর কড়ি।
কোমরেরো বিছা বেইচা দিমু ঐ না ননীর কড়ি।
পায়েরো নূপুর বেইচা দিমু ঐ না ননীর কড়ি।
তাতেও যদি না হয় মাগো যামু মামুর বাড়ী।
মামুর বাড়ী চাকর খাইট্যা দিমু ননীর কড়ি।
এত কথা শুইন্যা মা যশোদা হায়।

চোখের জলে যান ভাইসা কৃষ্ণ কোলে হায়।
আর কও গাইমু মাগো সময় বহে যায়।
দান দখিনা দাও গো এখন দূরের পথে যাই।
আমার সোনা রায়ের মাথায় দিমু গোদুধ ফুল।
সোনা রায়ের বর নিতে মা কেউ না করো ভুল।

(বীরনগর, কালিয়াচক, মালদা)

রাখাল ছেলেরা বেদীতে ঠাকুরকে বসিয়ে সকলে হাতে খৈ নিয়ে সোনারায়ের চারপাশে ঘুরে বারোটা বাঘের বন্দনা করে সুর করে—

আর বাঘরে আর বাঘ।
আর বাঘের বড় বড় হোল।
ঘাটায় বসি বাজায় ঢোল।
বলতো ঠাকুর সোনা রায়
তোর বাঘে ক্যান্ ঢোল বাজায় ?
বাজাবার জিনিস বাজাতি হয়।
মোর সোনা রায়ের পূজো হতি হয়।
আর বাঘরে আর বাঘ
আর বাঘ চিতা।
ঘাটায় বসি সে ক্যান্ পড়ে গীতা ?
বলতো ঠাকুর সোনা রায়
তোর বাঘে ক্যান পড়ে গীতা ?
পড়ার জিনিষ পড়তি হয়।

(বীরনগর, কালিয়াচক) মোর সোনা রায়ের পূজা হতি হয় ইত্যাদি।

মালদা জেলার বিভিন্ন অংশে এখনো পৌষ সংক্রান্তিতে ধুম ধাম করে রাখালরা এই সোনা রায়ের পূজো করে থাকে। ব্যাঘ্র দেবতা রূপেই সোনা রায়ের পরিচিতি। এক সময় দেশে ছিল গভীর বনজঙ্গল। ছিল ভীষণ বাঘের উপদ্রব। রাখালরা গোরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া চরাতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়তো। তাই বাঘ দেবতা সোনা রায়কে পূজো করে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা।

আবার উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও কৃষি দেবতা হিসাবেও সোনা রায়ের পূজো হয়ে থাকে। তিনি কৃষির মঙ্গল করেন। গরু-মোষ রক্ষা করেন। তাদের রোগ সারান।

(২৭) ধর্মঠাকুর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ধর্মঠাকুরের পূজো হয়ে থাকে। সাধারণত বৈশাখ মাসেই ধর্মঠাকুরের পূজো হয়। ধর্মঠাকুরের কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। কোথাও শিলা খণ্ডকে, কোথাও বা বেদীকেই লাল কাপড় বা গামছায় মুড়ে পূজো করা হয়। আবার জলপাইগুড়ির সুখানী গ্রামে একটি হাঁসের ডিমকেই ধর্মঠাকুর হিসাবে বেদীতে রেখে পূজো করা হয়ে থাকে।

বৈশাখের কোন এক রবিবারে ধর্মঠাকুরের পূজো অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের পূজো প্রচলিত। পূজারীও তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলমূল চাল-বাতাসাদিই পূজোর নৈবেদ্য। পূজোর আচার পদ্ধতিও শাস্ত্রীয় গণ্ডীতে বাঁধা নয়।

উত্তরবঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজোয় বহু লোকের ভীড় হয়। মেলাও বসে। ধর্মঠাকুরের পূজোর মধ্যে অনেকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাব আছে বলে মনে করে থাকেন।

(২৮) খেতি বা ক্ষেত্রঠাকুর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজবংশীরা ক্ষেত্রঠাকুর বা খেতি ঠাকুরের পূজো করে থাকে। সাধারণত কালী পূজোর পরের দিন এই পূজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্র ঠাকুর বা খেতি ঠাকুরের নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। নির্দিষ্ট কোন জমি বা খেতের ওপরই পূজোর ব্যবস্থা হয়। মাটির স্তূপকেই ক্ষেত্র দেবতা ধরা হয়। ঐ স্তূপের সামনে রান্না করা ভাত ফলমূল, আতপচাল, মিষ্টান্নাদির নৈবেদ্য, সাজিয়ে পূজো করা হয়। মন্ত্রাদি এবং পূজাচারে শাস্ত্রীয় নিয়মের কোন বাঁধন নেই। তবে পূজারী ও অন্যান্য কৃষকরা সারাদিন উপোস করে থাকে। রাতে আতপচালের গুঁড়ো ছাতুর মতো করে খায়। সাধারণত পুরুষরাই এই পূজো ও অনুষ্ঠানাদি করে থাকে।

পূজো শেষ হলে সমবেত কৃষকরা পাট কাঠিতে আগুন লাগিয়ে সারা ক্ষেত প্রদক্ষিণ করতে করতে বলে—

'হাম্বোরে আয়, হাম্বোরে আয়।
পোকা মাকড় দূরে যায়।'

এই ক্ষেত্রঠাকুর বা খেতি ঠাকুর আসলে কৃষি ক্ষেতের রক্ষক। তিনি কৃষি ক্ষেতকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করেন ও পোকা-মাঁকড়ের হাত থেকে বাঁচান।

(২৯) ধর্ত্তি বা ধরিত্রী : উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ধরিত্রী বা ধর্ত্তি পূজোর প্রচলন আছে। ক্ষেতের চারধারে কলাগাছ পুঁতে দুধ-কলা দিয়ে সম্পন্ন হয় এই ধর্ত্তি পূজো। ক্ষেতে শস্যের মঙ্গল কামনাতেই করা হয় এই লৌকিক পূজানুষ্ঠান। ক্ষেতি ঠাকুর বা ক্ষেত্র ঠাকুরের মতো ধরিত্রী বা ধর্ত্তি ঠাকুরেরে কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই।

(৩০) গোরক্ষনাথ : গবাদি পশুর রক্ষক হিসাবে গোরক্ষ নাথের পূজো করে থাকে উত্তরবঙ্গের চাষীরা। এই দেবতার কোন মূর্তি নেই। গোয়াল ঘরের এক কোণে মাটির বেদী তৈরী করে ঐ দেবতার পূজো করা হয়ে থাকে। কলা, আলোচাল, নাড়ু, দই, খৈ প্রভৃতির নৈবেদ্য সাজানো হয়। ধূপ জ্বালিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ফুল দিয়ে পূজো করা হয়। ছেলে মেয়েরা বেদীর চারপাশে দাঁড়ায় হাত ধরে। মন্ত্র পাঠক বা অধিকারী মন্ত্র পড়েন বা ছড়া বলেন। শীত-বর্ষা শরতের যেকোন সময়েই গোরক্ষনাথের পূজো চলতে পারে। আবার কখনো কখনো গাই এর বাছুর হলেও এই দেবতার পূজো করা হয়। সাধারণত এই পূজোয় যেসব মন্ত্র বা গান হয় তা কিন্তু শিবকেন্দ্রিক। একটি উদাহরণ, দেওয়া হলো—

"শিবের মাগন ভাই শিবের মাগন।
ভাটি হৈতে আইল পীর হাতেতে কঙ্কন।

(৩১) গাভুরা : উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও গাভুরা নামে এক লৌকিক দেবতার পূজো হয়ে থাকে। 'গাভুর' শব্দের অর্থ হলো যুবক যুবতী। গাভুরা হলেন প্রণয়ের দেবতা। যুবক-যুবতীরাই এই গাভুরার পূজো করে থাকে।

আমাদের মদনদেব এবং গ্রীক পুরাণের 'কিউপিডের' মতোই প্রণয়ের বা কামের দেবতা ইনি। যুবক যুবতী প্রণয়পাশে আবদ্ধ না হয়ে পাছে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে তাইই গাভুরার কৃপা লাভের জন্য এই পূজো।

সাধারণত বসন্তকালেই গাভুরার পূজো করা হয়। পূজাচার এবং মন্ত্রাদিতে শাস্ত্রীয় বন্ধন নেই। নিজেদের সম্প্রদায়ের পূজারীই পূজো করে। যুবক যুবতীরা দেবতার সম্মুখে নাচগান করে এবং পবিত্র জীবন যাপনের শপথ নেয়।

গাভুরাকে কেন্দ্র করে কালিয়াগঞ্জ থানার আখানগর, ভেউড়, হাটকালিয়াগঞ্জ ও তরঙ্গপুরের আশে পাশে যে লোককাহিনী প্রচলিত আছে তা হলো এই—

বহুযুগ আগে শ্রীমতী নামে এক সুন্দরী যুবতীকে পাবার জন্য পাগল হয় এক যুবক। একদা নির্জনে একা পেয়ে ঐ যুবক ধরতে যায় শ্রীমতীকে তখন শ্রীমতী প্রাণ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয় তার পা। রক্ত ঝরতে থাকে মাটির বুকে। কিন্তু ঐ যুবকের হাত থেকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না শ্রীমতী। শ্রীমতীর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু ঘটে ঐ যুবকেরো। তারপরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখে যে পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল শ্রীমতী এবং যেপথে ঝরেছিল তার পায়ের রক্ত সেইখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। সে নদীর নাম শ্রীমতী। আজো হাটকালিয়া গঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সেই নদীর ক্ষীণধারা—'ছিরামতী' নাম নিয়ে।

ঐ করুণ স্মৃতিকে সামনে রেখেই পরবর্তীকালে উত্তর দিনাজপুরের ঐ অঞ্চলে চালু হয়েছে 'গাভুরা'র পূজো। যাতে দেবতার কৃপায় ঐ ধরণের হৃদয় বিদারক ঘটনা আর না ঘটে।

(৩২) সত্যপীর : উত্তরবঙ্গের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি মুসলিম পীরগণও দেবতার ন্যায় পূজো পেয়ে থাকেন। বাৎসরিক উৎসবে পীরের দরগায় সকল সম্প্রদায়েরই লোকজন অংশ গ্রহণ করে থাকে। তবে বিভিন্ন পীরের মধ্যে সত্যপীর এবং মাণিকপীরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে।

হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দুই পীর। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ হয়েছেন মুসলমানদের সত্যপীর। ইসলামে পীরকে সিন্নি দেওয়ার রীতি আছে সেই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে সত্য নারায়ণের পূজোতেও। অনেকে মনে করেন পঞ্চদশ শতকে রাজা গণেশের কন্যাই প্রথমে এই সত্য নারায়ণ বা সত্যপীরের পূজো শুরু করেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে।

উত্তরবঙ্গের বহু দরগায় সাদা ঘোড়ার পিঠে তরবারি হাতে যে পীরকে দেখা যায় তিনিই হলেন সত্যপীর। সত্যপীরের কাছে সিন্নি ছাড়া ঘোড়াও দান করা হয়ে থাকে। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতেও সত্য পীরের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। মুসলমানরা মূর্তি পূজোর বিরোধী হলেও সত্যপীরকে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পূজো করে এবং সমবেত ভাবেই যোগ দেয় উৎসবে। পূজোর সময় সত্যপীরের পাঁচালীও পাঠ করা হয় সুর করে।

(৩৩) মাণিক পীর ও অন্যান্য পীর : মাণিক পীর হলেন সুফী সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পীর। তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী। তাঁর এক হাতে 'আসাদণ্ড' অন্য হাতে ব্যাধিরপাত্র। তিনি বিশ্বাসীদের মঙ্গল করেন। অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে সত্যপীর এবং মাণিক পীর ছাড়াও যেসব পীরগণ বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও মান্যতা পেয়ে থাকেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে কুচবিহারের মহারাণী গঞ্জের তোর্সাপীর, হলদী বাড়ীর খন্দকারপীর, মালদহের বালাপীর, কসবো মহেশের পীরমখদুম, উত্তর দিনাজপুরের জেঠাপীর, ল্যাংড়াপীর প্রভৃতি।

(৩৪) করম পূজা : উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যে করমপূজার প্রচলন আছে। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সকলে একটা নির্দিষ্ট পূজোর স্থানে জমায়েত হয়ে করমগাছের একটা ডাল ভেঙে ঐ ডালের গায়ে লাল-হলুদ সূতো জড়িয়ে গামছা দিয়ে ভাল করে ঐ ডালটিকে মুড়ে একজায়গায় পুঁতে দেয়। ঐ ডালটিই 'করম দেবতা' রূপে পূজিত হয়। পূজারী নিজেদের সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত হয়। পূজারী উপোসী থেকে নূতন কাপড় পরে শুদ্ধচিত্তে পূজো করে। ফল, ফুল, চিনি বাতাসার নৈবেদ্য দেওয়া হয়। ধূপ জ্বলে। সিঁদুর লেপা ঝুড়িতে মেয়েরা শসা ও বিভিন্ন ফলমূল নিয়ে আসে।

সাধারণত রাতের প্রথম প্রহরেই পূজো শুরু হয়ে থাকে। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অপদেবতার হাত থেকে ফসল রক্ষাই এই করম পূজোর উদ্দেশ্য। অনেকক্ষেত্রে খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হয়। পশু পাখীও বলি দেওয়া হয় কোথাও কোথাও। ব্রত কথা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় নাচগান। নাচের তালে তালে তারা গায়—

"বারো মাইনাসে আঁইলেরে কারাম,
নেহারি কারাম, দেহারি কারাম, তেহারি কারাম,
সাওয়া রোকে, বড়ী দাগা দেলেরে কারাম।

(গঙ্গারামপুর)

নেহারি কারাম, দেহারি কারাম, তেহারি কারাম।

অর্থাৎ বারো মাস পরে তুমি এসেছো হে কারাম। একবার, দুবার, তিনবার হয় কারাম উৎসব। এসো আমরা মিলিত হই একসাথে।

পরের দিন বিসর্জন দেওয়া হয় করমকে। মাদলের বোল আর বাঁশীর সুরে, নৃত্যের তালে আর অপূর্ব সঙ্গীতের মাধুর্যে রমণীয় হয়ে ওঠে পূজানুষ্ঠান। সৃষ্টি হয় অপূর্ব মাদকতার।

করম পূজা আসলে কৃষিভিত্তিক পূজা উৎসব।

(৩৫) হাট ঘুরাণী : রাজবংশী সমাজে জলপাইগুড়ি জেলার সুখানী গ্রামে 'হাট ঘুরাণী' নামে এক লৌকিক দেবীর পূজো করা হয়ে থাকে। ইনি অজন্মা, অনাবৃষ্টি এবং মড়ক প্রতিরোধের দেবী। পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মন্ত্র এবং পূজাচার শাস্ত্রীয় নয়।

(৩৬) কুলাইচণ্ডী : উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে মেয়েরা কুলাইচণ্ডী নামে এক লৌকিক দেবীর পূজো করে থাকে। বিভিন্ন ফল, ফুল, আলোচাল, দুধ, দই, মিষ্টি, তুলসী পাতা ইত্যাদি লাগে পূজোয়। মেয়েরা সারাদিন উপোস থেকে ব্রতপালন করে ও ঘটে দেবীর পূজো করে। যেকোন কঠিন রোগ সেরে যায় কুলাইচণ্ডীর পূজো করলে। এই বিশ্বাসেই কুলাইচণ্ডীর পূজো হয়।

(৩৭) অথাই পথাই : কুচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অথাই-পথাই' নামে এক লৌকিক দেবতার পূজো প্রচলিত আছে। 'অথাই পথাই' আসলে অপদেবতার পূজো। যাবতীয় কুগ্রহ কেটে যায় এই দেবতার পূজো করলে। পূজোর আচারবিধি শাস্ত্রীয় নয়। নিজেদের মধ্যে থেকেই পুরোহিত নির্বাচন করে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো করে।

(৩৮) এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা দেবী, ধূমবাবা, বুড়া-বুড়ী ঠাকুর, পেট কাটি, সন্ন্যাসী ঠাকুর ও মহাকালের পূজা হয়ে থাকে বেশ জাঁকজমক করেই।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার লোক সংস্কৃতি— (প্রথম খণ্ড) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(২) বাংলা সাহিত্যের নানারূপ— শুদ্ধসত্ত্ব বসু।
(৩) গম্ভীরা— প্রদ্যোৎ ঘোষ।
(৪) বাংলার লৌকিক দেবতা— গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।
(৫) বাংলার লোক দেবতা ও লোকাচার— ডঃ কামিনী কুমার রায়।
(৬) পশ্চিমবাংলার তীর্থ— প্রলয় সেন।
(৭) পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা— অশোক মিত্র।
(৮) হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ— ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
(৯) হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
(১০) উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্ম—দিগ্বিজয় দে সরকার।

নবম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের উৎসব ও পার্বণ

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন ধরণের উৎসব ও পালা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এর মধ্যে যেমন আছে ফসল কেন্দ্রিক পার্বণ তেমনি আছে ঋতু উৎসবও। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশেও নানাবিধ পালাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গবাসীদের আদিম বিশ্বাস, লোকাচার ও রীতিনীতির অনেক কিছুই জানা যায়। এখানে ঐসব পালাপার্বণের কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হলো।

(১) নবান :

উত্তরবঙ্গের নবান বা নবান্ন হলো মূলতঃ শস্য উৎসব। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং পোলিয়াদের অন্যতম প্রধান উৎসব হলো এই নবান। অগ্রহায়ণ মাসে পাকাধান ঘরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বয়ে যায় আনন্দের ঢেউ। উৎসবের মেজাজ লাগে সকল শ্রেণীর নরনারীর মনে। হাট থেকে বড় বড় বোয়াল-চিতল মাছ কিনে এনে আত্মীয় কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করে তারা!

নতুন ধানের নতুন চাল দিয়ে ভাত রান্না হয়। তরিতরকারী মাছ-মাংস রান্না হয়। ঐসব বিবিধ ব্যঞ্জন ও নবঅন্ন প্রথমে দেবদেবী-পশুপাখী ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। তারপরে নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনকে নতুন অন্ন পরিবেশন করে গৃহস্থ নিজে খেতে বসে বাড়ীর অন্যান্যদের সাথে। মেয়েরা এই উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর ঝক্ ঝকে করে তোলে। আলপনাও দেওয়া হয় অনেক সময়। গান বাজনার ব্যবস্থাও হয় কোন কোন বাড়ীতে।

উত্তরবঙ্গে প্রায় সারামাস ধরেই চলে এই উৎসব। পৃথিবীর সবদেশেই গ্রামীন মানুষরা নতুন ফসল ঘরে উঠলে আনন্দে মাতে। হাজার হাজার বৎসর ধরে চলে আসছে এই পার্বণ বা উৎসব।

ফসল বোনার আগের উৎসব গাজন। আর ফসল তোলার পরের উৎসব এই নবান। মার্কিন দেশে এই উৎসব থ্যাঙ্কস গিভিং এবং রাশিয়ায় রাদুনিৎসা নামে প্রচলিত। এই উৎসবে আনুষ্ঠানিক রীতি ও আচার অপেক্ষা আনন্দের দিকটাই বড়।

নতুন ধানের চালের খাদ্য পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলে 'কাক' রূপে তারা নাকি গ্রহণ করে থাকে। কাককে পূর্ব পুরুষের প্রতিভূ রূপে কল্পনা একধরণের 'টোটেম' ভাবনা ছাড়া কিছু নয়। তবে সারা বছর ধরে শস্যকে ঘিরে যত উৎসবানুষ্ঠান হয় তার মধ্যে নবান বা নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে সন্দেহ নেই।

(২) পৌষ পার্বণ :

নবান্নের রেশ কাটতে না কাটতেই এসে যায় পৌষ পার্বণ। অগ্রহায়ণের শুভদিন দেখে যে পাকা ধান কেটে নিয়ে আসা হয় ঘরে সেই ধানের শীষ ঘরের চালে গুঁজে রাখা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে ঐ ধানের শীষকে পূজো করে বাড়ীর মেয়েরা। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'আওরি-বাওরি'। মেয়েরা সুর করে গায়—

'আওরি বাওরি
তিন দিন পিঠা খাওরি।
তিন দিন না যাও কোথা
ঘরত বৈসে খাও পিঠা।

(তরঙ্গপুর/কালিয়াগঞ্জ)

পূজোর পরে ঐ ধানের শীষ গোলার চালে বা ঘরের চালে বেঁধে রাখে।

পৌষ পার্বণে বাড়ীর মেয়েরা এবং ছোটরাই মুখ্য ভূমিকা নেয়: বাড়ীর উঠোনে এবং সিঁড়িতে আলপনাও দেওয়া হয় এই উপলক্ষ্যে। নানারকম পিঠে পুলি ও আলোচালের গুঁড়ো, গুড় এবং ক্ষীর, নারকেল দিয়ে তৈরী করা হয়। প্রতিবেশীদের বাড়ীতেও পাঠানো হয় পিঠে-পুলি। তিন দিন ধরে চলে এই পার্বণ।

পৌষ নিয়ে আসে শস্য সম্ভার। তাই শীতের প্রকোপ সত্বেও পৌষকে বিদায় দিতে মন চায় না। তাই পৌষকে মিনতি জানানো হয়—

থাক্ পৌষ যাস্ না।
তোক্ বিদায় দিম্ না।

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই পৌষকে চলে যেতে হয়। সবাই প্রতীক্ষায় থাকে আবার কবে ফিরে আসবে সে। তবে পৌষ পার্বণ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

(৩) সোহরায় পরব বা বাঁধনা পরব :

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা পালা পার্বণের প্রচলন আছে। সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় পরব হলো সোহরায় পরব।

(ক) সাঁওতাল : পৌষ সংক্রান্তির পনেরো দিন আগে গ্রামের 'জগ মাঝি' বড় মাঝির নির্দেশে বাড়ী বাড়ী ঘুরে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হবার জন্যে সকলকে বলে। তারপর পরবের দিনে পূজোর সামগ্রী নিয়ে 'গোড়েৎ' হাজির হয় নির্দিষ্ট স্থানে। সকলের সামনে প্রথমে 'জাহেরএরা' 'গোঁসাই এরা' ও মারাং বুরুর পূজো হয়ে থাকে। সকলে সুর করে গান ধরে—

'জাহেরএরা, গোঁসাইএরা, মারাংবুরু হো।
দেওয়া-সেওয়া দিন হো দেওয়া সেওয়া দিন।
সেটের আকান দিন হো সেটের আকান দিন।
সুখ নিরাই দিনহো সুখ নিরাই দিন।'

(কামারপাড়া/বালুরঘাট)

অর্থাৎ প্রথম দিন জাহেরএরা গোঁসাইএরা ও মারাংগুরুর ভক্তি ও পূজোর দিন। এই দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত যেন সুখের হয়।

তারপরে এক বোন ঘটির জল দিয়ে হাতির সমান বড় পরব সোহরায় পরবকে আমন্ত্রণ জানায়। অন্যজন ধূপ জ্বালিয়ে দুর্বাঘাসে পূজো করে সোহরায়কে।

এই পরবের দ্বিতীয় দিনে সকলে মিলে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে ও তাদের পূজো করে। দুই বোনে পূজোর স্থান পরিষ্কার করে। একজন দুধ দিয়ে মুছে দেয় পূজোর স্থানটা। দ্বিতীয় জন দই দিয়ে লেপে দেয়। এই সময়ে বোন দাদার কাছে গানের মাধ্যমে প্রার্থনা জানায় যেন তাকে দাদা আর শ্বশুর বাড়ী না পাঠায়। দাদাও প্রতিশ্রুতি দেয়—

বোহিন্‌গো হাতেকা শাংখা বিচম্‌।
বোহিনগো কানেকা সোনা বিচম্‌।
তাওনা বোহিনগো লিবে 'চম্পাগড়ে'।

পরবের তৃতীয় দিনে গরু মোষের পূজো হয়। খুব ভোরে পিঠে তৈরী করে গরু মোষের গলায় বেঁধে দেওয়া হয়। মাদল বাজিয়ে ধামসা পিটিয়ে গরু মোষদের উত্তেজিত করা হয়। গ্রামের লোকেরা ঐ সব পিঠে গুলো খুলে নেবার চেষ্টা চালায়। এতে অনেকে আহতও হয়। অনেক সময় আবার গরু মোষগুলোকে গাছে বেঁধে রেখেও পিঠে ঝুলানো হয়।

চতুর্থ দিনে চলে নাচ আর গান। মাদল আর নাগরার তালে তালে বাঁশীর মোহন সুরে মেতে ওঠে ছেলে মেয়েরা।

পঞ্চমদিনে গ্রামের যুবকরা শিকারে বেরিয়ে পড়ে। এই শিকারকে বলে আহেরিয়া। শিকার থেকে ফিরে এসে যুবকরা মাতে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায়। যে সবচেয়ে বেশী দক্ষতা দেখায় তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এই লক্ষ্যভেদ অনুষ্ঠানের পরেই 'সোহরায়' পরব শেষ হয়।

আসলে এই উৎসব বা পরব হলো সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শস্য উৎসব বা পরব। গরু মোষ পূজো এবং গলায় পিঠে বাঁধার মধ্য দিয়ে ফসলের সঙ্গে যুক্ত বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এককালে শিকারই যে তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল সেই ইতিহাসকে জাগরুক করে রাখার জন্যই সম্ভবত শিকারও যুক্ত হয়েছে এই পরবের সঙ্গে।

(খ) ওঁরাওদের সোহরায় পরব : একটু ভিন্ন আকারে উত্তরবঙ্গে ওঁরাওদের সহরায় পরব চলে তিনদিন ধরে। করম উৎসবের পরে এটাই তাদের বড় পরব।

উৎসবের প্রথমদিনে ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে। পরের দিন গোয়াল ঘরে পূজো হয়। গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়াদের স্নান করানো হয়। তারপরে ঐ সব পশুদের তেল সিঁদুর মাখানো হয় ও মাসকলাই ও চাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করে গবাদি পশুদের খাওয়ানো হয়। সব শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়। নাচগানও চলে কোথাও কোথাও এই উপলক্ষ্যে।

মূলতঃ শস্য কেন্দ্রিক পরব হলেও গৃহপালিত পশুদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে উপকার পায় তারা তারই প্রতিদান দিয়ে থাকে যেন এই বিশেষ পরবের মাধ্যমে।

(৪) সহরুল বা বাহাপরব :

(ক) সাঁওতাল : উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও ওঁরাওদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরব হলো এই সহরুল বা বাহাপরব। বসন্তের মাতাল দিনে সাঁওতালদের এই পরব চলে দুদিন ধরে। প্রথমদিন চলে জাহের এরা, গোঁসাই এরা এবং মারাং বুরুর পূজো। দ্বিতীয় দিন চলে রং খেলা। রাতের আসরে মদির পরিবেশে শুরু হয় নাচগান।

প্রথম দিনে সাঁওতাল যুবকরা উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে সেখানে পূজোর শেষে খিচুড়ি রাঁধে ও সবাই মিলে খায়। তার পরে 'নাইক' একজন অবিবাহিত যুবককে সঙ্গে নিয়ে একটা কুলোয় ফুল নিয়ে বাড়ী বাড়ী যায়। ঐ সব বাড়ীর বউ বা মেয়েরা এসে তাদের পা ধুইয়ে দেয় জল দিয়ে। সবশেষে যায় মাঝির বাড়ী। রাতে চলে নাচ গান। চলে ঢালাও দেশী সুরা পান। এটি আসলে আদিম ঋতু উৎসব বা বসন্তোৎসব।

(খ) ওঁরাওদের বাহাপরব : উত্তরবঙ্গের ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই উৎসব চলে দুদিন ধরে। বসন্তের মদির পরিবেশে যখন গাছে গাছে ফুল, মদির বাতাসে কোকিলের কুহু কুহু তখনই শোনা যায় মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বোল। বাঁশীর সুরে প্রাণে লাগে দোলা। বুকে জাগে খুশীর ঢেউ। আর তখনই মেতে ওঠে যুবক যুবতীরা উৎসবের আনন্দে।

প্রথম দিন ওঁরাও যুবকরা গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে একটা-নির্জনস্থানে কিছু গোপন অনুষ্ঠান করে যা মেয়েদের দেখা বারণ।

দ্বিতীয় দিনে শুরু হয় রং আর আবির মাখানোর খেলা। সন্ধ্যায় চলে নাচ আর গান। মেতে ওঠে মাদলের বোলে আর বাঁশীর সুরে সমবেত যুবক যুবতী। বাঁধন হারা উল্লাসে ভেসে যায় ওঁরাও পল্লীর ছেলে বুড়ো যুবক যুবতীর দল।

(৫) আষাড়ীয়া পরব :

উত্তরবঙ্গে আযাড় মাসে ফসল বোনার আগে সাঁওতাল এবং ওঁরাও উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই পরবের আয়োজন করে থাকে।

নির্দিষ্ট দিনে ফুল, দুধ কলা, ধূপ, সিঁদুর ইত্যাদি পূজোর উপকরণ নিয়ে হাজির হয় সবাই পূজোর স্থানে। সেখানে বিভিন্ন দেবদেবী ও পূর্ব পুরুষদের পূজো করে খাওয়া দাওয়া চলে। পূজোর সময় পায়রা বা মোরগ বলিও দেওয়া হয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সবাই মিলে মাঠে নামে। শুরু হয় ফসল বোনা বা লাগানোর কাজ। যাতে ভাল বৃষ্টি হয় এবং ফসল ভাল হয় তাইই এই পরবের অনুষ্ঠান।

(৬) ছত্তাবোঙ্গা বা ছাতাপরব :

উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সাঁওতালরা 'ছত্তাবোঙ্গা' বা 'ছাতা পরব' বলে একটা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ইঁদপূজোর সাদৃশ্য আছে। ইঁদ পূজোয় যেমন শালগাছ কেটে মাটিতে পোঁতা হয় তেমনি এই ছাতা পরবেও মাটিতে পোতা হয় একটি বাঁশ। তবে ইঁদপূজোয় দুটি শাল গাছ থাকে। একটি ইন্দ্র ও অন্যটি মাসীর প্রতীক। শাল গাছের মাথায় থাকে উল্টানো ঝুড়ি। আর এক্ষেত্রে থাকে তাল পাতার ছাতা।

ঐ বাঁশের গোড়ায় চাল-ফুল, ফল, ধূপ ও সিঁদুর ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে পূজো করা হয়। ঐ পূজোর স্থানে বাঁশটির গোড়ায় ঘটভর্তি জল রেখে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা ধরণের শস্যের বীজ। পূজো শেষ হলে ছেলেমেয়ে-বুড়ো-বুড়ী-যুবক যুবকতীরা সবাই মিলে ছাতা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। ছাতার পাতাগুলো সব খসে খসে যতক্ষণ না মাটিতে পড়ে ততক্ষণে চলে ঐ ঢিল ছোঁড়া।

এই ছত্তাবোঙ্গা বা ছাতা পরবের মূলে রয়েছে শস্যভাবনা। ছত্রধারী দেবতা মাঠের ফসল রক্ষা করবেন, অপদেবতার হাত থেকে শস্য বাঁচাবেন এই-ই আশা। ছাতার পাতা মাটিতে পড়ার অর্থ সুবৃষ্টি। শস্যের দানা ছড়ানোর অর্থ সুফসল।

উত্তরবঙ্গের ছাতা পরবে লৌকিক ছত্রদেবতার পূজা এবং বৈদিক ইন্দ্রধ্বজ পূজা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

(৭) উত্তরবঙ্গের হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়াও যেসব মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তারাও নানাবিধ পালাপার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে।

(৭) মহরম :

'মহরম' আসলে কারবালা প্রান্তরে এজিদের সেনাবাহিনীর হাতে হোসেন ও তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সঙ্গীদের নির্মম মৃত্যুবরণের করুণ কাহিনীর স্মৃতিবাহী। এই দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের এলাকার নির্দিষ্ট কারবালা মাঠে উপস্থিত হয়ে 'হায় হাসান! হায়! হোসেন' বলে বুক চাপড়িয়ে কাঁদেন আর আর্তনাদ করেন। কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় এবং লাঠি খেলাও হয়। শোভাযাত্রা সহকারে তাজও বের হয় কোথাও কোথাও।

(৮) ইদল ফিতর :

এই উৎসবে পারস্পরিক মিলনের পূর্বে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কৃচ্ছ সাধনা ও সংযম অভ্যাসের জন্যে 'রোজা' পালন করে থাকেন। কোরাণ পাঠ, নামাজ ও নানাবিধ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত থাকেন সারাদিন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোজা ভাঙেন তাঁরা। শেষরোতে 'সেহেরী' খান। অনেকে 'এতেকাফ' পালন করে থাকেন রমজান মাসের শেষ কয়েক দিন। রমজানের চাঁদ দেখার পরেই রোজা শেষ হয়। সকলের মিলন এবং প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়।

(৯) ইদুজ্জোহা :

এই পরবের উদ্দেশ্য হলো ত্যাগ ও উৎসর্গ করার শিক্ষালাভ। কোন না কোন নিখুঁত প্রাণী বলি দেওয়া হয় এই পরবের শেষে। ইব্রাহিমের পুত্র বলিদানের স্মৃতিবাহী এই বলিদান প্রথা। সবচেয়ে প্রিয়জনকে বলি বা উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয় এই পরব।

(১০) খৃষ্ট পরব :

উত্তরবঙ্গের খৃষ্ট সম্প্রদায়ের নরনারীরা বড়দিন, নববর্ষ, গুড় ফ্রাইডে, ইস্টারসাটারডে প্রভৃতি নানাবিধ খৃষ্টীয় উৎসবও পালন করে থাকেন।

(১১) বৌদ্ধ পরব :

দার্জিলিং জেলার ভূটিয়া বস্তী, বৌদ্ধ বিহার তামাং, আলুবাড়ী ও ঘুম বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধ জয়ন্তীতে পূজো, হোম, ধর্মগ্রন্থপাঠ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশেষ উৎসব পালন করে থাকেন বৌদ্ধরা।

দশম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান

সেই সুপ্রাচীন আদিমযুগ থেকেই মানুষ চেয়েছে ধ্বংস ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ। চেয়েছে শক্তি ও সমৃদ্ধি, পূরণ করতে চেয়েছে নিজেদের কামনা-বাসনা। চেয়েছে সুখ। চেয়েছে আনন্দ। হাসিতে-গানে, আবেগে ও উচ্ছ্বাসে চেয়েছে উদ্বেল হতে। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে উপলব্ধি করেছে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব। আর তাই-ই নানাবিধ পূজা পার্বণ উৎসব ও ব্রতাদির মাধ্যমে মানুষ ঐসব অলৌকিক শক্তিকে চেয়েছে তুষ্ট করতে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় ঐ সবের পিছনে কাজ করেছে নানা সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের বাসনা, সমৃদ্ধির কামনা, আয়ু, আরোগ্য ও জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার ঐকান্তিক বাসনা।

যুগে যুগে বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে বহু নতুন বিষয়, প্রথা ও লোকাচার সংযুক্ত হলেও আদিম বিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কারগুলো কিন্তু চিনে নিতে পারা যায় সহজেই। আদিম ধর্ম ধারণার উপদানগুলো বিভিন্ন দেবমূর্তি, আলপনা, পূজাচার ও মন্ত্রাদিতে টিঁকে আছে আজও।

আদিম শিকার নির্ভর ও পরবর্তী কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনের ছাপ লক্ষ্যকরা যায় গোলা, গোয়াল, ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পা, সূর্য্য, মাছ, বাঘ, পেঁচা, ইঁদুর ও বিভিন্ন পশুর আলপনায়। এছাড়া বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠানে যেসব উপাচার ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে পাওয়া যাবে নানা প্রতীক ভাবনার পরিচয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এইসব ব্রতাদির মধ্যে ব্যক্তিগত মঙ্গল বা কল্যাণ কামনার চাইতে পরিবার বা গোষ্ঠী বা সমাজের মঙ্গল কামনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলার ব্রতানুষ্ঠানের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাক বৈদিক যুগ থেকেই বাংলায় নানা ধরণের ব্রতাদির প্রচলন ছিল। আর তাই-ই আর্যরা অবজ্ঞা করেছেন বাঙালীকে 'ব্রাত্য' বলে।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও বিভিন্ন ব্রতাদি পালিত হয়ে থাকে। ঐসব ব্রতাদি শুধু যে উত্তরবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের মধ্যেই প্রচলিত তা কিন্তু নয়। জীবিকার সূত্রে বিভিন্ন সময়ে যারা এই অংশে এসেছেন বা পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে বিভিন্ন সময়ে যারা এই অংশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের ব্রতাদি প্রচলিত আছে। এখানে ঐসব ব্রতানুষ্ঠানের কয়েকটির কথা বলা হচ্ছে। তবে ঐসব ব্রতাদি পালন করে থাকে মূলতঃ মেয়েরাই।

(১) মাঘীব্রত :

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বয়স্কা মহিলারা সারাদিন উপোস থেকে মাঘ মাসের প্রতি রবিবার মাঘীর ব্রত পালন করে। মাঘীর কোন মূর্তি থাকে না। কখনো কোন

গাছের ডাল কেটে বাড়ীর উঠোনে পুঁতে তার সামনে ঘট রেখে চারপাশে আলপনা দিয়ে পূজো করা হয়। সারাদিন উপোস থেকে রাতে আতপচাল সিদ্ধ করে খায়। শেষ রবিবারে ফল, দুধ, আতপচাল ও মিষ্টির নৈবেদ্য সাজিয়ে বিশেষ পূজোর ব্যবস্থা হয়। মন্ত্র অতি সাধারণ। যার মধ্য দিয়ে মাঘীর কাছে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য যেমন প্রার্থনা জানানো হয় তেমনই পরিবারের সকলের মঙ্গলও কামনা করা হয়।

পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে যে 'মাঘমণ্ডল' ব্রত প্রচলিত আছে, সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও আচারের সঙ্গে এর কিন্তু পার্থক্য আছে। মাঘী ব্রত পালন করে বয়স্কারা কিন্তু মাঘ মণ্ডল ব্রতপালন করে ছোট ছোট মেয়েরা। মাঘী মণ্ডলে গান গেয়ে মেয়েরা সূর্য্যের বিয়ের বর্ণনা দেয় ও ব্রত কথা বলে। সূর্য্যের মাহাত্ম্যও বলে। ৫ বছর করতে হয় পরপর ঐ ব্রত: ফুল, দুর্বা দিয়ে সূর্য্যের পূজো করে। কিন্তু মাঘী ব্রতে এইসব অনুষ্ঠান থাকে না।

(ভেউড়/কালিয়াগঞ্জ উত্তরদিনাজপুর)

(২) ভাঁজো ব্রত :

মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে ভাঁজো নামে একদেবীর পূজো করে গ্রামের ছেলে মেয়েরা। ভদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী থেকে শুরু হয় এই পূজানুষ্ঠান এবং দশ দিন ধরে চলে।

পূজোর দিন গ্রামের কিছু কুমারী মেয়ে গ্রামের বাইরে কোন একস্থানে সমবেত হয় মাটির ঢেলা সংগ্রহ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য একদল ছেলে সেখানে আসে। দুইদল নাচ গান করে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। তারপর মাটির ঢেলা সংগ্রহ করে দুদলই ফিরে যায় নিজেদের গ্রামে।

শুদ্ধচিত্তে ধোয়া কাপড়ে ঐ মাটি দিয়ে 'ভাঁজোর' মূর্তি তৈরী করা হয় এবং কিছুটা মাটি পাত্রে রেখে তাতে বিভিন্ন শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আটদিনের দিন অঙ্কুরিত চারাগাছ গুলো রাখা হয় 'ভাঁজোর' পাশে। তারপরে পূজো করা হয় ভাঁজোকে। পূজোর শেষে ভাঁজো ও চারাগাছগুলোকে ঘিরে চলে নাচ গান। নবম দিনে ভূট্টার চারার সঙ্গে কলাই চারার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন রাতে মেয়েরা গান গায় সমবেত ভাবে। ঘুরে ঘুরে নাচেও তারা—

'ভাঁউজ দিদিয়ট,ডুলিত আইলাম তাড়াতাড়ি,
কাঁঠালের পাত চিকন চিকন খামাত লম্বাটেড়ি।
বৈশাখ মাস দেখতে যেমন জলছত্রের হাঁড়ি।
ভাঁউজ দিদিয়ট্ ডুলিত আইলাম তাড়াতাড়ি।

(বীরনগর/কালিয়াচক/মালদা)

ভাঁজো মা নয় এখানে দিদি রূপেই তাঁর পরিচিতি। দশমদিনে নাচ গান করে বাজনা বাজাতে বাজাতে ভাঁজোকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। চারাগুলোকে রেখে দেওয়া হয় ঘরের চালে।

ভাঁজো আসলে শস্যের দেবী। ভাঁজোকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে ফসল ভাল হয় এবং সকলের মঙ্গল হয়। এই ব্রত ও পূজানুষ্ঠান মূলত কুমারী মেয়েরাই করে থাকে যথাযথ নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে।

'ইতু' পূজোতে যেমন ঘটের চারদিকে বীজ ছড়িয়ে শস্যের চারা করা হয় এক্ষেত্রেও তাই, 'ইতু' সূর্য্যের প্রতীক হলেও মূল পূজোর ব্যাপারটা কিন্তু সেই শস্যকে ঘিরেই। উভয়ক্ষেত্রেই কুমারীরাই পূজো করে থাকে। ব্রতানুষ্ঠান এবং পূজাচারের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আদিম শস্য পূজোর মূল উৎসটি বুঝতে অসুবিধা হয় না এই দুইক্ষেত্রে।

(৩) জলোৎসবব্রত :

বৃষ্টির কামনায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতোই উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী মেয়েরা বৈশাখ মাসে উপবাসী থেকে কোন নির্জনস্থানে সমবেত হয়ে মাটির স্তূপে বরুণ দেবতার পূজো করে। একটা গর্ত কেটে ঘটি বা ঘড়ায় করে জল ঢালে ঐ গর্তে এবং বরুণ দেবতার কাছে জলের জন্যে প্রার্থনা জানায় সকলে। জল ঢালার সময়ে ঐ ছোট্ট পুকুরের চারপাশে তারা নাচে আর গায়—

"আইসোহে মেঘা বইসো হে মেঘা
খাও বাটার পানহে।
তুহে মেঘাশালা বহিনের ভেরুয়ানারে।
সারারাত কাটালি বহিনের বিছানায় নারে।"

গান গাইতে গাইতে এর পরে তারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

(৪) সাইটোর ব্রত :

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলার রাজবংশী মেয়েরা 'সাইটোর' নামে একব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা। অবশ্য অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যেও 'সাইটোর' নামের এক ব্রত পালিত হয় কোন কোন অঞ্চলে তবে এই ব্রতের অনুষ্ঠান ঐ অন্নপ্রাশনের ব্রত থেকে আলাদা।

সধবা এবং সন্তানবতী মেয়েরাই এই ব্রতানুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই ব্রতে একটা ঝুড়িতে আলু, পটল, কলা, চিনি, গুড়, মুড়ি, খই প্রভৃতি যত্ন করে একটা পরিস্কার কাপড়ের ওপর রাখা হয়। তারপর ঐ ঝুড়িটি ওপরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধ্যা নারী নতুন কাপড় পরে ঐ ঝুড়ির নীচে বসে আঁচল বিছিয়ে। যথা সম্ভব পরিস্কার কাপড় পরে শুদ্ধ চিত্তে সমবেত ব্রতিনীরা এরপর 'সাইটোর' গান শুরু করে—

'এ্যাক সাতের চেংড়ি সউক
ছাওয়ার মাওরে।
হয়ে ভগমান, মোর সোনাটা
জনমের বাঁজারে।

(নিগমনগর/কুচবিহার)

গান গাইতে গাইতে ব্রতিনীরা জোরে ঐ ঝুড়ি নাড়াতে থাকে। এর ফলে ফল বা কোন উপাচার ঐ বন্ধ্যা নারীর আঁচলে পড়লে সে কিছুটা খায় ও বাকীটা তুলে রাখে।

সকলের সমবেত প্রার্থনায় 'সাইটোর' দেবীর মন গলে যাবে এবং দেবী প্রসন্না হয়ে ঐ বন্ধ্যা নারীর গর্ভে সন্তান দেবেন এই অভিপ্রায়েই যথা সম্ভব শুদ্ধচিত্তে স্নান করে শুদ্ধ পোশাকে উপোস করে মেয়েরা এই বিশেষ ব্রতটি পালন করে থাকে।

সাইটোর দেবী আসলে মা ষষ্ঠীরই প্রতিভূ। মা ষষ্ঠীর কৃপা না হলে সন্তান হবে কি করে? তাই-ই এক সাথের সন্তানবতী চেংড়ী মেয়েরা সখীর জন্য সন্তান কামনা করে সাইটোর দেবীর কাছে।

(৫) সাইটালব্রত :

কুচবিহার জেলার বিভিন্ন অংশে ধুমধাম করেই ষষ্ঠী পূজোর দিন মেয়েরা সাইটাল ব্রত পালন করে থাকে। এই উপলক্ষ্যে শোলার মূর্তি তৈরী করে মেয়েরা পূজো করে। পূজোর মন্ত্র এবং আচার শাস্ত্রীয় নয়। খই, চিড়ে, দুধ, দই, মুড়ি, মুড়কি কলার ভোগ দেওয়া হয়। সন্তানের এবং পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনাই এই ব্রত ও পূজোর মূল উদ্দেশ্য।

পূজো শেষ হলেই সধবারা নাচ গান শুরু করে দেয়। নাচ গানের মধ্য দিয়ে অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি পবিত্রতার প্রকাশ ঘটে থাকে। নাচের তালে তালে মেয়েরা যে গান গায় তার মূল কথা হলো—

'হে দেবী' কি দিয়ে তোমার বন্দনা করি বল?
ফল পাখীতে ও বাঁদরে খায়।
দুধ মানুষে ও বাছুরে খায়।
চিনি বা গুড় পিঁপড়েতে খায়।
কি দিয়ে তোমার পূজো করি বল?
বনের ফুল দিয়েই তোমার পূজো করি মা।'

(নিগমনগর/কুচবিহার)

সকলের মধ্যে এমন আবেগ ও উদ্দীপনা আসে যে ষাট বছরের বুড়ী থেকে পাঁচ বছরের সব মেয়েরা নাচতে শুরু করে। নাচ যেন আর থামতে চায় না। নাচের ফাঁকেই তারা বারে বারে দেবীকে প্রণাম করে। একেবারে ক্লান্ত না হলে নাচ থামায় না কেউ। নাচে ও গানে তারা দেবীকে তুষ্ট করতে চায়। নিবেদন করতে চায় অন্তরের নিবিড় ভক্তি শ্রদ্ধা।

সাইটাল দেবী আসলে ষষ্ঠী দেবী। জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী পূজোর দিনে সাইটাল ব্রত ও পূজোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে কুচবিহারের রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের মেয়েরা।

(৬) ষাটপূজা ও ব্রত :

কুচবিহার জেলার কোচ সম্প্রদায়ের মেয়েরা 'ষাট' নামে এক দেবীর পূজা ও ব্রতপালন করে থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্যই এই ব্রত ও পূজো।

শুদ্ধচিত্তেই এই ব্রত পালন করে থাকে মেয়েরা। এই দেবীর পূজো করলে সকল অমঙ্গল দূর হয়। হারানো জিনিস পাওয়া যায়। মরে গেলে বাঁচানো যায়। অপথ সুপথ হয়। ভাঙা নায়ের কাণ্ডারী হয়। সতীনের ভয় দূর হয়।

দেবীর কোন মূর্তি নেই। মাটির স্তূপ বা ঘটে সিঁদুর ইত্যাদি লাগিয়েই পূজো করা হয়। মন্ত্রও অতি সাধারণ। সুর করে সারাদিন উপবাসী থেকে মেয়েরা সমবেত ভাবে মন্ত্র বলে—

"পুলি কাটারি জাগেং।
মোদের কাজে নাগেং।
হারালি পাং, মরলি জিয়াং।
অপথে—সুপথ হং।
হৈল সতীন গোড়ত কাটং।
দুপুরি আগুন ঝাঁক্ ঝাঁক্ নিবুং।

(সাহেবগঞ্জ/কুচবিহার)

উত্তরবঙ্গের ব্রতিনীরা শুদ্ধা তপস্বিনীর মতো ব্রতপালন করে। ব্যক্তির কল্যাণ নয়, ব্যক্তির সমৃদ্ধি বা একের মঙ্গল নয়। সকলের মঙ্গল, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণই ব্রতিনীদের ঐকান্তিক কামনা এবং তাদের সকল পূজো ও ব্রতপালনের উদ্দেশ্য।

(৭) কাত্যায়নী ব্রত :

কুচবিহারের কোন কোন অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা 'কাত্যায়নী' ব্রত পালন করে থাকে। সাধারণত রাসপূর্ণিমার সময়েই এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। 'সুকর' তৈরী করা এই ব্রতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ময়না গাছের ডাল কেটে একটা ঘর তৈরী করা হয়। ঐ ঘরকে বলে 'মঞ্জুসা'। মঞ্জুসার মাথায় মোচার চূড়া ও থাক্ থাক্ কারু কাজ করা কলার খোলার আচ্ছাদন থাকে। ঘরের ভিতরে ছোট্ট বেদীর ওপরে বসানো হয় একটা প্রদীপ। চারপাশে সাজানো হয় শোলার পাখী ও ফুল দিয়ে। বাতাসা, রাঙা আলু ও পাণিফল দিয়ে সাজানো হয় নৈবেদ্য।

সাতবছরের পর থেকেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রতে অংশ নিতে পারে। এই ব্রত পরপর তিন বা পাঁচ বছর ধরে করতে হয়। মেয়েরা শুদ্ধ হয়ে উপবাসে থেকে এই ব্রত পালন করে নিষ্ঠা সহকারে। এই ব্রতে সাঁঝের বেলায় হয় জলভরা। তার পরে চলে সুকর সাজানো ও পূজো। শেষ রাতে হয় শিবের স্তুতি ও গান। জল ভরতে যাবার সময় ঘট কাঁখে করে ব্রতিনীরা গাইতে গাইতে যায়—

"উঠো উঠো বাঙ্কুম পানি তুলিবার যাই।
বেলা নাই আর পানি তুলিবার যাই।
উঠো উঠো বড়বৌ পানি তোল আসি।
'আই মাও মুই কাঁচা পোয়াতি
কেম্‌নে উঠিম্ দোভাগ আতি ?
উঠো উঠো মেঝবৌ পানি তোল আসি।
'আই মাও মুই ভর যুবতী
কেম্‌নে উঠিম্ দোভাগ আতি ?' (ইত্যাদি)

সারারাত ধরে চলে পূজো ও ব্রতকথা শোনা। শেষ রাতে ব্রতিনীরা গায় শিবের বিয়ের গান—

একলল গারিল ছায়ে বায়ে
তাক খায় গেইল-মইষে হায়ে।
গৌরীর বিয়াও দিমু কুন দেশে ?
গৌরীর বিয়াও দিমু পূব দেশে।
পূব দেশে আছে নেংটিয়া শিব।
তার সনেই দিম্ গৌরীর বিয়া।
ঐ সে নেংটিয়া শিবের ঘর। (ইত্যাদি)

(সাহেবগঞ্জ/কুচবিহার)

ব্রতিনীদের বিশ্বাস পরপর তিন বা পাঁচ বচর ধরে এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে ভাল বর লাভ হয় মেয়েদের। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

(৮) শিবব্রত :

শিবরাত্রির ব্রত বা উৎসব একটি সর্বভারতীয় উৎসব। ফাল্গুনী চতুর্দশীতে সারা ভারতেই মেয়েরা এই ব্রত পালন করে থাকে। উত্তরবঙ্গেও মেয়েরা যথাযোগ্য মর্য্যাদায় শিবচতুর্দশীব ব্রত পালন করে থাকে। সারাদিন উপবাসে থেকে শিবের মাথায় জল ঢালে ও ব্রত কথা শোনে।

কিন্তু ঐ বিশেষ দিনের বিশেষ পূজো ও ব্রতানুষ্ঠান ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজ পুরের কোন কোন অঞ্চলে রাজবংশী মেয়েরা চড়কের দিন থেকে পরপর তিন দিন শিবের বিশেষ পূজো ও ব্রতানুষ্ঠান করে থাকে। অবশ্য কুমারী মেয়েরাই ঐ পূজো ও ব্রত পালন করে থাকে।

মেয়েরা মাটির শিব তৈরী করে সকালে বিকালে ঐ শিবকে নিষ্ঠাভরে পূজো করে শিবের মাথায় জল ঢালে, বেলপাতা দেয় ও মন্ত্র পড়ে।

তিনদিনের দিন পূজো শেষ হলে পরে শিবের স্তুতি করতে করতে মাথায় করে ঐ শিব মূর্তিকে বয়ে নিয়ে নদীতে বা দীঘিতে বিসর্জন দিয়ে স্নান করে কাছাকাছি কোন শিব মন্দিরে ঢুকে শিবকে প্রণাম করে বাড়ী ফেরে ব্রতিনীরা।

পূজোর সময়ে মেয়েরা উপবাসী থাকে। রাতের বেলায় নামমাত্র ফলাহার করে থাকে এবং শিবের ব্রত কথাও শোনে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কুমারী মেয়েদের এই শিবপূজো ও ব্রতপালনের ওপর শিবের গাজন ও চড়কের প্রভাব আছে বলে মনে করেন অনেকে।

(৯) কুমারীব্রত :

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কুমারী মেয়েরা কোন কুমারীকে শুদ্ধ পোষাকে সাজিয়ে দেবীর মতো আসনে বসিয়ে পূজো করে থাকে কোথাও কোথাও। ফুলের মালা পরিয়ে ধান দুর্বা, ফুল তুলসী দিয়ে পূজো করা হয় ঐ কুমারীকে।

সারাদিন উপবাসে থেকে শুদ্ধ দেহে ও শুদ্ধ মনে কুমারীরা এই পূজো করে থাকে। কুমারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানানো এবং কুমারীর মধ্যে পবিত্রতা ও দেবীত্বের উপলব্ধির জন্যই এই পূজো ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতপালন করা। দেবীর মতো সৎ লক্ষ্মী শ্রীযুক্ত, পুণ্যবতী, করুণাময়ী হবার বাসনাই প্রকাশ পেয়ে থাকে এই পূজা ও ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

(১০) অন্যান্য ব্রত :

এই সব ব্রতাদি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মেয়েরা যেমন নানাবিধ ব্রতাদি পালন করে থাকে তেমনি ব্যবসা বা চাকরী সূত্রে আগত বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের মেয়েরাও নানাবিধ ব্রতাদি পালন করে থাকে।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার ব্রত— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) বাংলার পূজাপার্বণ— মীরা চক্রবর্তী।
(৩) পূজা পার্বনের উৎস কথা— পল্লব সেনগুপ্ত।
(৪) লোক সাহিত্য— ডঃ আশরফ সিদ্দিকী।

একাদশ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোক মেলা ও লোক উৎসব

উত্তরাধিকার :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষরা যুগ যুগ ধরে পালন করে এসেছেন কতো না সব বিচিত্র পূজা পার্বণ ব্রত ও উৎসব। কতো না বৈচিত্র্য ও বর্ণময় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাঁরা। যুগ যুগ ধরে তাঁরা অভ্যস্ত হয়েছেন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে। প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যেই তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্য। নামমাত্র ফল, নৈবেদ্য এবং পূজোর উপকরণেই তাঁরা তুষ্ট করতে চেয়েছেন দেবতাকে। সাধারণ মানুষের মুখের সহজ সরল ভাষাতেই উচ্চারিত হয়েছে পূজার মন্ত্র। গাছতলায়, মাঠে, মাটির স্তূপে, পাথরে, গাছের ডালে বা গাছেই তাঁরা করেছেন দেবতার পূজো। বাহ্যিক হৈ চৈ বা বর্ণময় জাঁকজমকের আড়ালে চাপা পড়ে যায়নি এইসব সহজ সরল মানুষের ব্রত বা পূজোর মূল উদ্দেশ্য। উপলক্ষ্য ছাড়িয়ে যায়নি লক্ষ্যকে। দেবতা নেমে এসেছেন হাটে-মাঠে, গাছতলায়, নির্জন দীঘি বা নদীর পাড়ে, পাহাড় চূড়ায়, মাটির ঘরে, খড়ো চালের নীচে একান্তই সাধারণ হয়ে। সহজ সারল্য আর ভক্তি ও বিশ্বাসের কাছেই বাঁধা পড়েছেন দেব-দেবীরা।

উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর পূজায়, পালাপার্বণে, ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে যে সহজ সারল্যের প্রকাশ দেখা যায় সেই সারল্যেরই ছাপ দেখা যায় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও লোক মেলাগুলোর মধ্যেও।

লোকমেলা :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় বারো মাস ধরেই কোন না কোন পূজাপার্বণ ব্রত ও উৎসবকে কেন্দ্র করে নদীতীরে, দীঘির পাড়ে, হাটে, পূজা প্রাঙ্গণে, মাঠে ও নির্জন প্রান্তরে বসে বহু মেলা।

(১) চরিত্র বিচার :

এই সব লোকমেলাগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ধর্মীয় (খ) ধর্মনিরপেক্ষ।

(ক) ধর্মীয় মেলা : ধর্মীয় মেলাগুলো প্রধানত ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে। এই সব মেলাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, গাজন ও চড়কের মেলা, দরবেশের মেলা, রথযাত্রা, বারুণী স্নান, মকরস্নান, দোল ও শিবচতুর্দশীর মেলা, মাঘী পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, পৌষপার্বণ, দশহরা, ইদ, শবেবরাত ও গাজী পীরের মেলা, পীর ফকিরের উরস ও লৌকিক দেবদেবীর মেলা, রাসযাত্রার মেলা, ঝুলনমেলা, মহরম প্রভৃতি।

(খ) ধর্মনিরপেক্ষ মেলা : যে সকল মেলা ধর্মের সঙ্গে জড়িত না হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে উদ্ভুত ও বিকশিত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের ওপরে নির্ভর করে সেগুলিকেই বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ মেলা। যেমন নববর্ষের মেলা, কৃষি মেলা, বইমেলা, শিল্পমেলা, লোকসংস্কৃতির মেলা, ভূটিয়া মেলা, সখীর মেলা বা সহেলা প্রভৃতি।

(২) বৈশিষ্ট্য :

এইসব মেলাগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

প্রথমত, এই সব লোকমেলাগুলোর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সব মেলাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিভিন্ন পূজা, ব্রত, পার্বণ ও উৎসবকে কেন্দ্র করে।

দ্বিতীয়ত, কবে কার বা কাদের উদ্যোগে যে বিভিন্ন প্রাচীন মেলাগুলো বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল তা আজ আবিষ্কার করা সত্যিই কঠিন।

তৃতীয়ত, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন নতুন নতুন মেলার উদ্ভব হচ্ছে তেমনি লুপ্তও হয়েগেছে বহু মেলা।

চতুর্থত, একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে শত শত বৎসরপূর্বে মেলার যে আনুষ্ঠানিক-সংস্কারজাত রূপ ছিল তার অনেকটাই পাল্টে গেছে আজ।

পঞ্চমত, এইসব মেলাগুলোর জনমুখী এবং সাংস্কৃতিক রূপটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ষষ্ঠত, ছোট ছোট গ্রাম্য ব্যবসায়ী, কুটীর শিল্প উৎপাদক ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ফসল ও দ্রব্যাদির কেনা বেচার সাময়িক কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে এইসব প্রাচীন মেলাগুলো।

সপ্তমত, এইসব লোকমেলাগুলোর চরিত্র ও চিত্র অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় যে এগুলো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মেলা নয়।

অষ্টমত, এই সব লোকমেলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বাসীর রয়েছে প্রাণের টান। রয়েছে নাড়ীর যোগ।

নবমত, যুগ যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নরনারী এইসব লোকমেলার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে বহুর সঙ্গে মিলনের আনন্দ। অনুভব করেছে মহত্বের শক্তি। পেয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। আবেগে উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে হয়েছে আপ্লুত। তাই এরা টিঁকে আছে আজও।

দশমত, সবচেয়ে বড় কথা হলো এই সব লোক মেলার কোন প্রচার নেই, মাইকে ঘোষণা নেই ঢোল শহরত নেই। সবাই সাধারন ভাবেই জানে অমুক দিন অমুক জায়গায় মেলা বসবে।

(৩) উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোক মেলা ও লোক উৎসব :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অংশে ছোট বড় যেসব মেলা বসে থাকে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সেইসব মেলার আকার, চরিত্র ও স্থায়িত্বের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কিন্তু বিশেষ পার্থক্য নেই।

এই সব লোক মেলাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে আছে গবেষণার প্রচুর সুযোগ। এখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উৎসব ও মেলার কথা বলা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ভাবে।

(১) মালদহ জেলার লোকমেলা ও উৎসব :

(১) রামকেলির মেলা : উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার গৌড়ের কাছে রামকেলিতে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন শ্রীচৈতন্যের স্মরণ উৎসব উপলক্ষ্যে যে বিশাল মেলা বসে তা চলে এক সপ্তাহ ধরে।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বাসভূমি এবং চৈতন্যদেবের পদধূলি ধন্য রামকেলি বৈষ্ণবদের কাছে এক পবিত্র তীর্থভূমি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর ভীড় হয় এই মেলায়। প্রায় পাঁচশো বছরের পূরণো এই মেলা।

(২) পাণ্ডুয়ার মেলা : প্রতি বছর নূরকুতুবের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাণ্ডুয়ায় জাময়েত হয়ে নমাজ পড়েন। একদিনের একটি মেলাও বসে ঐ উপলক্ষ্যে। মেলাটি প্রাচীন।

(৩) সেকেন্দরপুরের মেলা : প্রতি বছর ১লা বৈশাখে গম্ভীরার পূজা উপলক্ষ্যে চারদিনের একটি মেলা বসে এখানে। মেলাটি বেশ প্রাচীন। এখানকার রটন্তীকালীর পূজাও বেশ জাঁক জমকের সঙ্গেই হয়।

(৪) নঘরিয়ার মেলা : এখানে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মী পূজো উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে সেই মেলার অন্যতম আকর্ষণ 'নৌকাবাইচ'। এই গ্রামে বালাপীরের উরস উৎসবেও বহুলোক যোগ দেন এবং ছোট একটা মেলাও বসে।

(৫) বালুপুরের মেলা : গৌড়ের কাছেই বালুপুরে গম্ভীরার পূজা উপলক্ষ্যে ১৩ই জৈষ্ঠ্য থেকে ১৮ই জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত ছদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। ভক্তরা সংসেজে বাড়ী বাড়ী যায় ও মাগন সংগ্রহ করে। চৈত্র শেষের 'গম্ভীরা' জ্যৈষ্ঠ মাসেই হয়ে থাকে এখানে। তবে গম্ভীরার উৎসবটি বেশ আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই।

(৬) সাদুল্লাপুরের মেলা : দশহরা পূজো উপলক্ষ্যে এই গ্রামের শ্মশানের কাছে প্রতিবছর দুদিন ধরে একটা মেলা চলে। সাদুল্লাপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাহআবদুল্লা নামের বিখ্যাত ফকিরের স্মৃতি। তাঁর নাম থেকেই ঐ গ্রামের নাম হয়েছে সাদুল্লাপুর। ঐ গ্রামের বিখ্যাত দেবী 'দ্বারবাসিনী'। ইনি অবশ্য গৌড়েশ্বরী নামেও খ্যাত।

সাদুল্লাপুরের মনসা এবং গম্ভীরার পূজা উৎসবও বেশ আড়ম্বর পূর্ণ। মাঘী পূর্ণিমায়, স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যেও একটা মেলা বসে গঙ্গারতীরে। এছাড়া ভাদ্র ও পৌষ পূর্ণিমাতেও মেলা বসে এখানে।

(৭) জহরাকালীর মেলা : বৈশাখমাসে জহরাকালীর বিশেষ পূজায় হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভীড় হয় জহরাতলা গ্রামে। শনি-মঙ্গলবারে ঐ মাসে যে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় সেই উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। বহু পশুও বলি দেওয়া হয় বিশেষ পূজার সময়।

(৮) হবিবপুরের মেলা : মালদহের হবিবপুরে গম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। এই গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিব পূজার উৎসবটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। নদিন ধরে চলে এই পূজা উৎসব।

(৯) বুলবুলচণ্ডীর মেলা : বুলবুলচণ্ডী গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুদিনের জন্য এবং কালী পূজা উপলক্ষ্যে চারদিনের জন্য মেলা বসে।

(১০) বাণপুরের মেলা : বাণপুরের লৌকিক দেবী কাপড়ী কালীর বাৎসরিক পূজো হয় চৈত্র মাসের রাম নবমীতে। ঐ উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে সেই মেলায় হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়।

(১১) সিমলার মেলা : কালিন্দী তীরবর্তী সিমলা গ্রামে বহু দেবদেবীর পূজো হয়ে থাকে। গম্ভীরার পূজো উপলক্ষ্যে তিন দিনের জন্য একটি মেলা বসে এই গ্রামে। এছাড়া দুর্গা পূজা, কালী পূজা এবং মহরমের সময়ও মেলা বসে।

(১২) মথুরাপুরের মেলা : রাজমহল স্টেশনের পাঁচমাইল দূরে মথুরাপুরে 'হরিহর নাথ জিউ' এর মন্দিরে বাণেশ্বর শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্য দেবতার নিত্য পূজো হয়। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে দশদিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি ৮০০ বছরের পুরনো বলে দাবী করেন গ্রাম বাসীরা। হাজার হাজার লোকের ভীড় হয় ঐ মেলায়। দুর্গা পূজার সময় একটি মেলা বসে চারদিনের জন্য।

(১৩) কৃষ্ণনগরের মেলা : রাজমহল স্টেশনের কাছেই কৃষ্ণনগরে কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রার মেলা চলে সাত দিন ধরে। লক্ষ্মী পূজোর সময়ও এক দিনের একটি মেলা বসে এখানে।

এইসব মেলাগুলি ছাড়াও মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব মেলা বসে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১৪) কোবাইয়া গ্রামের 'মহরম' মেলা, (১৫) হরিশ্চন্দ্রপুরের কালীপূজোর মেলা (১৬) ধাওয়াইলের কংসব্রতের মেলা, (১৭) রাণীপুরের রামনবমী ও বিজয়াদশমীর মেলা। (১৮) ফরিদপুরের গম্ভীরার মেলা, (১৯) বেরুল গ্রামের বুড়াপীর ও জঙ্গলপীরের উরস উৎসবের মেলা ও গম্ভীরার মেলা (২০) বাঁশড়া গ্রামের চামুণ্ডার মেলা (২১) বারিন্দার মহামায়ার মেলা প্রভৃতি। এই সব মেলাগুলো কোনটি একদিন ধরে চলে কোনটি বা একাধিক দিন ধরে চলে।

(২) দক্ষিণ দিনাজ পুর জেলার মেলা ও উৎসব :

মালদহ জেলার মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে বেশকিছু মেলা বসে থাকে। ঐ সব মেলাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) হিলির চামুণ্ডা মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শনিবারে একদিনের জন্য বসে মেলাটি। (২) বালুরঘাটের বুড়া কালীর মেলাটি বসে চৈত্র মাসে। (৩) শিবপুরের বারুণী স্নানের মেলা। (৪) পতিরামের চামুণ্ডা কালীর মেলা ও কার্তিক অমাবস্যায় কালী পূজার মেলা। (৫) অমৃতখণ্ডের মহরমের মেলা, (৬) বৌদ্ধনাথ ধামের চৈত্র মাসের বারুণী স্নানের মেলা, (৭) বাণগড়ের বারুণী স্নানের মেলা ও ধলদীঘির মাঘী মেলা। শেষোক্ত মেলাটি

উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ মেলা। চলে একমাস ধরে (৮) দেবীপুরের সাতদিন ব্যাপী বুড়ীমার মেলা, (৮) কয়দহের কালী পূজার মেলা, (৯) দৌলতপুরের মহরমের মেলা, (১০) কুশমণ্ডী থানার আমিন পুরে মাটিয়া কালীর পূজা উপলক্ষ্যে কার্তিকী অমাবস্যায় একদিনের মেলা বলে। (১১) দৌলতপুরের মহরমের মেলা, (১২) এছাড়া বই মেলা ও কৃষি মেলাও কম আকর্ষণীয় নয়।

(৩) উত্তর দিনাজপুরের মেলা ও উৎসব :

(১) রায়গঞ্জের কিছু দূরের কসবোমহেশ গ্রামে পীর মখদুমের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে দুদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

(২) কালিয়াগঞ্জ স্টেশনের কিছুদূরে টুঙ্গইল বিলপাড়া গ্রামে কার্তিক মাসে রাস উপলক্ষ্যে একটি একদিনের মেলা হয়।

(৩) কুকুড়ামণিতে পাঁচকালীর পূজা উপলক্ষ্যে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিরাট মেলা বসে।

(৪) শাসনে জেঠাপীরের উরস উৎসবে একদিনের একটি মেলা বসে পয়লা বৈশাখে।

(৫) ডালিমগাঁ স্টেশনের মাইল কয়েক দূরে করঞ্জি গ্রামের ছাঁটিকা দেবীর বাৎসরিক পূজার সময় মাঘী পূর্ণিমায় তিন দিন ব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে।

(৬) বৈরহাট্টা গ্রামের বুড়ীমা ও মশান কালীর পূজো উপলক্ষ্যে কার্তিক মাসে ও চৈত্র সংক্রান্তিতে দুটি একদিনের মেলা বসে।

(৭) করণদীঘিতে চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখের বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে এক মাস ব্যাপী বিরাট এক মেলা বসে।

(৮) মোস্তাফা নগরে পয়লা বৈশাখে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর যে পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে সেই উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ গামী পাকা সড়কের ধারে একদিনের জন্য ছোট্ট একটা মেলা বসে।

(৯) চোপড়া থানার লোকনাহারে তিস্তাবুড়ীর পূজা ও মহারাজ ঠাকুরের পূজো উপলক্ষ্যে একদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে।

(১০) চোপড়ার পাশেই ধলুয়ায় মহানন্দা নদীর তীরে শিবপূজা উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে তাতে বিশাল বিশাল মাছ বিক্রী হয়ে থাকে যা সত্যিই দেখার মতো।

(১১) রায়গঞ্জের কৃষি মেলাটি হাল আমলে চালু হলেও বেশ জনপ্রিয় মেলা হয়ে উঠেছে।

(১২) ইসলামপুরের বই মেলাটিও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই মহকুমায়।

(৪) জলপাইগুড়ি জেলার মেলা ও উৎসব :

জল্পেশ মেলা :

(১) জল্পেশ গ্রামের জল্পেশ শিবের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। এখানে শিব রাত্রির উৎসব উপলক্ষ্যে যে বিরাট মেলা বসে তা স্থায়ী হয় এক মাস ব্যাপী।

নেপাল-সিকিম-ভূটান-বিহার এবং আসাম থেকেও ক্রেতা-বিক্রেতারা আসে এখানে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় মেলা এই জল্পেশের মেলা।

(২) **বেংকান্দি গ্রামের** 'পেটকাটি বা চামুণ্ডা' দেবীর কার্তিকী পূজার উৎসবে যে মেলাটি বসে তাতে বহু লোকের ভীড় জমে প্রতি বছর।

(৩) ধূপগুড়ির কাছে **পূর্বদহ গ্রামে** জটিলেশ্বর দেবের পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

(৪) **ভাণ্ডানী মেলা :** ময়নাগুড়ির কাছে ভাণ্ডানী গ্রামে বিজয়া দশমীর পরে একাদশীতে যে বিশেষ পূজা উৎসব হয় সেই উপলক্ষ্যে একটি জমাটি মেলা বসে।

(৫) **জয়ন্তী গ্রামের মেলা :** জয়ন্তী গ্রামের পাহাড়ী গুহায় যে মহাকাল শিব আছেন তাঁর বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে শিব চতুর্দশীতে একটি মেলা বসে। হাজার হাজার লোক আসে।

(৬) **সন্ন্যাসী হাটে** সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিশেষ পূজো উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে থাকে প্রতি বছর।

(৭) **ধাপ গঞ্জে** দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ মেলা বসে। মেলাটি ছোট হলেও স্থানীয় লোকের কাছে এই মেলা খুবই জনপ্রিয়।

(৮) **সুখানী গ্রামে** ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসে একদিনের একটি মেলাও বসে।

(৯) **লুকসান চাবাগানে** জন্মাষ্টমীর উৎসবে ও দোলযাত্রার সময়ে মেলা বসে থাকে।

(১০) **ফালাকাটার মেলা**—ফালাকাটায় মহাকাল, জংলী কালী ও শীতলা দেবীর পূজা উৎসব হলেও 'ফালাকাটা' দেবীর পূজাতেই ধুমধাম বেশী। ঐ পূজার সময় একটি মেলাও বসে থাকে।

(১১) **কাঁঠাল বাড়ীর** ধূম বাবার বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে শিব চতুর্দশীতে এবং ধান কাটার সময়ে তিনদিন ধরে পূজা উৎসব চলাকালীন মেলা বসে থাকে বছরে দুবার।

(১২) **জটেশ্বর** গ্রামে শিবচতুর্দশীতে জটেশ্বরের পূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে থাকে।

(১৩) **মহাকালগুড়ির** মহাকাল শিবের পূজায় শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে একদিনের।

(১৪) **চিকলি গুড়িতে** দোল উৎসবের সময় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

(১৫) এছাড়া শিল্প, কৃষি এবং বই মেলা, ভূটিয়া মেলার মতো ধর্মনিরপেক্ষ মেলা এবং বিভিন্ন উৎসবও কম বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় নয়।

(৫) কুচবিহার জেলার মেলা ও উৎসব :

(১) কুচবিহারের রাস মেলা :

কুচবিহারের রাজা ও রাণীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে বহু দেবদেবীর মন্দির। সারা বছর ধরেই কুচবিহারের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বহু মেলাও বসে তবে সবচেয়ে বড় মেলা হলো রাসমেলা। প্রতি বছর যোল থেকে

ছাব্বিশে কার্তিক পর্যন্ত মহা সমারোহে চলে এই রাস উৎসব। ঐ উপলক্ষ্যে বারোদিন ধরে চলে রাস মেলা। দেশবিদেশ থেকে প্রচুর ক্রেতা বিক্রেতা ও পুণ্যার্থীর ভীড় হয় ঐ বিরাট মেলায়।

(২) ধলিয়া বাড়ীর মেলা : কুচবিহার শহরের চারমাইল দূরের ধলিয়া বাড়ীতে শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু পুরাতন।

(৩) বাণেশ্বরের মেলা : শিবচতুর্দশীতে এখানে দুদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে সেটি কয়েকশো বছরের পুরনো।

(৪) গুদাম মহারাণী গঞ্জে তোর্সাপীরের মাজারের পাশে মহরমের দিন একটি মেলা বসে।

(৫) সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে দুর্গাপূজায় মেলা বসে।

(৬) কুচবিহার শহরের মাইল ছয়েক দূরের মধুপুরে দোলযাত্রা, রাস এবং শঙ্করদেবের আবির্ভাব তিথিতে বিশেষ বিশেষ উৎসব হয় এবং মেলাও বসে।

(৭) গোসানীমারীর মেলা : গোসানী মারীর কামতেশ্বরীদেবীর বৈশাখ মাসের বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে একমাস ব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে।

(৮) বৈকুণ্ঠ পুরের দোল পূর্ণিমায় যে 'সোয়ারী' উৎসব হয় সেই উপলক্ষ্যে পাশের 'খাপাই ডাঙ্গা. গ্রামে দুদিনের জন্য একটি বিশেষ মেলা বসে।

(৯) নারকাটি গাছ গ্রামে শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলাটি একদিনের।

(১০) দ্বীপরপার গ্রামে চৈত্রমাসে স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে অশোকাষ্টমীর দিন একটি একদিনের মেলা বসে।

(১১) হলদী বাড়ীতে প্রতি বছর শাহ সফি খোন্দকারের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিনের জন্য যে মেলা বসে তাতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই আসে।

(১২) এছাড়া কুচবিহারের লোক সংস্কৃতির মেলাটিও ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেশে বিদেশে।

(১৩) দিন হাটার নগর ভাণ্ডানীর সখীর মেলাটি বসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে। জোড়ায় জোড়ায় দুই সখী শিবমন্দিরে পূজো দিয়ে একহাতে পূজোর উপাচার নিয়ে অন্য হাত দিয়ে সখীর হাত ধরে জলে ডুব দেয়। স্নানান্তে হাতের জিনিস সমানভাগ করে খেয়ে সখীত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে।

(৬) দার্জিলিং জেলার মেলা ও উৎসব :

(১) দার্জিলিং :

দার্জিলিং শহরে মহাকালের মন্দির ছাড়াও ধীরধাম শিব মন্দির, শ্রীমন্দির এবং বুড়াঠাকুরের মন্দিরে বিভিন্ন দেব দেবীর নিত্য দিনের পূজার্চনা ছাড়াও বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে

বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও নানাবিধ উৎসব হয়ে থাকে এবং ঐ সব বিশেষ অনুষ্ঠানে শত শত পুণ্যার্থীর ভীড়ে গম্ গম্ করে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন।

(২) বিজনবাড়ী :

বিজন বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দেবী সিদ্ধেশ্বরী। রঙ্গীত নদীর তীরে প্রতি বছর মকর স্নানের সময় মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে সেই মেলায় ভীড় করে অসংখ্য মানুষ।

(৩) তারাবান্ধ্যা :

তারাবান্ধ্যা গ্রামের শিবরাত্রির মেলাটি চলে তিন দিন ধরে। এই গ্রামের দেবতা হলেন মঙ্গলেশ্বর শিব। এছাড়া তিস্তা বুড়ীর পূজা উপলক্ষ্যেও ছোট একটি মেলা বসে।

(৪) অধিকারী গ্রাম :

অধিকারী বাবার নাম থেকেই এই গ্রামের নাম। প্রতি বছর মাঘী শুক্লা চতুর্দশীতে এই গ্রামে অধিকারী বাবার বিশেষ পূজা উৎসব হয়। ঐ উপলক্ষ্যে এখানে তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে।

(৫) দার্জিলিং জেলার অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের যে সব উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেগুলোও যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়ও বটে। ঐসব উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে বুদ্ধ জয়ন্তী, ইদলফিতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, বড়দিন, গুডফ্রাইডে ইস্টার স্যাটারডে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া পয়লা বৈশাখ ও ২৫ শে বৈশাখের উৎসবও কম আকর্ষণীয় নয়। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, নৃত্য প্রতিযোগিতাও আজ রূপ নিয়েছে উৎসবের।

(২) উত্তরবঙ্গের লোক মেলা ও উৎসবের মূল্যায়ন :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যে সব প্রধান প্রধান উৎসব ও মেলার উল্লেখ করা হলো সেগুলো ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ছোট বড়ো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেও অনেক ছোট বড়ো মেলা বসে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী দেখা যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে এগারোশের মতো বিভিন্ন পালা-পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ঐ সব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেলাও বসে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনগণনা দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী মালদহ জেলায় ২৭৭ টি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৬৩ টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ২০৫ টি, কুচবিহার জেলায় ২২০ টি এবং দার্জিলিং জেলায় ১৩৮ টি ছোট বড় মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। অবশ্য এই সব উৎসব অনুষ্ঠান যে সবই আলাদা ধরণের তা কিন্তু নয়। একই ধরণের বহু উৎসব অনুষ্ঠানও একই সময়ে বা বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় উত্তরবঙ্গের সাধারণ নরনারী কতোখানি উৎসব পাগল। নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত প্রলোভন এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও যে নিবিড় শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তির জোরে আবহমান কালের আচরিত

পূজা পার্বণ, উৎসবানুষ্ঠান ও মেলাগুলোকে বুক দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তারা সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দু-একদিনের মেলাগুলোতে সাধারণ ফলমূল, বিভিন্ন মিষ্টি, বাঁশী, বেলুন, খেলনাদির পাশাপাশি, জামা·কাপড় এবং হাঁড়ি কলসী সব্জী দা, বটি, ছুরি, কাঁচি ও কাঠের আসবাবপত্রই বেচা কেনা হয় বেশী। তাছাড়া স্নো-পাউডার, ফিতে, আয়না, চুড়ি ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যাদি এবং তেলে ভাজার বেচা কেনাও হয় যথেষ্ট। নাগরদোলা বা ম্যাজিকের আসরও বসে।

তবে দীর্ঘস্থায়ী মেলাগুলোতে বড় বড় বাসনের দোকান, বাক্সের দোকান, লেপ-কম্বল-শাল-চাদরের দোকান, পাটি ও বেতের আসবাব পত্রের দোকান, শঙ্খের দোকান, বাঁশের তৈরী আসবাবপত্র ও মাছ ধরার সরঞ্জামের দোকান, পাথরের বাটি, শিল নোড়া, থালা-চন্দন পাটের দোকান, মিষ্টির দোকান, খাবার অস্থায়ী হোটেল, মুড়ি মুড়কির দোকান, মাছ-মাংসের দোকান, কাগজের ফুল ও মুখোসের দোকান, ল্যাম্প-লণ্ঠনের দোকান, ফটোর দোকান, বাঁশী, বেহালা, ডুগডুগী, চরকী, বেলুন ও রকমারী খেলনার দোকান, প্রসাধন সামগ্রীর হরেক দোকান, লটারীর দোকান, চুড়ী, হার আংটি ও জামা কাপড়ের দোকান প্রভৃতি কতো রকমের দোকানই না বসে। বড় বড় মেলাগুলোতে সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলার পাশাপাশি বসে সব্জীর ও গবাদি পশুর হাট। বসে হাঁস মুরগী এবং বিভিন্ন পাখী বিক্রীর দোকানও। আর বাদাম চ্যানাচুর ও তেলে ভাজার দোকান তো বসেই।

বিভিন্ন হকারের চিৎকার, বাঁশীর ঝংকার, মাইকের গান এবং হাজার হাজার লোকের কণ্ঠস্বরে গম গম করে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন।

সারাদিন ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতী হৈ হৈ করে মেলায় ঘুরে জিনিসপত্র কিনে যখন সার বেঁধে বিভিন্ন মেঠো পথ দিয়ে রঙীন জামা কাপড় পরে বাড়ী ফেরে তখন মনে হয় বুঝি চলন্ত মেলাটিই এগিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। সারা বছর ধরে নিজ নিজ এলাকার উৎসব ও মেলার জন্যে কি গভীর প্রতীক্ষাতেই না দিন কাটে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ জনতার।

কিন্তু রূঢ় হলেও একথা সত্য যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব ছোট বড় মেলা বিভিন্ন সময়ে বসে থাকে সেসব মেলাগুলোর সামগ্রিক রূপ ও চরিত্র যেন বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আগেকার সেই তীব্র আবেগ এবং উচ্ছ্বাসও যেন কমে আসছে একটু একটু করে সাধারণ নরনারীর মধ্যে।

এই পরিবর্তন এবং আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ক্ষয়িষ্ণুতার পিছনে একদিকে যেমন রয়েছে আগ্রাসী নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব তেমনই রয়েছে উপযুক্ত উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের অভাবও। সত্যি কথা বলতে কি সুষ্ঠু পরিচালনা ও যুগোপযুগী আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যর্থতার দরুণই উত্তরবঙ্গের ছোট বড় লোক মেলা ও উৎসবগুলো আজ ক্রমেই যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে।

এই সব লোক মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠান গুলোকে সঞ্জীবিত করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে উৎসাহী তরুণ সমাজ সেবী, দায়িত্বশীল নিষ্ঠাবান সংগঠক ও লোকসংস্কৃতি

প্রেমীদের। তবেই আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পালাপার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবহমান কালের বিভিন্ন লোকমেলাগুলোও।

সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোক সংস্কৃতির গুরুত্বকে উপলব্ধি করে যে 'লোকসংস্কৃতি পর্ষদ' গঠন করেছেন সেই পর্ষদের পরামর্শ ক্রমে বিভিন্ন সময়ে জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশে লোক সংস্কৃতির যেসব উৎসব ও ওয়ার্কসপ হয়েছে তাতে কিন্তু বিপুল সাড়া মিলেছে। এই ধরণের উৎসব ও ওয়ার্কসপ যত বেশী হবে ততই উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়গুলোর পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) পশ্চিমবাংলার তীর্থ— প্রলয় সেন।
(২) পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন— ভূপতি রঞ্জন দাস।
(৩) বঙ্গপ্রসঙ্গ— সুশীল রায়।
(৪) লোক সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)— আশরাফ সিদ্দিকী।
(৫) পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড)— সম্পাদক অশোক মিত্র (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
(৬) হিন্দুর দেবদেবী— ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য।
(৭) Gazetteer of India (Malda and West Dinajpur).
(৮) বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি— শঙ্কর সেনগুপ্ত।

উত্তরবঙ্গবাসীদের লোকাচার প্রথা ও ঐতিহ্য

উত্তরবঙ্গে চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে এবং দেশ বিভাগ ও আসামের দাঙ্গায় যেসব নরনারী এসেছেন তাঁরা ছাড়া এই অংশের স্থায়ী বাসিন্দারা আজো একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যেই থাকতে ভালবাসেন। এই অংশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নরনারী অর্থাৎ রাজবংশী-পোলিয়াসহ বিভিন্ন তপশীল জাতি ও উপজাতির মানুষ ঠাকুর্দা-ঠাকুমা-কাকা, কাকী, জ্যেঠা, জ্যেঠী, দাদা, দিদি, ভাইবোন ইত্যাদি বহুজন পরিবেষ্ঠিত হয়েই থাকতে চায় আজো।

ঠাকুর্দা থাকে বাড়ীর কর্তা। তার কর্তৃত্ব পায় বড় ছেলে। বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েরা বাবামার কাছেই থাকে। বিয়ের পরে মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী থেকে বিভিন্ন উৎসব-পূজা ও পালা পার্বণে বাবা মার কাছে আসে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইএর কপালে যেমন ফোঁটা দেওয়া হয় তেমনি জামাই ষষ্ঠীতে সাদরে বরণ করা হয় জামাইকে।

প্রথম সন্তান হবার সময়ে মেয়েরা বাপের বাড়ী আসে। মামা মাসীরা হয় ছেলে মেয়েদের অতি প্রিয়জন। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক যেমন থাকে তেমনি স্নেহ—ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সম্পর্কও থাকে। বিবাহিত মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না আজো। স্বামী মারা গেলে ছেলে মেয়ে নিয়ে যেমন অনেকেই শ্বশুর বাড়ী থাকে আবার বাবা মায়ের সংসারেও ফিরে আসে অনেকে। তপশীল জাতি ও উপজাতির বিধবারা দেওরকেও বিয়ে করতে পারে। আবার অন্যপুরুষকেও বিয়ে করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে আগের স্বামীর সম্পত্তির অধিকার হারাতে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি প্রাচীন বাঙালী সমাজ জীবনের রীতি নীতি আচার আচরণ ও সংস্কারের অনেক কিছুই আজো উত্তরবঙ্গীয় সমাজ জীবনের বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

নবীন শিশু পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকেই উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে যে সব আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়ে থাকে সেগুলোর পর্য্যালোচনা করলে লোকাচারের যেসব ঐতিহ্য চোখে পড়ে সেগুলো আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

(১) পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান :

(ক) ষষ্ঠী পূজা ও নামকরণ : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পোলিয়া ও অন্যান্যদের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে ছদিনের মথায় ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। এইদিন আতুড় ঘর থেকে বের করা হয় সন্তানসহ জননীকে। মাকে স্নান করানো হয়। আতুড় ঘর পরিষ্কার করে তুলসী জল ছিটানো হয়। হাত-পায়ের নখ কাটা হয়। ধান-দূর্বা ও তুলসী পাতা

দিয়ে বরণ করা হয় নবজাতককে। তারপর ছোট খাটো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নামকরণ করা হয়। বয়স্করা আশীর্বাদ করেন নবজাতককে। গ্রাম দেবতার থানে পূজো দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছেলে-বুড়ো সকলকেই মিষ্টি মুখ করানো হয়।

(খ) অন্নপ্রাশন : সাধারণত ছমাসের পর ছেলেমেয়েদের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠান হয়। রাজবংশী সমাজে অন্নপ্রাশনের এই অনুষ্ঠানকে বলা হয়ে থাকে 'সাইটোর' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের মেয়েরা নির্দিষ্ট বাড়ীতে জমায়েত হয়। পান, সুপারি, কলা, খৈ, মুড়ি, সিঁদুর প্রভৃতি সাজানো হয় ডালায়। মেয়েরা ঐ ডালার চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গায়। ঐসব গানের মাধ্যমে নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয়ে থাকে।তারপর সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। মামাই সাধারণত শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেন সর্বপ্রথম। তখন উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনিও দেওয়া হয়। চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে সবার।

কুচবিহার জেলায় অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় মনসা গান ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানও হয়ে থাকে। অন্নপ্রাশনের সময় যে গান গাওয়া হয় তাকে কোথাও বা 'সাইটোর গীত' আবার কোথাও বা 'ভাত ছোঁয়ানি' গানও বলা হয়ে থাকে।

(গ) বিবাহ : বিবাহ হলো একটি সামাজিক সংস্কার বিশেষ যার মাধ্যমে সামাজিক রীতি নীতি লোকাচার ও আইনের সাহায্য নিয়ে কোন পুরুষ ও নারী স্বামী স্ত্রীতে পরিণত হয় এবং স্থায়ী পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে একাধিক পরিবার আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক জীবনে নিয়ে আসে নিরাপত্তা। সমাজ হয়ে ওঠে সুস্থ-সবল ও গতিশীল।

পৃথিবীর সব দেশেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ উপলক্ষ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু না কিছু আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। বাঙালী সমাজের বিবাহে যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার কিছু শাস্ত্রীয় এবং কিছু লৌকিক আচার। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও অঞ্চলভেদে বাঙালী সমাজের বিবাহানুষ্ঠানের লৌকিক স্ত্রী আচারের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। সামাজিক রীতি নীতি আচার, আচরণ, পারিবারিক চিন্তা-চেতনা এবং ধর্ম ভাবনার ফলশ্রুতিতেই বিভিন্ন বর্ণ হিন্দু-তপশীল জাতি ও উপজাতি, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিবাহানুষ্ঠানের মধ্যে এত পার্থক্য চোখে পড়ে আমাদের দেশে।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মতো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহের অনুষ্ঠানেও বেশ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এখানে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিবাহানুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে।

(১) রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহানুষ্ঠান :

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। সগোত্রেও রাজবংশীদের বিবাহ হয়ে থাকে। মেয়েরা বিয়ের পরে স্বামীর গোত্র পেয়ে থাকে। সাধারণত ছেলেরা ২১/২২ বছরের আগে বিয়ে করে না। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর ধার্য হলেও তার কম বয়সেও রাজবংশী মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে।

(ক) কইন্যাবেচা : এখনো রাজবংশী সমাজে মেয়েদের কদর বেশী। সাধারণত ঘটকের মাধ্যমেই বিয়ের কথাবার্তা চলে। মেয়ের বাবাকে কন্যাপণ দেয় ছেলের বাবা। একে বলে কইন্যা বেচা। পাকাদেখার দিনই মিটিয়ে দেওয়া হয় কন্যাপণ। পাকা দেখা হবার পরে মেয়েকে আর অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যায় না। একে বলা হয় 'নিরকিনি ছাড়া'। বর্তমানে কন্যাপণ প্রায় উঠে যাওয়ার মুখে। ছেলেপক্ষই পণ দাবী করে বহুক্ষেত্রে।

(খ) থুবড়ো খাওয়া : বিয়ের আগের দিন ভাবীবর বা কনে যখন পড়শীদের বাড়ী বাড়ী পায়েস, লুচি, মিষ্টি খেতে যায় তখন পাড়ার মেয়েরা গান গায় ও ছড়া কাটে। হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া পড়শীরা।

(গ) গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদ মাখার অনুষ্ঠানও হয় গীতসহকারে।

(ঘ) বরযাত্রা : যথারীতি ঘট স্থাপন করে ছাদনাতলায় মা বাবা ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে গ্রাম ঠাকুর ও অন্যান্য দেবদেবীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে বর যাত্রা করে কনের বাড়ীর দিকে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে দেখেছি বর পাল্কী চড়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে আর সঙ্গে যাচ্ছে মেয়েরা গান গাইতে গাইতে। বরযাত্রীরাও পায়ে হেঁটে প্রায় ছুটতে ছুটতেই যাচ্ছে বরের সঙ্গে। কিন্তু এখন যানবাহনের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পাল্কী যেমন উঠে গেছে তেমনি বরযাত্রীরাও আর পায়ে হেঁটে কনের বাড়ী যায় না। বাসে বা লরীতে যায় সবাই। সঙ্গে চলে বাদ্যযন্ত্র এবং গায়িকারাও।

আগে কনের গ্রামে প্রবেশের মুখে কনে পক্ষের লোকজন পথ অবরোধ করে টাকা পয়সা দাবী করতো। তাদের দাবী মিটিয়ে তবেই কনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে পারতো বরযাত্রীরা। তবে এখন এ প্রথা উঠে গেছে প্রায়। বরাগমনে উলুধ্বনি হয়। বিয়ের আসরে বর বসার পরে সমাজের গণ্য মান্যরা আসেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। চা-পান দেওয়া হয় সবাইকে। তারপর ছেলে পক্ষও মেয়েপক্ষের গায়িকারা বিয়ের গান গায়। চা-পান উতোরও চলে। হার মানতে চায় না কোনপক্ষই।

বিয়ে শুরু হবার আগে কোন কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে 'দইপর্ব' বলে একটা অনুষ্ঠান হতো। উঠোনে জল ঢেলে কাদা করে সেই কাদামাখানো হতো পরস্পরকে। তবে এই দই পর্ব বর্তমানে আর হয় না। এখন কেউ আর গায়ে কাদা মাখতে চায় না।

(ঙ) বিয়ের অনুষ্ঠান : যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ে পিঁড়ের ওপরে বর কনেকে দাঁড় করিয়ে ছাদনা তলায় শুরু হয় বিয়ের আসল অনুষ্ঠান। পুরোহিত সাধারণত রাজবংশী সম্প্রদায়েরই লোক হয়ে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শুরু হয়। তবে ঐসব মন্ত্র কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়। মন্ত্রের মূল কথা হলো বরকনের ওপরে গ্রাম দেবতা ও অন্যান্য দেবদেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। গ্রামের সকলের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। বরকনের জীবন সুখের হোক ইত্যাদি। এরপরে বরকনের কাপড়ে গাঁট ছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। বর কনেকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নেয় এবং ভাতকাপড়ে সুখে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কনেও স্বামীর অনুগত থেকে তার সংসারে শ্রী ও সুখ আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাড়ীর মেয়েরা ও কনের বান্ধবীরা মেয়েকে এবার সাতবার ঘোরায় বরের চারপাশে। সাত পাকের পরে

চলে 'খেতিয়ারী' বা 'ফুল মারামারি'। কাপড় দিয়ে বর এবং কনেকে ঢেকে দিয়ে চলে শুভ দৃষ্টির অনুষ্ঠান। বরকনেকে ধান দুর্বা দিয়ে গুরুজনরা আশীর্বাদ করেন। প্রবল উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয় বর। ছাদনা তলার পর্বশেষ হলে বর কনে বাসর ঘরে যায়। এখানেও কিছু স্ত্রী আচার চলে। গানও গাওয়া হয়। বরযাত্রীরা খেয়ে দেয়ে আনন্দ স্ফূর্তি করে।

(চ) বৌভাত : পরের দিন নতুন বৌ নিয়ে বর এবং বরযাত্রীরা বাজনা সহকারে হৈ হৈ করে ফিরে আসে বাড়ী। নতুন বৌকে বরণ করে নেন গুরুজনরা। স্ত্রী আচার এবং গান বাজনা চলে। তার পরের দিন হয় বৌভাত। আত্মীয় স্বজন ও পড়শীরা আসে নিমন্ত্রিত হয়ে। আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নববধূকে নিয়ে নতুন বর প্রবেশ করে সংসার জীবনে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশীদের বিবাহের রীতি নীতি এবং আচারানুষ্ঠানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল এদের বিয়েতে বর্ণ হিন্দুদের অনেক রীতি নীতি ও স্ত্রী আচার অনুসৃত হতে দেখা যায়।

(২) সাঁওতালদের বিবাহনুষ্ঠান :

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহের প্রথা পদ্ধতি রাজবংশী-পোলিয়া-রাভা টোটো ও লেপচাদের বিবাহ পদ্ধতি দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত দেখা যায়। বর্ণ হিন্দুদের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানও অনুসরণ করে থাকে তারা বর্তমানে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। কনে পণ দিতে হয় বরপক্ষকে। দেনা পাওনাও দিন ক্ষণ স্থির হবার পরে বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা হাজির হয় কনের বাড়ী। নাচ গান চলে বিবাহনুষ্ঠানে। সেই সঙ্গে চলে হাড়িয়া পান। পুরোহিত বর কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করান। এ মন্ত্র কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়। পুরোহিত নিজেদের সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

মন্ত্র পাঠের পরে বরকনেকে পিঁড়েতে বসিয়ে শুভ দৃষ্টি করানো হয়। এরপরে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে স্ত্রী বলে মেনে নেয় কনেকে। কনেও স্বামী বলে স্বীকার করে নেয় বরকে। এর পরেই শুরু হয় নাচ গান। বাঁশীর সুরে মাদলের বোলে আর সঙ্গীতের মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে ওঠে বিয়ে বাড়ী। পরের দিন নববধূকে নিয়ে বরযাত্রীরা ফিরে যায় নিজেদের গ্রামে। জমে ওঠে বৌভাতের অনুষ্ঠান।

(৩) ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহনুষ্ঠান :

ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যেও কন্যা পণ চালু আছে। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। পাকা দেখার দিন বরের অভিভাবকরা মেয়ের বাড়ীতে যায়। দিনক্ষণ ও পণের পরিমাণ ধার্য হয় ঐদিন। বিয়ের আগেই ঘটকের হাত দিয়ে কন্যাপণ ও ডালি পাঠানো হয়। ঘটককে বলা হয় 'আগুয়া।'

বিয়ের আগে গ্রাম ঠাকুরের পূজো করা হয়ে থাকে। কন্যার বাড়ী যাবার আগে বর মায়ের কোলে বসে ও মায়ের আশীর্বাদ নেয়। মা ছেলেকে প্রশ্ন করে—'কুথাকে যাচ্ছিস বেটা? ছেলে উত্তর দেয়—'তুহার লেগে ঝি আনতে বটে!'

বাদ্যযন্ত্রসহকারে নাচ গান করতে করতে বরযাত্রীরা হাজির হয় কনের বাড়ীতে। মেয়েপক্ষরা অভ্যর্থনা করেন বরযাত্রীদের। শুরু হয় নাচগান। চলে ঢালাও হাড়িয়া পান। রাতে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম চলে।

পরের দিন শুরু হয় বিয়ের আসল অনুষ্ঠান। বরের সামনে নিয়ে আসা হয় মেয়েকে। ওঁরাও সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত পুরোহিত সকলের সামনে মন্ত্র পড়ে উভয়কে স্বামী-স্ত্রী রূপে ঘোষণা করেন ও আশীর্বাদ করেন। গুরুজনরাও নববর বধূকে আশীর্বাদ করেন। এরপরে বর কনের কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। বেজে ওঠে বাঁশী ও মাদল। সম্পন্ন হয়ে যায় শুভবিবাহ।

বরযাত্রীরা নববর বধূকে নিয়ে ফিরে আসে নিজের গ্রামে। বরের মা ও অন্যান্য গুরুজনরা নববধূকে আশীর্বাদ করেন। কিছু মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান চলে। এরপরেই শুরু হয় ভোজ। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মতো ওঁরাওদের মধ্যেও ভালোবাসার বিয়ে, বলপূর্বক সিঁদুর ঘষা বিয়ে প্রভৃতিও চালু আছে। বিধবা বিয়েও চালু আছে। চালু আছে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথাও।

(৪) "কোড়া সম্প্রদায়ের বিবাহনুষ্ঠান" :

উত্তরবঙ্গের কোড়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও কণ্যাপণ চালু আছে। কনের জন্মদিনে বা জন্মমাসে সাধারণত বিয়ে হয় না। মাঘ-ফাল্গুন এবং বৈশাখ মাসেই সাধারণত কোড়াদের বিয়ে থা হয়ে থাকে।

বিয়ের আগে পরপর তিনদিন ভাবী বর ও কনে নিজ নিজ বাড়ীতে গায়ে তেল হলুদ মাখে। উভয়পক্ষের বাড়ীতেই 'ছামরা' পূজা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই গ্রামের প্রধান দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান যাতে শুভকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং নবদম্পতির জীবন সুখের হয়।

সকলের আশীর্বাদ নিয়ে বরপক্ষের লোকেরা এগিয়ে যায় ভাবী বধূর বাড়ীর দিকে। মেয়েপক্ষের লোকেরা গ্রাম প্রান্তে এসে বরসহ বরযাত্রীদের নিয়ে যায় কনের বাড়ী। ভাবী বর শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্যদের জন্য কাপড় ও অন্যান্য যেসব দ্রব্যাদি নিয়ে যায় সেগুলো তুলে দেওয়া হয় কনের বাবার হাতে। এর পরে জলখাবার দেওয়া হয় বরযাত্রীদের, রাতে হয় ভোজ। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আমোদপ্রমোদ করে।

পরের দিন সকালে বরকে নিয়ে আসা হয় ছাদনাতলায়। মেয়ের বৌদি বা কোন বয়স্কা আত্মীয়া প্রদীপ ঘুরিয়ে বরকে বরণ করেন। এরপর বর কনেকে তিন পাক ঘোরানো হয় ছাদনাতলায়। এবার বর কনে দাঁড়ায় সামনা সামনি। বর তার কড়ে আঙুল দিয়ে কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এটিই কোড়াদের বিয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়

শুভবিবাহ। সন্ধ্যার দিকে নববধূকে নিয়ে বর সহ বরযাত্রীরা নিজেদের গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে বরের মা ও গুরুজনরা ভাবী বধূকে বরণ করে নেন। কিছু স্ত্রী আচার চলে। পরের দিন হয় বৌভাত। কোড়াদের নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও বিয়ে থা চলে। বিধবা বৌদিকে দেবর বিয়ে করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ বা 'বাগী' প্রথাও চালু আছে কোড়াদের মধ্যে।

(৫) লেপচাদের বিবাহানুষ্ঠান :

দার্জিলিং জেলার লেপচাদের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন নেই। সাধারণত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই এদের বিয়ে থা হয়ে থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও এদের বিয়ে থা হয় না তা নয়। তবে অন্য সম্প্রদায়ের ছেলে যদি কোন লেপচা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তবে প্রচুর কন্যাপণ দিতে হয়। বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে লেপচাদের মধ্যে।

লেপচারা বৌদ্ধ এবং ক্রীশ্চান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ক্রীশ্চান ধর্মীরা পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ পরে এবং তাদের বিবাহাদি খৃষ্টানদের রীতিতেই হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মীরা প্রাচীন রীতি এবং প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করে থাকে বিয়ে সাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে।

লেপচাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে সাদি হয় না। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। বাবা মার পছন্দ হলে পাত্র-পাত্রীর মত নেওয়া হয়। পাত্র-পাত্রীর রাশি ও জন্ম সময় গণনা ও বিচার করা হয় বিয়ের আগে। কন্যাপণ দিতে হয় পাত্র পক্ষকে। নগদ টাকা ও একটা পশু দিতে হয় পাত্রীর বাবাকে। পাত্র-পাত্রীর কোন পূর্বপুরুষ যদি অপঘাতে মারা যায় তবে বিয়ের আগে তার বা তাদের আত্মার শান্তি কামনাও যথাযথ সৎকারের পরেই বিবাহানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

নির্দিষ্ট দিনে সূর্যোদয়ের পরেই শুরু হয় বিয়ের অনুষ্ঠান এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে থাকে। লামা এবং বনথিং দুজনেই পুরোহিত হিসাবে উপস্থিত থাকেন। বিয়ের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম করেন বনথিং আর লামা উচ্চারণ করেন শুভমন্ত্র এবং নবদম্পতির জন্য প্রার্থনা জানান।

খৃষ্টান লেপচাদের বিবাহানুষ্ঠান অবশ্য চার্চেই হয়ে থাকে ধর্মযাজকের তত্ত্বাবধানে।

লেপচাদের ঘটককে বলা হয় 'পিবু'। বরকে বলা হয় বিউলা এবং কনেকে বলা হয় বিউলী। উভয় পক্ষের কোষ্ঠী বিচারের পরে বর পক্ষের পিবু একটা চাদর নিয়ে কন্যার বাড়ীতে যায়। যদি কন্যার বাবা মা বা কন্যা ঐ চাদর স্পর্শ করে তবে বিয়েতে কন্যাপক্ষের সমর্থন আছে ধরা হয়। এর তিনদিন পরে পাত্র নিজে পিবু এবং এক বন্ধুকে নিয়ে দেখা করতে যায়। কিছু টাকা মাংস এবং ঘরে তৈরী মদ নেয় পাত্র কন্যার আত্মীয়দের জন্য। একে বলে 'মিক্‌পানাআল'। ঐ উপলক্ষ্যে ভোজের ব্যবস্থাও হয়। লামা'র মাধ্যমে দিন স্থির হয় বিয়ের । দিন স্থির হয়ে যাবার পরে ভাবী বর বধূ অবাধে মেলা মেশা করতে পারে। সকালে চুক্তি মতো উপহার সামগ্রী ও কন্যাপণ নিয়ে ভাবীবর উপস্থিত

হয় কনের বাড়ীতে বরযাত্রীদের নিয়ে। বরযাত্রীরা খাওয়া সারে- মদ-মাংস ও অন্যান্য খাবার দিয়ে। তার পরে পাত্র-পাত্রী পাশাপাশি বসে। দুজনকে চাদরে মুড়ে 'বনথিং' বিয়ের ক্রিয়া কর্ম সারেন। লামা ঈশ্বরের কাছে নবদম্পতির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানান। সাতপুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ব পুরুষদের নাম উচ্চারণ করে মদ উৎসর্গ করা হয়। নবদম্পতি ঐ মদ পান করে এবং ঈশ্বরের কাছে স্বামী স্ত্রীরূপে সুখে শান্তিতে থাকার শপথ নেয়। একে বলা হয় 'আ-সেক।' এই সময়েই মিটিয়ে দেওয়া হয় যাবতীয় কন্যাপণ। সূর্য্যাস্তের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। এরপরেই বর নববধূকে নিয়ে বাড়ীর দিকে যাত্রা করে। মেয়ের বোন ও বাবা মেয়ের সঙ্গে যায়। কয়েকদিন নতুন পরিবেশে দিদিকে সঙ্গ দিয়ে বোন দিদিকে নিয়ে আসে বাপের বাড়ী।

কয়েক দিন পরে বর শ্বশুর বাড়ী গিয়ে নববধূকে নিয়ে আসে নিজের বাড়ী। বরের মা অলংকার দিয়ে বরণ করে নেয় নববধূকে। শুরু হয় নবদম্পতির নূতন জীবন।

তবে যুগের হাওয়ায় লেপচাদের বিবাহানুষ্ঠানেও অনেক পরিবর্তন আসছে ধীরে ধীরে।

(৬) মালপাহাড়ীদের বিবাহানুষ্ঠান :

মালপাহাড়ীদের সাধারণত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে থা হয় না। বিধবা নারী দেবরকে এবং বিপত্নীক পুরুষ মৃতার বোনকে বিয়ে করতে পারে। বৌ যেমন স্বামীর নাম বা স্বামীর বাবামার নাম উচ্চারণ করতে পারে না তেমনি বরও স্ত্রীর বা বাবামার নাম উচ্চারণ করে না।

ঘটক বা 'সীটহ্'ই বিয়ের সম্বন্ধ করে। কন্যাপণ দিতে হয়। বরপক্ষ 'মালাচন্দন' অনুষ্ঠানের সময়ই অর্ধেক কন্যাপণ মিটিয়ে দেয়। বিয়ের দিন দিতে হয় বাকীটা।

বিপত্নীক যদি নূতন কোন মেয়েকে বিয়ে করে তবে প্রচুর পণ লাগে। বিধবাকে বিয়ে করলে কম পণ দিলেও চলে।

নির্দিষ্ট দিনে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে বরযাত্রীদের নিয়ে বর কনের বাড়ী এলে বর কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে পুরোহিত বিবাহ কাজ যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ ও অন্যান্য ক্রিয়া কর্মাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। নবদম্পতিকে গুরুজনরা আশীর্বাদ করেন। বধূর সিঁথিতে সিঁদূর পরিয়ে দেয় বর।

এরপরে খাওয়া দাওয়া সেরে নবদম্পতিকে নিয়ে বরযাত্রীরা গ্রামে ফেরে। বরের বাবা মা এবং গুরুজনরা নববধূকে বরণ করে ঘরে তুলে নেন।

(ঘ) অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান :

(১) বন্ধুত্ব বা সখীত্ব স্থাপন :

(ক) উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আগে ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা সখীত্ব স্থাপনের জন্য নানা অনুষ্ঠান করা হতো। মাল পাহাড়ী ছেলে মেয়েদের বন্ধুত্ব বা সখীত্ব স্থাপনের জন্য বাড়ীর উঠোন পরিস্কার করে আলপনা দিয়ে দুটো আসনে দুই ভাবী বন্ধু বা সখীকে বসানো হতো। উভয়ে উভয়ের গলায় ফুলের মালা বা পুঁতির

মালা পরিয়ে দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিত এবং আজীবন বন্ধুত্বের বা সখীত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতো। তারপরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতো। এই উপলক্ষ্যে বাড়ীতে ছোট খাটো একটা ভোজও দেওয়া হতো। অন্য কোন দিন অন্য পক্ষের বাড়ীতেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হতো। তবে এখন এই সব অনুষ্ঠান বড় একটা চোখে পড়ে না আর।

(খ) কুচবিহারের নগরভাঙানীর সখীর মেলা বা সহেলীর মেলাও এই ধরণেরই বড় অনুষ্ঠান। এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝা পড়া ও বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন নিবিড় হয়ে থাকে।

(গ) **ধর্ম্ম বাপমা :** উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম বাবা, ধর্ম মা, ধর্ম পুত্র ইত্যাদি পাতানো উপলক্ষ্যে আজো নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে।

(ঘ) **গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান :** উত্তরবঙ্গের বহু স্থানেই গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিশেষ পূজা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ঐ উপলক্ষ্যে। ঘট স্থাপন করা হয় গৃহের দ্বারে। দুপাশে দুটি কলা গাছও পোঁতা হয়। সিঁদুর বা আলতার ছাপ দেওয়া হয় দরজার মাথার ওপরে। মন্ত্রাদি পাঠ এবং কীর্তনও হয়ে থাকে ঐ উপলক্ষ্যে। মিষ্টি মুখও করানো হয় উপস্থিত সবাইকে।

(ঙ) **পুকুর খনন বা বাড়ী তৈরী :** নতুন পুকুর খনন বা বাড়ী তৈরীর সময়েও নানাবিধ মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে।

(চ) **সন্তান সম্ভবা :** বিবাহিতা নারী সন্তান সম্ভবা হলেও নানাবিধ স্ত্রী আচার পালন করা হয়ে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ট হলে শঙ্খধ্বনি করা হয়। উলুদেওয়া হয়। আঁতুড় ঘরের সামনে গোমুণ্ড বা কোন প্রতীক চিহ্ন রেখে দেওয়া হয়। আগুনে হাত পা সেঁকে তবেই ঢুকতে হয় আঁতুড় ঘরে। আঁতুড় ঘরে সর্বক্ষণ মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়।

(ছ) **মৃতের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান :** উত্তরবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন মৃতদেহ দাহ করেন তেমনি মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃতদেহ কবর দেয়। উপজাতিদের মধ্যে দাহ ও কবর দুই প্রথাই প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরাও কবর বা সমাধি দিয়ে থাকেন।

হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সময় পর্য্যন্ত অশৌচ পালনের বিধি আছে। তারপরে মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। রাত্রে কীর্তন হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনাতেই এইসব আচারাদি পালন করা হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও মৃতের সৎকার এবং আত্মার সদগতির জন্য নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করে থাকেন।

(জ) **ফুল ফোটানি অনুষ্ঠান :** উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে বালিকার প্রথম 'রজোদর্শন' উপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও বাড়ীর মেয়েরা আগে 'ফুল ফুটানি' বলে একটা অনুষ্ঠান পালন করতেন। ঐ উপলক্ষ্যে গানও গাওয়া হতো। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ শোনা যায় না।

আসলে কুমারী বা নারীর ঋতুমতী হবার সঙ্গে বসুন্ধরার ঋতুমতী হবার সাদৃশ্য কল্পনা করেই এই অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে এসেছে দেশে দেশে যুগযুগ ধরে।

(ঝ) **সাগাই মিলন** : কুচবিহারের কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাগাই মিলন' বলে একটা মিলনানুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিয়ের পরে নূতন কুটুম্বরা যখন নিমন্ত্রিত হয়ে আসে তখনই এই মিলন উৎসব হয়ে থাকে। বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে যায়। কলাই এর ডাল দিয়ে তৈরী 'ছাকা' বা শুঁটকী মাছকে সোডা ও চিড়ের সঙ্গে মেখে 'ছাকা' তৈরী করে নতুন কুটুম্বদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিয়ের পরে ছাড়াও এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। আসলে পারিবারিক আনন্দময় মিলনেরই উৎসব এই 'সাগাই মিলন'।

উপসংহার :

তবে এই সব লোকাচার ও উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত বইতে শুরু করেছে ভীষণ বেগে। আধুনিক সভ্যতার ঢেউ লেগেছে উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সমাজেও। ফলে যুগ যুগ ধরে যেসব আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে তাদের অনেক কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং লুপ্তও হয়ে যাচ্ছে অনেক রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসী ভূমিকাকে অস্বীকার করবে কে ?

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাঙালী জীবনে বিবাহ— শঙ্কর সেনগুপ্ত।
(২) সমাজ ও সম্প্রদায়— ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক।
(৩) সাংস্কৃতিক নৃ বিজ্ঞান— ডঃ কার্তিক চন্দ্র শাসমল।
(৪) Raj Bansis of North Bengal— Charu chandra sanyal.
(৫) Hand book of schedule caste and Tribes of West Bengal— A.K. Das and others.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংস্কার ও লোকবিশ্বাস

(১) লোক বিশ্বাস :

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার হলো সেই সব প্রথা ও ঐতিহ্য যা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে সমাজের লোকেরা বিশ্বাস ও অনুসরণ করে এসেছে। এর মধ্যে নৃতত্ব, পুরাতত্ব, আধিভৌতিক, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি অনেক কিছুই এসে যায়। এর মধ্যে যেমন যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়ের উপাদান থাকে তেমনি অনেক অযৌক্তিক বিষয়ও স্থান পেয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বস্‌ওয়েল এবং রাসেল যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের মতে— "A belief is a traditionally accepted concept involving the supernatural credence in which it has been built up during uncounted generations as a result of largely emotional association of cause and effect on the part of the folk. Thus the term belief can be conceived to include all irrational or unreasoning attitudes; it can include mythology, astrology and the like; to many readers it may be equated with superstition."

—Fundamentals of Folkliterature (Page-29)

দেশে দেশে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার যে সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে সাধারণত গড়ে ওঠে সেগুলো হলো যথাক্রমে (১) শিশুদের ভালমন্দ বিষয়ে (২) মৃত্যু বিষয়ে (৩) ভালোবাসা বিষয়ে (৪) বিবাহ্ বিষয়ে (৫) ভাগ্য বিষয়ে (৬) মঙ্গল ও অমঙ্গল বিষয়ে (৭) সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ্ নক্ষত্র বিষয়ে (৮) উদ্ভিদ গাছপালা ও বীজকে কেন্দ্র করে (৯) আবহাওয়া বিষয়ে (১০) যাত্রা-অযাত্রা বিষয়ে (১১) ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিষয়ে। (১২) সংখ্যা বিষয়ে (১৩) ডাইনী বিদ্যা বিষয়ে (১৪) অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের সর্বাপেক্ষা মজার দিকটি হলো এর প্রতিকার বা সমাধান সূত্র। বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তত্ত্বের সঙ্গে ঐ সব সমাধান সূত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না বহুক্ষেত্রেই। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন বিধি নিষেধ মেনে চললে ভাল ফল পাওয়া যায়। কঠিন কোন অসুখ হয়তো স্বপ্নলব্ধ কোন গাছের শিকড় বা পাতার রস খেয়ে ভাল হয়ে যায়। কিছু কিছু নিয়ম বা সংস্কার মেনে চললে বাধা বিঘ্ন কেটে যায়। শুভ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কেন বাধা বিঘ্ন কেটে যায় বা ফল ভাল হয় তার কোন বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ঐ সব সংস্কার বা বিধি নিষেধ বিভিন্ন দেশ ও সমাজের নরনারী পালন করে সুফল পেয়ে এসেছে এটা সর্বজন স্বীকৃত।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের মধ্যে যেমন বিচিত্র লোক সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের প্রচলন দেখা যায় তেমনি উত্তরবঙ্গের জনগণের মধ্যেও বিচিত্র সব লোক বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন যাত্রাকালে হঠাৎ হাঁচি পড়লে অমঙ্গল সূচক বিবেচিত হয়। এছাড়া যাত্রাকালে ধোপা, নাপিত, মাকুন্দ, বামন বা শূন্য কলসী দর্শনও অমঙ্গল সূচক বিবেচিত হয়। আবার গাছের শুকনো ডালে যদি কাক ডাকে তাও অমঙ্গল সূচক ধরা হয়।

আবার অন্য দিকে কলসী নিয়ে জল ভরতে যাওয়া, শিশুর হাসি, ফুল বা দেবমূর্তি দর্শন শুভসূচক। পিছন থেকে মা যদি সন্তানকে ডাকেন তবে তা শুভসূচক কিন্তু অন্য কেউ ডাকলে তা অশুভ সূচক। কাক মৃতাত্মার প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। শ্রাদ্ধের সময় প্রেতাত্মার জন্য যে পিণ্ডদান করা হয় তা যদি কাকে খায় তবে কাকের মাধ্যমে প্রেতাত্মার কাছে তা পৌঁছায় বলে বিশ্বাস করা হয়। নবান্নের সময়ও পূর্বপুরুষদর জন্য যে অন্ন নিবেদিত হয় তাও যদি কাকে খায় তবে কাকের মাধ্যমে তাও মৃত পূর্বপুরুষদের কাছে পৌঁছায় বলে বিশ্বাস করা হয়। বাড়ীর চালে বসে কাক ডাকলে কোন আত্মীয়ের আগমন ঘটছে বলে ধরা হয়। হাত থেকে কোন বস্তু বার বার সশব্দে পড়ে গেলেও কারো আগমন ঘটছে বলে ধরা হয়। রাত্রে কাকের ডাক অমঙ্গল সূচক।

রাতে কেউ সাপের নাম উচ্চারণ করে না। রাতে সাপকে বলা হয় লতা। বাঘকে বলা হয় বড় বিড়াল বা বড় শিয়াল। রাতে চোর, চুণ, বা হাতির নামও উচ্চারণ করা হয় না বহু অঞ্চলে—এগুলো না মানলে ক্ষতি হতে পারে বলেই বিশ্বাস করা হয়।

গ্রাম দেবতার থানের কাছের কোন গাছের ডালে ইঁট বা কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখা হয় সন্তান কামনায় বা কোন বিশেষ ফল লাভের আশায়। যাত্রাকালে বা পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ডিম, কাঁচা কলা বা রসগোল্লা খাওয়া বা দেখাও অমঙ্গল সূচক বলে বিবেচিত। কচ্ছপ দেখা বা যাত্রাকালে কচ্ছপ খাওয়াও নিষেধ।

স্বপ্নে সাপ দর্শন পরিবারে পুত্র সন্তানের আবির্ভাবের আভাস দেয়। রাতে শাক খেলে দুঃখ বাড়ে। দোকানে রাতে ধূনো বা সোডা বিক্রি হয় না। কথার মাঝখানে টিকটিকি ডাকলে ঠিক ঠিক বলে ধরা হয়। গায়ে পড়লে অশুভ কিন্তু মাথায় টিক্‌টিকি পড়লে শুভ সূচক। বাস্তু সাপকে কেউ মারে না। যাত্রাকালে বাঁদিকে সাপদর্শন অশুভ। আবার যাত্রাকালে বাম দিকে শেয়াল শুভসূচক। কিন্তু ডান দিকে অশুভ।

(২) সংস্কার ও বিধিনিষেধ :

আঁতুড় ঘরে শিশুর শিয়রে লোহার জিনিষ রেখে দেওয়া হয় এতে শিশুর অমঙ্গল দূর হয়। গর্ভাবস্থায় গোটা কুমড়ো কাটতে নেই পোয়াতির তাহলে খারাপ কিছু ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। নূতন কাপড় পরার সময়ে ঐ কাপড়ের সূতো আগুনে পোড়ানো হয় যাতে কারো চোখ না লাগে বা কাপড়ের কোন ক্ষতি না হয়। চুল আঁচড়িয়ে মেয়েরা চিরুণীতে লেগে থাকা চুল থুতু দিয়ে ফেলে দেয়—যাতে মন্দ না হয়। পোয়াতি মেয়ের শ্মশানে যাওয়া নিষেধ। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কোন জিনিষ কাটা বা খাওয়া নিষেধ। শিল-নোড়া, ধামা বা ঢেঁকির ওপর গর্ভবতীর বসা নিষেধ। গর্ভবতীর

গরু ডিঙানো বা বিড়ালমারা নিষেধ। সদ্য মায়ের আঁতুড় ঘরে ঘোমটা দেওয়া নিষেধ। সন্ধ্যাকালে মেয়েদের এলো চুলে থাকা নিষেধ। গ্রহণের সময় সূর্য্য বা চন্দ্রের দিকে তাকানো নিষেধ।

পোয়াতি মেয়ে যদি রাতে খাবার পরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে কুলকুচি করে তবে চাঁদের মতো ছেলে হবে। দু'মাসের পোয়াতি যদি ডিম খায় তবে সন্তানের চোখ বড় হবে। আঁতুড় ঘরে গোমুণ্ড বা বিশেষ কিছু রাখা হয় যাতে অমঙ্গল দূর হয়।

ঘূর্ণী বাতাস গায়ে লাগলে অসুখ হয় বা ভূতে ধরে। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে ভাগ্য খারাপ হয়। একসঙ্গে তিনজন যাত্রা করলে ত্র্যহস্পর্শ দোষ হয়। উত্তরদিকে মাথা করে শুতে নেই।

র্গর্ভবতী নারীকে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন গর্ভবতী নারী কখনো একা থাকবেনা, এলোচুলে থাকবে না, নিম, বেল, শ্যাওড়া বা অশত্থ গাছের তলা দিয়ে হাঁটবে না। এলোচুলে ঘুমাবেনা, দরজার মাঝখানে দাঁড়াবেনা, মৃতদেহের দিকে তাকাবেনা, সেলাই বা সূঁচের কাজ করবেনা, পুকুরে মাছ ধুতে যাবে না, মৃতবৎসার পায়ের দাগ মাড়াবেনা, অন্যকোন গর্ভবতীর সঙ্গে এক থালায় খাবেনা। কোন ঋতুমতী নারীকে স্পর্শ করবেনা।

ছোট ছেলেকে বাইরে নিয়ে যেতে হলে তিনবার কড়ে আঙুলে কামড়ে দেওয়া হয় যাতে চোখ না লাগে। শিশুর কোমরে কড়ি বা পয়সা বেঁধে দেওয়া হয় একই উদ্দেশ্যে। জন্মবারে বা জন্মদিনে চুল বা নখ কাটানিষেধ।

বিভিন্ন বারে বা মাসে নির্দিষ্ট কিছু কিছু ফল, মূল ও শাকসব্জী খাওয়ারও বিধি নিষেধ আছে। এগুলো অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে মানুষ পরীক্ষা করেই সিদ্ধান্তে এসেছে মনে হয়।

উত্তরবঙ্গের সকল ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একই ধরণের সংস্কার, লোকবিশ্বাস এবং বিধিনিষেধ আছে তা অবশ্য নয়। উচ্চবর্ণের মধ্যে যেসব সংস্কার, বিশ্বাস বা বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে নিম্নবর্ণের মধ্যে সেগুলোর সবই যে প্রচলিত আছে তা অবশ্য নয়। আবার নিম্নবর্ণের নরনারীরা যেসব বিধিনিষেধ মানে বা যেসব লোক বিশ্বাস ও সংস্কারাদি অনুসরণ করে চলে তা আবার উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত নেই বহুক্ষেত্রে।

সভ্যতার অগ্রগতির এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মানুষের অনেক প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে আঘাত পড়লেও এখনো দেশে দেশে বহু লোক বিশ্বাস ও সংস্কার কিন্তু টিঁকে আছে গ্রামাঞ্চলের নরনারীদের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের যেকোন গ্রামে ঢুকে একটু অনুসন্ধান করলেই এর সত্যতা বুঝতে পারা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

লোকচিকিৎসা

(ক) লোকচিকিৎসায় বৃক্ষ-পাতা গুল্মাদি :

প্রাচীন ব্যাবিলনেই লোক চিকিৎসার প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই লোক চিকিৎসার প্রচলন ছিল। প্রাচীন মিশরেও লোক চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে লোকচিকিৎসার প্রচলন ছিল। অথর্ববেদে বহু লোক ঔষধের বিবরণ পাওয়া যায়। সুশ্রুত ও চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের দুই বিখ্যাত লোকচিকিৎসক।

বিভিন্ন রোগে টোট্‌কা ওষুধ, তাবিজ, মাদুলী, পাতার রস-শিকড় ইত্যাদি লোক ঔষধ হিসাবে দেশে বিদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। আধুনিককালে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লোক ওষধি রূপে বৃক্ষ-পাতা ও লতাগুল্ম সংগ্রহের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর সব গাছ পালাই কোন না কোন রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—ঠিক গাছটি খুঁজে বের করাই হলো প্রধান কাজ— 'There is a plant in the world for every ailment; all you have to do is to find it.''

আবার অমাবস্যা, পূর্ণিমা, মঘা, প্রতিপদ, পুষ্যা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব যে মানব শরীরকেও প্রভাবিত করে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ঐ সব তিথিতে যেসব বিধিনিয়ম মেনে চলার প্রথা আছে তাও চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

এছাড়া দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার ফলেও বহু প্রাকৃতিক ফল-ফুল পাতাদি লোক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। যেমন জায়ফলের ভিতরটা যেহেতু মাথার মগজের মতো অতএব মাথার অসুখে 'জায়ফল' ব্যবহৃত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। আফিং ফলও মাথার মতো দেখতে বলে মাথার অসুখে ব্যবহার করার কথা ভাবা হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। রক্তগোলাপ রক্তের প্রতীক রূপে লোক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে বহু যুগ আগে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী যথার্থই বলেছেন—"একটি গাছ বা লতার সঙ্গে অন্যান্য বহু লতাগুল্মের মিশ্রণ—আরও পরে জীবজন্তু বা দেহাংশের প্রতীকী কল্পনা সম্ভবত আন্তর্জাতিক লোক ঔষধের ভাণ্ডার ক্রমাগত প্রসারিত করতে থাকে।"

—লোক সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সং ১৯৮০) পৃষ্ঠা- ১৯৯

বৃহত্তর গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও লোক চিকিৎসার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। হাতুড়ে কবিরাজ, বদ্যি ছাড়াও সাধারণ নরনারী ও বিভিন্ন গাছ গাছড়ার ছাল, শিকড়, পাতার রস, পুরনো তেঁতুল, মধু, আমলকী, হরিতকি, বহেরা, চুন, চিটে গুড়, ফলমূল, ও বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে বহু রোগ সারায় আজো।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চোখ ওঠা, পেট ফাঁপা, বদহজম, ক্রিমি, সর্দি, আমাশয়, খোস পাঁচড়া, ইত্যাদি বহু কিছু টোটকা ওষুধ বা শিকড় পাতার রস ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে থাকে নিভৃত গ্রামের বহু নরনারী।

আবার স্বপ্ন লব্ধ ওষুধ বা দৈব ওষুধেও বহু রোগ সেরে যায় দেখা যায়।

এখনো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লোক চিকিৎসা ও লোক ঔষধ প্রচলিত আছে সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে রাখলে চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ভূবিদ্যার গবেষণায় প্রচুর কাজে আসতে পারে বলেই বিশ্বাস।

(খ) লোকচিকিৎসায় যাদুবিদ্যা ও ঝাড়ফুঁক :

রোগ-শোক-বন্যা মহামারী-ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ যেমন দেবদেবীর কৃপা প্রার্থনা করেছে তেমনই নিয়েছে যাদুবিদ্যার আশ্রয়। ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুর সাহায্যে চেয়েছে প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করতে।

আদিম মানুষ যখন পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার করতো তখন মাঝে মাঝে শিকার না পেলে মানুষ কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় নিতে শুরু করে। এই ভাবেই এলো যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক। ম্যাজিকের সাহায্যে বাস্তব ঘটনাকে ধোঁয়ার আড়ালে রাখার প্রয়াস করা হয়।

আদিম সমাজে ম্যাজিকের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যাদু বা ম্যাজিকের প্রভাব কমে আসতে থাকে। তবে এখনো বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যাদুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজে শত্রু বা পশুর মূর্তি তৈরী করে বাণবিদ্ধ করার প্রথা প্রচলিত আছে। কুশপুত্তলিকাদাহ করার মধ্যেও অনুকরণ মূলক যাদু লক্ষ্য করা যায়। কোন স্থানে জল ছিটিয়ে যে বৃষ্টির অভিনয় করা হয় সেখানেও ঐ যাদুর প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

উত্তরবঙ্গে মেঘারাণীর ব্রতে ব্যাঙের বিয়ে, হুদুমার পূজা উৎসবে জমি চাষ, বীজ বোনা, বা ক্ষেত্র দেবতার পূজায় যে সব আচার অনুষ্ঠান ও তুক্ তাক্ করা হয় সে সবই ঐ যাদু বিষয়ক ব্যাপার। ন্যাবা বা জন্ডিস্ নিবারণের জন্য যে হলুদরঙা কাঠির মালা গলায় পরানো হয় সেখানেও ঐ ম্যাজিকের প্রভাব।

উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে এখনো শত্রুর ওপরে প্রতিশোধ নেবার জন্য শত্রুর চুল, নখ বা ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলা হয় যাতে ঐ শত্রু বশ হয় বা তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তুক্‌তাক্ অভিচার বা বশীকরণ প্রক্রিয়া সবই যাদুর পর্য্যায়ে পড়ে থাকে।

কঠিন রোগ সারাবার জন্য রাস্তার মোড়ে কোন কোন অনুষ্ঠান করা হয় যেমন মুখো ঝাঁটা বা বেশ সুন্দর কোন ফল বা সব্জী তুক্ তাক্ করে রেখে দেওয়া হয় যাতে ঐ সব বস্তুর ওপরে অন্যের দৃষ্টি পড়ে ও রোগ সেরে যায়। যে ঐ ঝাঁটা স্পর্শ করবে বা ডিঙিয়ে যাবে বা প্রলুব্ধ হবে ঐ সব লোভনীয় ফল বা সব্জীতে তার ঐ অসুখ হবে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ সেরে যাবে এমনই বিশ্বাস।

এখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরলে দেখা যায় রোগ সারাবার জন্যে সর্বস্তরের ছেলেমেয়ে-যুবক-যুবতীরাই মাদুলী-কবচ ব্যবহার করে থাকে। ঝাঁড়-ফুঁকের ওপরেও অগাধ আস্থা গ্রামের সাধারণ মানুষের। বাতাস লাগলে বা ভূতের উৎপাতে ওঝার ওপরে নির্ভর করে থাকে সাধারণ নরনারী। আর সাপে কাটলে তো ওঝা ছাড়া কথাই নেই। হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যাবার ব্যাপারে এখনো গাঁয়ের মানুষরা যথেষ্ট সচেতন নয়।

বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার সময়ে এখনো কোন কোন নরনারীর ওপরে দেবতার বিশেষভর হয়ে থাকে। ঐ ভরপ্রাপ্ত পুরুষ বা নারী তখন মাটিতে ঘন ঘন চুল ফেলে ও মাথা নাড়ে। ঐ নর বা নারী বহু কঠিন রোগের ওষুধ বা নিরাময়ের পথও বলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব নির্দেশ পালন করে সুফলও পাওয়া যায় এতে জনগণের আস্থাও বেড়ে যায়।

কুচবিহারের নিগমনগরের 'ভামরীর কথাই' ধরা যাক্। অতি সাধারণ ঘরের বউ। হঠাৎ মা কালীর ভর হলো তার ওপরে। তার স্বামী দেবীজ্ঞানে পূজো শুরু করলো তার। খবর রটে গেলে গাঁয়ে গাঁয়ে। বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হলো কালী মূর্তি। ভামরী শুরু করলো দৈব ওষুধ দিতে। দ্রব্যগুণেই হোক আর বিশ্বাসের জোরেই হোক অনেকের রোগ সেরেও গেল। ভামরীর মাথায় এখন দীর্ঘজটা। দেবীর কৃপায় অবস্থাও ফিরে গেছে তাদের।

উত্তর দিনাজপুরের মালদূয়ার গ্রামের মঙ্গলার ওপরেও একরাতে দেবতার ভর হলো। নিজেকেই মাদুর্গা ভাবতে লাগলো সে। দৈব ওষুধও পেয়ে গেল। ঘরদোর-উঠোন নিজে হাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝক্ ঝকে করে তুললো। নিজে সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে লাগলো। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে ভর হতে লাগলো রুটিন ধরে। বহু জনকে ওষুধও দিল এবং রোগ নিরাময়ের পথের নির্দেশ দিল। সেরেও গেল অনেকের রোগ ব্যাধি। সেই সঙ্গেই ফিরতে লাগলো মঙ্গলার আর্থিক অবস্থাও।

এমন ঘটনার নজির ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের বহুগ্রামে ও গঞ্জে।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) পূজাপার্বণের উৎস কথা— ১৯৮৪ পল্লব সেনগুপ্ত।
(২) বাংলার লোকসংস্কৃতি ১৯৭৪— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(৩) Fundamentals of folk literature— 1962.
(৪) লোক সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) ডঃ আশরফ সিদ্দিকি ১৯৮০।
(৫) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান— ডঃ কার্তিক শাসমল। ১৯৮১

পঞ্চদশ অধ্যায়

মৌখিক সাহিত্য

পৃথিবীর সবদেশেই লিখিত সাহিত্যের চেয়ে মৌখিক সাহিত্য প্রাচীনতর। লিপি আবিস্কারের বহু পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ নরনারীর মুখে মুখে বহু গল্প, ছড়া, গান, রূপকথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, লোককাহিনী, ভূতের গল্প, নীতিকথা, প্রভৃতি। ঐ সব মৌখিক সাহিত্য চলে এসেছে বংশ পরম্পরায় পরবর্তী যুগের কাছেও। ঐ সব মৌখিক সাহিত্যের নানা উপাদান সংযুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালের লিখিত সাহিত্যেও।

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান প্রথম দিকে হয়তো কোন বিশেষ একজনই সৃষ্টি করে কিন্তু সৃষ্টির পরে যখন তা দশজনের কাছে যায় বা হাতে পড়ে তখন তা আর ব্যক্তিবিশেষের থাকে না, হয়ে যায় সাধারণের সম্পত্তি। অবশ্য দশজনের মুখে মুখে তা পরিবর্তিতত হয়ে থাকে বহুলাংশে।

লোকসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো হলো যথাক্রমে—

(১) লোক সাহিত্য হলো প্রকৃত পক্ষে মৌখিক সাহিত্য। মানুষের মুখে মুখেই ঘোরে।

(২) মানুষের স্মৃতি পটেই এই সাহিত্যের অবস্থান।

(৩) বংশপরম্পরায় এই সাহিত্য চলে আসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে।

(৪) মৌখিক সাহিত্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ সূত্র রচনা করে থাকে।

(৫) আদিতে একজনের দ্বারা সৃষ্ট হলেও পরে তা হয়ে দাঁড়ায় সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

(৬) মৌখিক সাহিত্যের আদি রূপ অবিকৃত থাকে না। মুখে মুখে তা বংশপরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে থাকে বহুক্ষেত্রেই।

(৭) মৌখিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ, সামাজিক প্রথা ও রীতি নীতির অনেক কিছুই জানা যায়।

(৮) কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মৌখিক সাহিত্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৯) মৌখিক সাহিত্যের কোন বিশেয উপাদানের সৃষ্টির দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

(১০) বহুক্ষেত্রেই কোন বিশেষ মৌখিক সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টাকেও খুঁজে বের করা কঠিন।

(১১) লিখিত সাহিত্যের প্রবল প্রাধান্যের যুগেও মৌখিক সাহিত্যের ধারাটি কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় নি আজো।

(১২) এই সাহিত্যের স্রষ্টা গ্রামের সহজ সরল সাধারণ নরনারী।

(১৩) গ্রাম্য মানুষের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা, সাফল্য ব্যর্থতার মূল সুরটিই প্রকাশ পেয়ে থাকে মৌখিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আজ যে প্রবল অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে সেই অস্থিরতার ধাক্কায় আজ গ্রামীন সংস্কৃতি বিপন্ন। বিপন্ন আজ পৃথিবীর দেশে দেশে মৌখিক সাহিত্যও। বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যও আজ সত্যিই বিপন্ন। কিন্তু শত অস্থিরতা এবং বিপর্যায়ের মুখে দাঁড়িয়েও অসামান্য জীবনী শক্তির গুণে যেসব মৌখিক সাহিত্যের উপাদান আজো টিঁকে আছে উত্তরবঙ্গের গ্রামীন নরনারীর মুখে মুখে সেগুলোও কম বিস্ময়ের উদ্রেক করে না।

লিখিত সাহিত্যের প্রবল প্রতাপের যুগেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে মৌখিক সাহিত্যের যেসব উপাদানগুলো আজো টিঁকে আছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে যেমন সামাজিক রীতি নীতি, আচার আচরণ প্রভৃতির পরিচয় মেলে তেমনি সাধারণ নরনারীর সুখ দুঃখ ব্যথা-বেদনা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার কথাও জানা যায়। জানা যায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র এবং আরো অনেক কিছুই।

(১) ছড়া :

মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ছড়া। প্রকৃতপক্ষে ছড়াই হলো মৌখিক সাহিত্য তথা লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম উদাহরণ। যাবতীয় অসংলগ্নতা, অর্থহীনতা, সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব ও অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও শিশুরা ছড়া ভালবাসে। তারা সুর করে ছড়া বলে। কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে যায়। ছড়ার মধ্যে যে তাল, লয়, ছন্দ আছে তা শিশুর হৃদয়ে দোলা দেয়। সে সম্ভব অসম্ভবের বিচার করে না। বাস্তবতার ধার ধারে না। মা-মাসী, ঠাকুমা, দাদা, দিদিদের মুখে ছড়া শুনতে শুনতে খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে শিশু। তার পরে কখন যে শুনতে শুনতে তার মনের মধ্যে গেঁথে যায় ছড়ার শব্দগুলো সে নিজেই জানেনা। সে এরপরে নিজে নিজেই ছড়া বলে আনন্দ পায় এবং অন্যদেরো আনন্দ দেয়। সত্যি কথা বলতে কি ছড়ার আবেদন সর্বদেশের সর্বকালের শিশুদের কাছেই অপ্রতিরোধ্য।

আমাদের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ছড়া প্রচলিত আছে সেগুলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্যও গুরুত্ব দিতে বলে ছিলেন। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বহু ছড়া বিলুপ্তও হয়ে গেছে আজ। সুখের বিষয় একদা অবহেলিত লোক সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি পরবর্তীকালে সুধীজনদের দৃষ্টি পড়েছে এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়েছে বহু মূল্যবান ছড়া। তবুও এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু গ্রাম গঞ্জে বহু ছড়া। সেগুলো উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ না করলে তারা যে লুপ্ত হয়ে যাবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা লোক সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং তার অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই একদা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে যেসব ছড়ার সন্ধান পেয়েছিলাম সেগুলোর উল্লেখ করবো এবার। তবে আমার সংগ্রহ সামান্যই। আরো বহু ছড়া উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী-পোলিয়া ও অন্যান্য

তপশীল জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সেগুলো এখনি সংগ্রহ করে না রাখলে তাদের অবলুপ্তি অনিবার্য। আশা করি এ ব্যপারে উৎসাহী ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে অবলুপ্তির হাত থেকে তাদের রক্ষা করে সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন।

আমার সংগৃহীত ছড়াগুলোর অনুরূপ ছড়া হয়তো অন্যকোন অঞ্চল প্রচলিত থাকতেও পারে বা ইতিমধ্যে কেউ সেগুলো সংগ্রহও করে থাকতে পারেন কেননা প্রায় তিরিশ বছর আগে সেগুলো সংগ্রহ করেছিলাম আমি এবং নানা কারণে সেগুলো প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আজ এতদিন পরে সুযোগ আসায় সেগুলো প্রকাশ করে দায়মুক্ত হবার সুযোগটা কাজে না লাগিয়ে থাকতে পারলাম না।

আমার সংগৃহীত ছড়া গুলোর মধ্যে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন আছে তেমনই ঘুমপাড়ানি, খেলা, মেয়েলী, আনন্দদায়ক, আনুষ্ঠানিক, ধাঁধা মিশ্রিত এবং প্রকৃতি বিষয়ক ছড়াও আছে।

(ক) ঘুমপাড়ানি ছড়া : জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় বলা হচ্ছে—

'ওদিয়া না যান ঠাকুর কেঁউ কান্দিছে।
দুই দুইটা চিতল মাছ জলে ভাসিছে
একটা খাইল বামুন ঠাকুর আরেকটা টিয়া।
টিয়ার বেটির বিয়াও হয় নাল শাড়ী পিন্দিয়া।
দুইটা বিলাই জোগার দেয় দাগিলা ঘোমর দিয়া।

(পিন্দিয়া—পরে, বিলাই—বিড়াল, দাগিলা ঘোমর—কোমরে কাপড় বেঁধে)
(সংগ্রাহক ভবতোষ সরকার)

আবার ঐ একই ছড়াটি ঈষৎ ভিন্ন আকারে উত্তর দিনাজপুরের 'ভেউড়' গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলাম—(ক)

তালতলা তালতলা কেঁউ ডাকিছে।
দুই দুটা কাৎলা মাছ ভাসি উঠিছে।
একটা নিছে বামুন ঠাকুর একটা নিছে টিয়া।
টিয়ার বেটির বিয়া দিছে লাল শাড়ী দিয়া।
লাল শাড়ীটা ছিঁড়ি যায়।
টিয়ার বেটি হায়! হায়!

আবার অনুরূপ একটি ছড়া রাজসাহী অঞ্চলেও প্রচলিত আছে—

তালতলায় ছাইল্যা-পিইল্যা মাথা বান্ধাছে।
দুই দিকে দুই চিতল মাছ ভাইস্যা উঠ্যাছে।
একটি লইল্যা টিয়ার মা আরটি লইল্যাকে?
টিয়ার মাইয়্যার বিয়া হয় লাল শাড়ী দিয়া।
লাল শাড়ী নিব না তসর কিইন্যা দে।

তসর করে ঘসর ঘসর—জাহাজ কিইন্যাদে।
মা-বেটি-জননী কাঁদতে বইস্যাছে।
বাপ বেটা সদাগর মেলা দেখত্যাছে।

ছড়ার স্থানান্তর লোক মুখে বা আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমেই সাধারণত ঘটে থাকে। জলপাইগুড়ি উত্তরদিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নরূপে একই ছড়ার প্রচলন এই ভাবেই ঘটেছে বলেই ধরা যায়। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত এবং স্থানান্তরিত হবার ফলেই একই ছড়া যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় মৌখিক সাহিত্য কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই ছড়াটি কে সৃষ্টি করেছিল বা কোন অঞ্চলে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ আর বোঝার উপায় নেই। আপাত অসংলগ্নতা থাকলেও ছড়াটির ছন্দ, তাল এবং চিত্র ধর্মিতা সহজেই শিশু মন জয় করে।

উত্তরদিনাজপুর জেলার কালিয়া গঞ্জ থানার কুনোর গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি ঘুম পাড়ানি ছড়ায় দেখা যাচ্ছে মা কিছুটা যেন গল্পের আশ্রয় নিচ্ছেন—

(১) "নিন্দ আইমা, নিন্দ আইমা
ও ভাগনার ছুয়া।
তোর মা গিছে হাট করিবা
গামছা কোনত্ নিয়া।
গামছার কোন্ত নাড়ু মুড়ি
ভন্দরা-বিলাই খায়।
তাইনা দেখি কালু ভুলু
খুকিয়া মরি যায়।

(সংগ্রাহক হরেন রায় কুনোর)

—ছুয়া-ছেলে, গিসে-গেছে,
ভন্দরা বিলাই-মোটা বিড়াল, খুকিয়া-ডাকিয়া)

(২) এই ছড়াটিতে ছন্দ, তাল, লয় ছাড়াও রয়েছে একটা সুন্দর ছবি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়েরাই যে হাটবাজার করে তার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে এখানে। একটা গল্পও আছে এই ছড়ায়।

(৩) উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাসপাড়া এলাকার একটা ঘুমপাড়ানি ছড়ায় বলা হচ্ছে—

'মোরলের ঘরত্ হাতিট্ মরিছে।
সরা ভুগ ভুগ গন্ধা ছে।
বানিয়ার মা, বানিয়ার মা।
চুপ চাপ্ ঘুম। (সুকেশী রায় চোপড়া)

মোড়লের বাড়ী হাতি মরেছে তাই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কর্মকারের মা একদম চুপ। ছড়াটির চিত্র ধর্মিতা লক্ষ্যণীয়। সেই সঙ্গে প্রচলিত একটি লোক বিশ্বাসও ফুটে উঠেছে এই ছড়ায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রাত্রে হাতির নাম নেওয়া নিষেধ। যেমন বাংলার কোন কোন অঞ্চলে রাত্রে বাঘ বা সাপের নাম উচ্চারণ করা হয় না তেমনই। হাতি ভয়ঙ্কর চেহারা কল্পনা করেই শিশু ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ছড়া শুনতে শুনতে।

(খ) ছেলে ভুলানো ছড়া : কুচবিহার জেলার নিগম নগর অঞ্চলের একটি ছেলে ভুলানো ছড়ায় বলা হচ্ছে—

(১) 'ডোমনা রে ডুমনি
মরা মাছের গুম্নি।
শাক্ খায়, শুকাতি খায়
ডোমনা বেটা কোটে লুকাং ?
ধাপ্ ধুপ্—নিশ্চুপ !
কাঁঠালের আঠি ভুট্টুস্।

(সংগ্রাহিকা- সন্ধ্যা রায়)

গুমনি—অবেশেষ। কোটে—কোথায়।

মায়েরা বাচ্চাদের হাঁটুর ওপরে নাচাতে নাচাতে শিশুকে আদর করেন। কাতুকুতু দিয়ে এই ছড়াটি বলতে বলতে। শিশু ছড়াটি শুনে হাসতে হাসতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েও পড়ে। এই ছড়াটি উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ভিন্নাকারে প্রচলিত আছে।

(২) জলপাইগুড়ি জেলার 'বেলাকোবা অঞ্চলের একটি ছেলে ভুলানো ছড়ায় বলা হচ্ছে—

'উললু বাদারের ফুল।
কইন্যা আইলো কেতো দূর ?
কইন্যা আইলো ঘামিয়া।
ছাতাই ধর টানিয়া।
ছাতার মাথায় গামছা।
ঢুলু-মুলু তাম্সা।

(উললুবাদার—উলুখাগড়া)

উলুবাদাড় দিয়ে মেয়ে ঘেমে এসেছে। মাথায় ছাতা ধরে কিন্তু ছাতার ওপরে গামছাটাই এখানে তামাসার কারণ। স্পষ্টতই একটা সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে এখানে।

অনেক সময় উত্তরবঙ্গের মায়েরা ছোট শিশুকে নিজের কোলে বসিয়ে বা দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে শিশুকে হাঁটুর ওপরে শুইয়ে দিয়ে শিশুর দুই হাত পা জড়ো করে ছড়া বলেন। ছড়া বলার পরেই দুই হাত পা ছেড়ে দেন এবং শিশুখল্ খল্ করে হাসতে থাকে। ফুটে ওঠে স্বর্গীয় ছবি।

(গ) **খেলামূলক ছড়া :** খেলার সময়ে উত্তরবঙ্গের বালক-বালিকারা বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরণের ছড়া আবৃত্তি করে থাকে সুর করে। এইসব খেলামূলক ছড়াগুলো আবার ঘরের মধ্যেকার ও বাইরেরও হয়ে থাকে। ধূপগুড়ির 'মাগুরমারি' অঞ্চলের একটি ঘরোয়া খেলামূলক ছড়ায় বলা হচ্ছে—

(১) 'ইন্দুর ইন্দুর তোর মাও আইসে।
দ্বন্দ্বের কুটুনি মাও কেন আইসে?
ইন্দুর, ইন্দুর, তোর মাইয়া আইসে।
আসুক মাইয়া বসুক ঘরে।
ধান থুছুং মুই থরে থরে।

(ভবতোষ সরকার)

সামনা সামনি দুই বালিকা বসে সুর করে এই ছড়া বলে। এই ছড়াটির মধ্যে সুরতাল লয় এবং সুন্দর একটা ছবি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা সামাজিক চিত্রও ফুটে উঠেছে। মাতৃ হৃদয়ের চিরন্তন স্নেহশীল ছবিটি প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে। নানাকারণে মা মেয়েকে তাড়না ভৎর্সনা করে থাকে। সমাজে ছেলেদেরই কদর বেশী। তাই মেয়েদের অবহেলা। মায়ের প্রতি মেয়েরা তাই সর্বদাই অপ্রসন্না। কিন্তু নিজের মেয়ের প্রতি মায়ের মনে অগাধ স্নেহ আর ভালবাসা। তাইতো মেয়ের জন্য থরে থরে ধান সাজিয়ে রাখে 'ইঁদুর মা।

(২) অন্য আরেকটি খেলা মূলক ছড়ায় ছন্দতাল-লয়ের সঙ্গে ফুটে উঠেছে সুন্দর ছবি। চারপাঁচ জন ছেলে মেয়ে গোল হয়ে বসে এই খেলার ছড়াটি বলে—

'অকদুল্ বকদুল্ কপদুল ফোটে।
বাণিয়ার ছাঁওয়া দুল্ দুল্ কাঁপে।
কাঁপা কাঁপি নিমের ডাল।
হাড়ি খোল পাতিলা খোল।
চোর ছাড়িয়া চামা চোর।
আতিচোরা পাতি চোরা।
মাইয়ার পাটানি চোরা।

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি অঞ্চলের এই ছড়াটিতে বলা হচ্ছে অকদুল বকদুল কপদুল ফুটেছে। বণিকের ছেলে তাই দেখে নিমের ডালের মতো কাঁপছে। হাড়ি কুড়ি চুরি করতে করতে চামারের মতো চোর হয়ে এখন মেয়েদের পাটানিও চুরি করতে শুরু করেছে চোর।

ছড়াটির চিত্র ধর্মিতা এবং ছন্দ প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে দোলা দেয়।

চারপাঁচজন ছেলে মেয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে। একজন সুর করে ছড়াটি বলে ও হাতের তালু দিয়ে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের হাঁটুতে আঘাত করে। পাটানি চোরা শব্দটি যার হাঁটুতে পড়ে সে চোর বলে গণ্য হয় এবং তাকে হাঁটু তুলতে হয়। এইভাবে খেলাটি চলে।

কোথাও কোথাও অন্য কায়দাতেও ছড়াটি খেলা হয়ে থাকে। আবার ছড়াটির মধ্যে যে ধাঁধা আছে তাও জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। পাটানি চোরাকে? না 'ছুয়া' বা ছুঁচা। এই অর্থে ছড়াটিকে ধাঁধাঁমূলক ছড়াও বলা যায়।

(৩) জলপাইগুড়ি জেলা থেকে সংগৃহীত অন্য একটি খেলা বিষয়ক ছড়ায় দেখা যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা কলাই খাবার জন্য যেতে চাইছে কিন্তু বাবার ভয়ে সংকুচিত। ছড়াটিতে বাবার নিরপেক্ষতা নিয়েও কটাক্ষ করা হয়েছে—

'আইসো হের চেংড়ীগুটি কালাই খাবার যাই।
বেশী করি না খাইস্ কালাই ডাংদিবে মায়।
মায়ের ডাং যেমন তেমন বাপের ডাং কাণা।
ছোট মাক্ আনিদিছে চিক্‌চিকা মালা।
বড় মাক্ আনিদিছে ডোরা ডোরা মালা।

এই ছড়াটির মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পোলিয়া ও কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একদা বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। সামাজিক চিত্রের দলিল বিশেষ এই ছড়াটির মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীন সুয়োরাণী দুয়োরাণীর ছবিই যেন চিত্রিত হয়েছে। ছোট মায়ের প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্ব শিশু হৃদয়ে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তারই প্রতি ফলন লক্ষ্য করা যায় এখানে। জলপাইগুড়ির অন্য একটি খেলা মূলক ছড়ায় দেখা যায় একজন খালে পড়ে গিয়ে মিনতি জানাচ্ছে বোনের কাছে—

(৪) বনু-বনু-বনুরে!
খালোৎ পড়লুং মুই।
হাতত্ ধরি তোলং মোরে
তোর মাইয়া মুই।

দুজন বালিকা জোড়ায় জোড়ায় এই খেলাটি ছড়া বলতে বলতে খেলে থাকে।

এই খেলাধর্মী ছড়াটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গাত্মক ভাবও আছে। বিপদে পড়লে সকলেই সম্পর্ক পাতিয়ে আপনজন হতে চায়।

(৪) ব্যঙ্গাত্মক ছড়া :

কামরূপী উপভাষায় রচিত উত্তরবঙ্গের মেয়েলী ছড়ার মধ্যে যেমন সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে দেখা যায় তেমনি আবার ব্যঙ্গাত্মক রঙ্গ রসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা অঞ্চলের একটি ছড়ায় ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে—

(১) আমের ফল ঝোপা ঝোপা,
তিতলির ফল বাঁকা।
বুড়ী মাইয়া ভাতার ধরে
তাও পিন্ধে শাঁখা।

উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সমাজে একদা অল্পবয়সে মেয়েদের [illegible] হতো। বেশী বয়স হয়ে গেলেই চলতো কা[illegible]। বেশী বয়সে বিয়ে হবার [illegible] গোজ করলেই ব্যঙ্গ করতো অন্যরা।

প্রবচনধর্মী এই ছড়াটিতে সামাজিক চিত্রের সঙ্গে একটি করুণ ছবিও ফুটে উঠেছে এখানে। টাকার অভাবে বা রূপের অভাবে কোন কোন মেয়ের বেশী বয়সে বিয়ে হতেও পারে। সাজগোজ করতেই পারে সে। কিন্তু মেয়েদের কানাকানি কি বন্ধ হয় সহজে ?

এই ছড়াটির সঙ্গে তুলনীয়—

আমধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বাঁকা গো।
আসাম দেশে দেইখ্যা আলাম রাড়ীর হাতে শাঁখা গো।

(২) ঐ অঞ্চলের অন্য একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় বলা হচ্ছে—

ঘরত্ নি ভাত।
ধাপত্ চুলহা।
ঘরে ঘরে বেড়াচে
ধুতি ঝুল্হা।

অর্থাৎ ঘরে ভাত নেই। উনুন বারান্দায়। অথচ ধুতি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি প্রবাদ হিসাবেও প্রচলিত আছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ এলাকার একটি ছড়ায় দেখা যায় বুড়ী শাক রান্না করেও নিজের বুড়ার মন পায় না তাই আক্ষেপ করে—

(৩) 'নাফা নাফা হাপ্পারে তোর
ঢাপ্পা ঢাপ্পা পাড়।
সেই নাফা আন্ধিয়া মুই
শুধুই খানু ভাত।
নাফা শাক আন্ধিনু মুই
হরং ফরং দিয়া।
আন্ধনের বাস্না গেইল
বাবুর বাড়ী হইয়া।
নাফা শাক আন্ধিনু মুই
নাই দিনু নুন।
খাবার কালে হামার বুঢ়ার
গদর গদর শুন।

কতো সাধারণ পরিচিত বিষয়কে নিয়ে রচিত হয়েছে ছড়াটি।

অন্য একটি ছড়ায় দেখা যায় বড় জায়ের রান্না পছন্দ হয়নি তাই ছোট 'জা' বলছে—

(৪) তেল থুয়া বথুয়া শাক আন্ধে বড় জায়।
আর নাফা ছাড়া ঐ না শাক মোর মনেতে নালয়।
ইস্লা মাছের শুট্কি দিয়া নাফা যদি পাও।
ডের সের চাউলের ভাত জিভ্ ছাড়িযা খাও।'

ছোট বউ নাফা শাক আর ইস্‌লা অর্থাৎ চিংড়ি মাছের শুটকির ভক্ত। তেল ছাড়া বথুয়া শাক পছন্দ নয় তার। আসলে ভাবখানা এই বড়জা রান্নার কৌশলই জানে না। এখানে মেয়েরা কতো সাধারণ পরিচিত বিষয়কে নিয়ে যে মুখে মুখে ছড়া রচনা করে থাকে তার পরিচয় মেলে।

(৫) মেয়েলী ব্রতের ছড়া :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্রত পালনের সময় মেয়েরা যেসব ছড়া বলে বা গান করে সেগুলোও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। এখানে কুচবিহার জেলায় কার্তিক পূজোর সময় মেয়েরা যে সব গান গায় বা ছড়া বলে তার একটির উল্লেখ করা হচ্ছে—

দূর হৈতে বাদুড় আইল
কলা খাবার আশে।
গাছের কলা গাছে রৈল
বাদুড় গেইল দ্যাশে।
তীর পড়ৎ ঝাঁকে ঝাঁকে
বাঁটুল পড়ৎ জোরে রে।
গাছের কলা গাছে রৈল
বাদুড় গেইল উড়িরে।

সমবেত কণ্ঠে কোচ মেয়েরা যখন এই ছড়াটি বলে তখন বড় সুন্দর লাগে। ব্রত-পূজার সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পূজার ফল মূল মিষ্টান্নাদি চুরি করতে এলে মেয়েরা তাদের তীর, গুলতি নিয়ে তাড়া করে।

ছড়াটির চিত্রধর্মিতাও মনে দাগ কেটে যায়। ছড়াটি সঙ্গীত হিসাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে।

(৬) আনুষ্ঠানিক ছড়া :

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও পোলিয়া ছেলে মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে যেসব ছড়া কাটা হয় সেগুলোও কম চিত্তাকর্ষক নয়। এই সব ছড়াগুলো আবার গান হিসাবেও গাওয়া হয়। উত্তরদিনাজপুর জেলার 'হাটকালিয়া গঞ্জ' এলকার কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করবো এবার। বরযাত্রীসহ বর এসে হাজির হয়েছে কনের বাড়ী। মেয়ে পক্ষের মেয়েরা বরের রূপ বর্ণনা করছে ঠাট্টার সুরে—

১। "ছিক্ ছিকা ছিক্ মামোর মায়োগে।
ইট্ দুলাহা কেমন গে ?
ইট দুলাহার নাকট।
ঢেট কুয়ার ঠোঁট-ট।
ইট্ দুলহার পিঠ খান্

খার করা পিঠা খান।
ইট্ দুলাহার হাত খান্।
খার করা মুগুর খান্।

অর্থাৎ 'ছিঃ ছিঃ আমার মাগো।
এটা কেমন বরগো?
এটা বরের নাকটা।
দাঁড় কাকের ঠোঁট টা।
এটা বরের পিঠখানা।
কাপড় কাচা পিড়াখানা।
এটা বরের হাত খানা।
কাপড় কাচা মুগুর খানা।

বাঙালী মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বান্ধবীরা বাসর ঘরে বরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে সর্বত্রই। কিন্তু উত্তরবঙ্গে বর আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজবংশী মেয়েরা বরকে যেভাবে আক্রমণ করে ছড়ায় আর গানে তা সত্যিই বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে যখন ছেলেপক্ষের মেয়েরাও পাল্টা মেয়ের রূপ গুণের ব্যাখ্যা শুরু করে ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় আর গানে।

২। এঠিয়া কলার মকচট্ বুড়ী
বুকে ভাঙ্গিলো টে।
ছাড়ি আইল পাটি পারা নাংটে।
মোক্ দয়া লাগে।
ছাড়ি আইল স্যুট পিন্হা নাংটে
মোক্ দয়া লাগে।

অর্থাৎ, বীচা কলার মোচাটা বুড়ী
বুকে ভাঙিলোরে।
ছাড়িয়া আসিলে গোপন প্রেমিক।
আমাকে দয়া লাগে।
ছাড়িয়া আসিলে স্যুট পরা প্রেমিক
আমাকে দয়া লাগে।

এইসব ছড়া গুলোর রচয়িতা গ্রামের নিরক্ষর মেয়েরাই। উপমা গুলোও পারিচিত পরিবেশ থেকেই নেওয়া। বরের রূপ গুণের প্রতি যেভাবে এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে তাতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিবের বরবেশে আগমনও এয়োস্ত্রীদের শিবকে নিয়ে কটাক্ষের ছবিই যেন ফুটে উঠেছে মনে হয়।

তাছাড়া গ্রাম্য নিরক্ষর মেয়েরা ছড়ার মধ্যে যেভাবে এখানে 'দুলহা, পিন্হা' প্রভৃতি হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করেছে অবলীলাক্রমে তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানেও যেসব ছড়া বলা হয় ঐসব অঞ্চলে তাও মনে রাখার মতো। দুটি ছড়ার উল্লেখ করবো এখানে—একটিতে বলা হচ্ছে—।

৩। 'হলদাগে হল্‌দা।
সবো-রঙ্গের হল্‌দা।
হলদা নাইগে গেছে দশবিশ ট্যাকা।
দশবিশ খিলাইয়া হল্‌দা কিনাইছু।
আহারে মোর বাছার মুহে
এ শুভো হল্‌দা চড়াইছু।
হলদাগে হলদা! সবোরঙ্গের হল্‌দা।

অন্য একটি ছড়ায় বাছার মুখে মিষ্টি দেবার জন্য দশ বিশ টাকা খরচ করেও মায়ের মন খুশীতে ভরে উঠেছে দেখা যায়। তাই মাকে বলতে শোনা যাচ্ছে—

৪। মিঠিরে মিঠি
সবো রঙ্গের মিঠি!
মিঠি নাইগে গেছে দশবিশ ট্যাকা।
ট্যাকা খিলাইয়া মিঠি কিনাইছু!
আহারে মোর বাছার মুহে
শুভোমিঠি চড়াইছু।

এখানে 'খিলাইয়া' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দী রাজ্য বিহারের প্রভাব রাজবংশী মেয়েদের ভাষায় কিভাবে ঢুকে পড়েছে তা সতিই গবেষণার বিষয়। আসলে উত্তরদিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ বিহারের পার্শ্ববর্তী হওয়ার ফলেই পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বাংলা ভাষায় কিছু কিছু হিন্দী শব্দের প্রবেশ যেমন ঘটেছে তেমনি উর্দুভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে থাকায় উর্দুশব্দেরও প্রবেশ ঘটেছে কিছু কিছু।

(৭) ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়া :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বহু ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়া প্রচলিত আছে। উত্তরদিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ছড়ার কথা বলা হচ্ছে এখানে।

অনেক সময় দাদু-দিদিমারা সন্ধ্যার সময়ে বা বাদল দিনে নাতি-নাতনীদের নিয়ে ধাঁধাঁর আসর বসিয়ে থাকেন। এমন একটি ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়ার আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল ভেউড় গ্রামে। দাদু জিতেন রায় নাতি-নাতনীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—ইড়ার উত্তর কহত দেখি—

১। "ধূলায় ধূসর ভাই কুণ্ঠিয়া যাবোরে?
চুপ চুপ গাছের টেপুয়া ভাই বলিসনা মোরে
তোকে মোকে রান্ধে খাবে এক ঠিয়ারে।"

নাতি-নাতনীরা নিশ্চুপ। মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু করে দিতেই মুচকি হেসে দাদু এবার বলেন কি রণজিৎ বাবুর সামনে মোকেই উত্তর দিবা হবে? কাহা দে দাদু, দে। নাতনীরা আত্মসমর্পণ করে। তখন দাদু বলেন, 'ইডা হৈল এক বেগুন আর কাছিমের বা দুরার গাথা। কি আর বলবা হবে?

না, না, বুঝছি এখন। অন্যডা কন্‌গে।

(এই ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়ার অর্থ হলো একদিন একটা কচ্ছপ বেগুন গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল ধূলো মেখে। বেগুন তাকে দেখে বলছে ধূলো মেখে কোথায় যাচ্ছ হে? এর উত্তরে কচ্ছপ বলছে, চুপ্ চুপ্। কেউ শুনতে পেলে দুজনকেই একত্রে রেঁধে খাবে।)

এরপরে দাদু দ্বিতীয় ছড়াটি বলে তাকিয়ে থাকেন নাতি-নাতনীদের দিকে—

২। "উপরেতে পইল টুমকি
টুমকি নাচন নাচে।
সোনার টুম্‌কি ভাঙি গেইলে
কে গড়াইতে পারে?"

বৃষ্টি। বৃষ্টি। সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নাতি-নাতনীরা।

হ। ঠিক হৈছে। আচ্চা, ইবার কহতো দেখি—এই বলে দাদু, তৃতীয় ছড়াটি বলেন—

৩। 'তিন্ ভিতি তিন তাল।
মধ্যিখানে মহাকাল।
মহাকাল ডিমা পাড়ে।
কুন্ বিটা গেনাইতে পারে?

নাতি নাতনীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। দাদু হাসেন—

—কি? কহি দিম্?

হ। দে। কহি দে দাদু! নাই পারুম।

চুলায় আগুন। হাড়ীত ভাত। কি হইল ইবার?

—হ। হ। বুঝছি ইবার।

(অর্থাৎ উনুনে আগুন জ্বলছে। মহাকাল রূপী হাঁড়িতে ভাত ফুটছে।) ছড়াটির মধ্যে যে কাব্য রস রয়েছে তা সহজেই হৃদয়ে দোলা দেয়।

আইচ্ছা, ইবার কহতো দেখি এই বলে দাদু চতুর্থ ছড়াটি বলেন—

৪। উপরেতে পাইল ফটিংগা বরণ।
নাং থিতিবা দিলে বড়ই যতন।
হাইগে, মা, মুই কনু কি?
নাং চাইলে মুই দিমু কি?

—শিল্! শিল্!—এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই। ঘরের ভিতরে থেকেও উঁকি ঝুঁকি দেয় মেয়েরা। হ। ঠিক হৈছে ইবারডা! দাদু খুসী খুসী মুখে তাকান আমার দিকে।

শিলাবৃষ্টিকে নিয়ে এমন কবিত্বময় ছড়া যিনি রচনা করতে পারেন তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ছড়ার মাধ্যমে কি সুন্দর হেঁয়ালিই না সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে।

ঐ আসরেই অন্য একটি ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়ায় বলা হলো—

২। ধান নাড় নাড় সখী ধানে দিয়া পাও।
মুই সখা হাটে যাই কিবা খরচা চাও ?
অঞ্চল গাট চঞ্চল গাট
কামছে মোর সোনার ঘাট।

ধাঁধাঁমিশ্রিত এমন ধরণের বহু ছড়া ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে। এইসব ছড়াগুলোর ছন্দ এবং শব্দ প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এইসব ছড়াগুলো বড়দের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও মুখে মুখে বলে থাকে।

(৮) উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও ওঁরাওদের ছড়া :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজবংশী কোচ এবং পোলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ছড়া প্রচলিত আছে তেমনি বর্ণ হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধাঁ ও লোক সাহিত্যের নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে। এখানে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করবো।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কামারপাড়া অঞ্চলের একটি ছেলে ভুলানো ছড়ায় বলা হচ্ছে—

১। "মিরু মিরু হারিয়ার মিরু।
থোনটা তম মা আরক।
টেচিন ডোমা ফরকাস সে।
হিরিলেম গাপা সেটাক।"

অর্থাৎ টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া
ঠোঁটটি তোমার লাল।
আজকে তুমি যাওনা চলে
আবার এসো কাল।"

অন্য একটি ছড়ায় বলা হচ্ছে—

২। উল্ ইন জোসা কান্থার ইনজো
আর ইন জোসা তাহের।
বাবাদেন কালস্ কাটেন
আর ইন জোসা পেটের।

অর্থাৎ আম খাব কাঁঠাল খাব
আর খাব ক্ষিরা।
দাদুর বাড়ী গিয়া ভাই
হবে কান চিরা।

অপর একটি ছড়ায় ছোট মেয়েকে জুতো শাড়ী আঙটি ঘড়ি কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

৩। আকারে হোপন মাই সেলাম।
দেলাই স্কুল তেঞ ইদিনে।
কিরিঞ আমালে লুসাং শাড়ী।
তিরে হাতঘড়ি সোনা সুদাম।
জাংগারে পানাহি রূপবাটরি।
নাপায়তে তিরে সুগেম তাহেন।

অন্য একটি ছড়ায় দেখা যায় নতুন বৌ ঘরে আসতেই চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে—

৪। হ্যাস কাটেমা ভাবুই সেট করেন।
ওকা এ নাশে অটোরেন।
দরমে ভাদু আগ্নিমে লাড়ু।

অপর একটি কার্বধর্মী ছড়ায় ভোরের পাখীর ডাকে হৃদয় বিচলিত হচ্ছে এবং সিধু কানুর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

৫। সেতাঃরে চেৎ এম কয়েৎ চেঁড়ে।
ঊষা না পায় সুর বুলিতে।
আমাঃ রাঃ আজমাত চেঁড়ে।
জিউয়ি উদাস এন তিঞ।
মনরে দিশা আটুর আদিঞ।
পাহিল সিদহ্য-কানু হল।

ওঁরাওদের ছড়া :

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে কটি ছড়া সংগ্রহ করেছিলাম সেই সবছড়ার চিত্রধর্মিতা এবং সঙ্গীতের সুর মুগ্ধ করেছে আমাকে। একটি ছড়ায় ঝুমরিকে খুঁজছে তার বাবা—

১। এতো বড় বাঙ্গেলা
ঝুমরি কাহা গেলা ?
দেতোরে ঝুমরি লোট্‌কা পানি।

হাত ধোয়াবো, মুখ ধোয়াবো।
মিসি সাওয়াল পানি।
যাইসানা গাছকা পাতা উড়ি গেলা।
তাই সানা ঝুমরি উড়ি গেলা!

মুখ হাত পা ধোয়ার জন্য ঝুমরিকে জল দিতে বলছে বাবা কিন্তু বিশাল বাড়ীতে ঝুমরি কোথায়? সেকি ঝরা পাতার মতো উড়ে গেল?

ছড়াটির সুর, চিত্রধর্মিতা এবং শব্দ প্রয়োগ ও ছন্দের মাধুর্য্য সত্যিই হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। লোক কবির সৃষ্টি এই ওঁরাও ছড়াটি সত্যিই উন্নতমানের কাব্য গুণ সম্পন্ন ছড়া। বাংলাশব্দের পাশাপাশি হিন্দীশব্দের প্রয়োগও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

অন্য একটি ছড়ায় দুটি নদীর স্রোতের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ছন্দিল সুরে।

২। কোন্ নদী বাহেরে
হালাক্ মালাক্-রে?
নদী ছাল্ ছাল্ করে।
কোন্‌সে নদী বহে নীরাজালে?
ছোটা নদী বহে হালাক মালাক্‌রে।
নদী ছাল্ ছাল্ করে।
বড়া নদী বহে নীরা জালে।

নিসর্গ বিষয়ক এই ছড়াটিতেও সঙ্গীত ধর্মিতা লক্ষ্যণীয়। ছোট নদী খরস্রোতা কিন্তু বড়নদী নীরবে বয়ে চলেছে। হালাক-মালাক এবং ছাল ছাল শব্দগুলির একাধিকবার প্রয়োগের ফলে একটা অপূর্ব রসমাধুর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্য ধর্ম এবং গীতিময়তার জন্য এই সুরেলা ছড়াটি মনের গভীরে সহজেই দাগ কেটে যায়।

অপর একটি ছড়ায় বর্ষার মেঘগর্জন এবং বর্ষার ভরানদীর ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুন্দরভাবে।

৩। পূবে ঢু ঢুরালা কারিয়া রে বাদারি।
পচ্চিমে সে যায় গঙ্গা বারিশাল পানি।
উত্তরে ঢু ঢুরালা কারিয়া রে বাদারি।
দক্ষিণে সে যায় গঙ্গা বারিশাল পানি।

নিসর্গ বিষয়ক এই ছড়াটির চিত্রধর্মিতা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। পূবে আর উত্তরে ঘন কালো মেঘের গর্জন এবং পশ্চিমে ও উত্তরে কল্ কল্ স্রোতে বয়ে যাওয়া গঙ্গার চিত্রটি সত্যিই স্বপ্নময়। 'ঢু-ঢুরালা', বাদরি, 'বারিশাল' প্রভৃতি শব্দগুলোর বারবার প্রয়োগের ফলে যে ধ্বনিময়তা এবং রসের সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব। সঙ্গীতময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় হৃদয় এই ছড়াটি পাঠ করতে করতে।

অন্য একটি ছড়ায় একটি মেয়ে বলছে—

৪। 'দাদা কূয়া খোড়েলা।
ভাউজি পানি ভরায়লা।
হারিওকে মোক লেব দায়লা।
পাকালা ডুম্বুরি গিরেলা।

অর্থাৎ দাদা কূয়ো খুড়ছিল ও বৌদি জল ভরছিল। একটি ছেলে ঢিল ছুড়ছিল। ঢিল লেগে ডুমুর পড়লো।

এখানেও কতো সহজ সরল বিষয় কে কেন্দ্র করে ছড়াটি রচিত হয়েছে।

ওঁরাও মা যখন সুর করে ছড়া বলে তখন এক আশ্চর্য্য সুরের মায়াজাল সৃষ্টি হয়। শিশুর মনপ্রাণ সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে ধীরে ধীরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে খেয়াল থাকলে তো!

এখানে উল্লিখিত সাঁওতালী ছড়াগুলোর চেয়ে ওঁরাও সম্প্রদায়ের ছড়াগুলো অনেক বেশী কাব্যধর্মী এবং সন্দেহ নেই চিত্তাকর্ষকও বটে। এমন ধরণের ছড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে। সেগুলো এখনই সংগ্রহ করে না রাখলে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ঐসব বিভিন্ন ধরনের ছড়া সংগ্রহে যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বেলাকোবা বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর প্রণব সেনগুপ্ত ও যামিনী কান্ত রায় জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আমাকে সঙ্গ দিয়ে যেমন ধন্য করেছেন তেমনি নিগমনগর ও কুচবিহার অঞ্চলের ছড়াগুলি সংগ্রহে সহায়তা করেছেন নিগমনগর বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুনীতি বিশ্বাস। এছাড়া উত্তরদিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ভেউড় ও হাটকালিয়া গঞ্জের ছড়াগুলো সংগ্রহে জিতেন রায় এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাঁওতালী ছড়া সংগ্রহে বালুরঘাটের সরকার কিস্কু এবং কামার পাড়ার মদন সোরেন যেভাবে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই। ওঁরাও ছড়াগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছে আমার ছাত্রী গঙ্গারামপুরের মালতী কুজুর। এদের সকলের কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) লোক সাহিত্য প্রথম খণ্ড— আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
(২) বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস— বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
(৩) লোকসাহিত্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৪) পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক সাহিত্য—ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৫) Fundamentals of Folk literature.
(৬) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপাভাষা— সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

ধাঁধাঁ

(ক) উৎস ও বৈশিষ্ট্য :

লোক সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ধাঁ ধাঁ। ধাঁধাঁর মধ্যে পাওয়া যায় পরিণত শিল্পমন ও রসবোধের পরিচয়। এর থেকে অনেকে মনে করেন ধাঁধাঁ লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আদিম প্রকৃতির রহস্যময় ছন্দবদ্ধতা, বৈচিত্র্য এবং নানাবিধ অসংলগ্নতা সুপ্রাচীন মানুষদের মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল সেই সব কৌতূহল এবং প্রশ্নই যে একদা ধাঁধাঁ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। ধাঁধাঁর মাধ্যমে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষেরা একে অন্যের জ্ঞান বা চিন্তার পরিমাপ করতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লোক সাহিত্য বিশারদ পোটার সাহেব যথার্থ্যই বলেছেন— 'For it is obvious that the solving of riddles was a technique anciently and primitively employed at times of crises or on occasions when fate of some one or even a whole tribe hung in the balance, rainmaking, grain growing and harvesting, circumcision, wedding, funerals and burryings, all these were critical times."

(—S. D. F. L.—C. F. Potter—Page-940)

বহুযুগের বহুচিন্তা ও ভাবনার ছাপ রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ধাঁধাঁগুলোর মধ্যে। পরিণত মনের ছাপ যেমন আছে এগুলোর মধ্যে তেমনি আবার কৌতুক এবং হাস্যরসও আছে ধাঁধাঁর মধ্যে। সূক্ষ্ম হাস্যরসের সঙ্গে পাওয়া যায় কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় বিভিন্ন ধরণের ধাঁধাঁর মধ্যে দিয়ে। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন পরিচিত ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়েই ধাঁধাঁর কারবার।

ধাঁধাঁর মাধ্যমে ভিন্ন দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করে একটা রহস্যের আবরণে প্রকৃত উত্তরটি গোপন করে রাখা হয়। এখানেই ধাঁধাঁর বিশেষত্ব। গোপন রহস্য উন্মোচনেই ধাঁধাঁর আনন্দ।

সুপ্রাচীন সমাজে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান, শিকার, চাষ, বৃষ্টি, দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা কোন সংকটময় মুহূর্তে কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান কালেই একদা ধাঁধাঁর রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছিল প্রাচীন মানুষ। কিন্তু কালক্রমে সভ্যতার অগ্রগতি ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধাঁ নিছক হাস্য পরিহাস ও অবসর বিনোদনের অন্যতম উপকরণ হিসাবেই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যে চিন্তাশীল ও পরিশীলিত মন একদা ধাঁধাঁ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল সেই মন ধীরে ধীরে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে।— 'As time has passed and rationalism has increased charms have become out dated and

riddles have moved from the realms of religion and serious challenge into the realm of entertainment.

(F. D. F. L. I. Bosewell and I. Russel—Page-28).

ধাঁধাঁ নানাধরণের হয়ে থাকে। মজাদার বা আনন্দদায়ক ধাঁধাঁ ছাড়াও গাণিতিক ধাঁধাঁ, লোকঠকানো ধাঁধাঁ, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত ধাঁধাঁ, বুদ্ধির পরীক্ষামূলক ধাঁধাঁ প্রভৃতি নানা ধরণের বিচিত্র সব ধাঁধাঁ প্রচলিত আছে দেশে বিদেশে। বিভিন্ন ধাঁধাঁর উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে তাদের অনেকগুলোই সৃষ্টি হয়েছে বহুপ্রাচীনকালে।

দেশে বিদেশে বহু দিনধরেই ধাঁধাঁর ব্যবহার হয়ে আসছে নানাভাবে। লোকজীবন এবং লোক সাহিত্যের অঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে ধাঁধাঁর প্রবেশ ঘটেছে লিখিত সাহিত্যের অঙ্গনেও।

ব্যবিলনীয় সাহিত্যেই ধাঁধাঁর প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাইবেলের স্যামসনের কাহিনীতেও ধাঁধাঁর উল্লেখ আছে।—"Out of the eater came forth meat and out of the strong came forth sweetness."

—Samson Agonist—Milton

নিহত সিংহের গায়ে মৌচাক বসেছিল এবং তার মধু পান করেছিলেন স্যামসন। কিন্তু ফিলিস্তিনী প্রতিপক্ষরা স্যামসনের ঐ ধাঁধাঁর উত্তর দিতে পারেনি।

খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে শেবার রাণী রাজা সলোমনকে বহু কঠিন কঠিন ধাঁধাঁর সামনে ফেলেছিলেন। সলোমন এবং টায়ারের রাজার মধ্যেও ধাঁধাঁর প্রতিযোগিতা হয়েছিল বলে শোনা যায়।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও ধাঁধাঁর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হোমার নাকি একটি ধাঁধাঁর উত্তরদানে ব্যর্থ হয়েই মারা যান। ধাঁধাঁটি ছিল এই রকম— 'What we caught we lost, what we did not catch we kept'. এর উত্তর ছিল উকুন।

ভাগ্য বিড়ম্বিত ওডিপ্যাস তো প্রথম যৌবনে ফিংসের ধাঁধাঁর উত্তর দিয়েই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন।

ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও ধাঁধাঁর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে বকরূপী ধর্মের ধাঁধাঁর উত্তরদানে সফল হয়েই যুধিষ্ঠির চার ভাইকে বাঁচিয়ে ছিলেন। কথা সরিৎ সাগর এবং পঞ্চতন্ত্রেও ধাঁধাঁর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যও বহু ধাঁধাঁর উত্তর দিয়েছিলেন দেখা যায়। কালিদাসও আন্দাজে রাজকন্যার ধাঁধাঁর উত্তর দিয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে শোনা যায়।

ভারতীয় সমাজ জীবনের বহুবিধ অনুষ্ঠানে এবং খেলারচ্ছলেও ধাঁধাঁর ব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন চর্য্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে এবং আধুনিক সাহিত্যেও নানাভাবে ধাঁধাঁ ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুদিন ধরেই। এখনতো মাসিক পত্র পত্রিকাতেও ধাঁধাঁর জন্য জায়গা রেখে দেওয়া হচ্ছে।

আসলে ধাঁধাঁর মধ্যে যে বিস্ময়বোধ, উপমা, বুদ্ধি, চাতুর্য, রসজ্ঞান ও সৃষ্টির আনন্দ আছে তাইই যুগ যুগধরে জনপ্রিয় করে রেখেছে ধাঁধাঁকে।

বিভিন্ন ধরণের ধাঁধাঁগুলোকে আমরা গুণগত দিক দিয়ে যথাক্রমে লৌকিক ধাঁধাঁ ও সাহিত্যগত ধাঁধাঁ এবং বিষয় বিচারে প্রকৃতি বিষয়ক ও গার্হস্থ্যবিষয়ক ধাঁধাঁ হিসাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

(ক) উত্তরবঙ্গের ধাঁধাঁ ও একটি ধাঁধাঁর আসর :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলার সকল প্রান্তেই ধাঁধাঁর প্রচলন ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এইসব ধাঁধাঁগুলো আমাদের মৌখিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বিশেষ। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও ছড়িয়ে আছে বহু ধাঁধাঁ। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছে ঐ সব বৈচিত্র্যময় ধাঁধাঁগুলি। প্রচলিত কামরূপী উপভাষায় উত্তরবঙ্গের গ্রামীন নরনারীদের মুখে মুখে যে সব ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় 'ছিল্কা'। ঐ সব ছিল্কার স্রষ্টাদের মধ্যে বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, তপশীলী জাতি উপজাতি প্রভৃতি সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়েরই নরনারীরা আছেন। ঐসব ধাঁধাঁ বা ছিল্কার মধ্যে উত্তরবঙ্গবাসীদের বিচিত্র জীবন ধারার ছাপ যেমন আছে তেমনিই আছে আবার গভীর জীবনদর্শনের পরিচয়ও, সাধারণ বর্ণনার আকারে যেমন প্রকাশ পেয়েছে ঐসব ধাঁধাঁ গুলো তেমনিই আবার ছড়ার মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্রসব ধাঁধাঁর সম্ভাব। কখনো কখনো আশ্চর্য্যকাব্য গুণেরও প্রকাশ ঘটেছে ঐ সব ধাঁধাঁর মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা বাদল ঝরা দিনে আজো ঘরে ঘরে বসে ধাঁধাঁর আসর। বিবাহ বাসরে বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করে হয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধাঁধাঁর প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে কখনো কখনো।

উত্তরবঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত বিষয় বস্তু থেকেই বিভিন্ন ধাঁধাঁর উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। ফল, ফুল, চাঁদ তারা, মাছ ডিম, ধান, কলাই, পশু, ছেলে বুড়ো, পাখী, শাকসব্জী, নদী, গাছ, খাদ্য দ্রব্য এবং গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণাদিই বিভিন্ন ধাঁধাঁ বা ছিল্কার মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে এখনো গল্প-ছড়া ও ধাঁধাঁর আসর বসে। ঐ সব আসরে দাদু, ঠাকুমারা নাতি-নাতনীদের যেমন বিভিন্ন ধরণের গল্প বলেন তেমনি বলেন মজার মজার ছড়া এবং ধাঁধাঁও। হাসি ঠাট্টা-গল্প-গানে জমে ওঠে এই সব আসর। এমন দুএকটি আসরে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ধাঁধাঁ মিশ্রিত ছড়ার আসরে উপস্থিত ছিলাম একা আমি। কিন্তু ধাঁধাঁর আসরে সঙ্গীছিলেন বন্ধুবর গোপাল মণ্ডল। আসরটি বসেছিল তরঙ্গপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজের পাশেই 'ভেউড়' গ্রামে প্রায় ২৫ বছর আগে।

পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে আমাদের এক ছাত্র নরেন আম কাঁঠাল আর বট-অশত্থের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম্য পথ দিয়ে নিয়ে চললো-পলাশ বর্মণের বাড়ীতে। সন্ধ্যার বাতি জ্বলছে ঘরে। নরেনের সঙ্গে গিয়ে বসলাম বারান্দায়। পলাশবর্মণ হাঁক দিতেই নাতিনাতনীরা এসে বসে গেল চারপাশে। আমাদের জন্য এলো দুধ আর মুড়ি। নাতনীরা ঠেলা দিতে লাগলো দাদুকে—'দাদো কাহা, ছিল্কা কাহা। কিন্তু দাদুর মুড্ আসতে একটু সময় লাগলো। বড় নাতনী কল্কেতে আগুন দিয়ে হুঁকো দিয়ে গেল দাদুর হাতে। বার সাতেক হুঁকোয় টান

দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে খোশ মেজাজে দাদু এবার বললেন— 'মুই কহ্‌ছিরে বুঝবা হবে।' কহত দেখি—

১।

ইটার পর উটা

তারপর তরতরিয়টা।

বিচতে করে টিপাং টিপাং।'

বুঝবা পারলিরে কি কহ্‌ছি? দাদু তাকিয়ে থাকেন সবার মুখের দিকে। ছোটরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

কলুর গাছট। কলুর গাছট্—চেঁচিয়ে ওঠে বড় নাতি।

হ-হ। ঠিক কহ্‌ছি—কলুর গাছট্।

আর কাহো দাদো। আর কাহো। আব্দার করতে থাকে অন্য নাতি-নাতনীরা। ভড়র ভড়র করে হুঁকোয় বার কয়েক টান দিয়ে একটু মৌজ করে এবার শুরু করেন—

২।

মাইগে মাই ছোটয়তে

পিন্ধে কাপড়

বড়য়তে নাই।

দাদু তাকান নাতি-নাতনীদের মুখের দিকে।

বাঁশট। বাঁশট। একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই। এই ল্যারে পারে গেল তরে। বলেই পলাশ দাদু এক গাল হেসে তাকান আমাদের দিকে। তার পরে বলেন কেমুন হইছে গে মাষ্টার বাবু?

ভাল। খুব ভাল। চালিয়ে যান আপনি।

বুঝবা পারছেন গে হাপনারা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝবা পারছি গে—গোপাল বাবু হেসে উত্তর দেন। আমাদের প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে দাদু হুঁকোয় ঘনঘন টান দিয়ে নতুন উদ্যমে এবার শুরু করেন—

৩।

গাছট্ থেকড়া।

ফলট্ বেকড়া।

কহ্‌তো কি?

মরিচট্। মরিচট! কি ঠিক কহচি না দাদো?

হ, ঠিকই কহচি! এলা কঠিন ছিকা দিম্। কহতো দেখি—

৪।

তলে কদু উপরে ডাং

নি কহ্‌বা পারিস্‌তো নানাক্ ডাকায় আন্।

নাতি-নাতনীরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কাণে কাণে ফিস্‌ফিস্ করে। এক সময় বড় নাতি বলে মুই কহ্‌বো দাদো?

কহ্। কহ্।—দাদু সম্মতি দেয়।

লাউ! উত্তর দেয় বড় নাতি। দাদু মাথা নাড়েন।

আল্লু। উত্তর দেয় বড় নাতনী। দাদু মাথা নাড়েন। ওলটৃ। ওলটৃ। দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসে ঠাকুমার কণ্ঠস্বর। দরজার ওপাশে উঁকি ঝুঁকি মারছে আরো দুচারটে মুখ।

ইস্ মুইতো কহবা পারনু হুইরে! কপাল চাপড়ায় বড় নাতনী।

ঠিকছে দাদো, অন্য কহো। চ্যালেঞ্জ জানায় বড় নাতি এবার। দাদু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মিটিমিটি হেসে বলেন—কহতো দেখি—

৫। হাত করক্সা পা করক্সা।
তার ছুয়া কিন্না লেধা লেধা।

ছোটরা মাথা চুলকায়। কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে দরজার দিকে তাকায়। কিন্তু ঠাকুমাও নিশ্চুপ। ভিতরে মেয়েদের ফিস্ ফাস আলোচনা চলে। বোধ হয় পলাশ বর্মণের ছেলেদের বৌরাও আসর উপভোগ করছে ওপাশ থেকে। বৃদ্ধ মুচকি হেসে তাকান আমাদের দিকে বিজয়ীর ভঙ্গীতে। ভাবখানা এই দেখছেনতো কেমন জব্দ করেছি সবাইকে এক সাথে।

পলাশ দাদুর ভাবখানা দেখে মৃদু মৃদু হাসি আমরাও। উৎসাহ পেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দাদু এবার চ্যালেঞ্জ ছোড়েন—'এইল্যা চাটৃকান্ (চতুর) মাইয়্যারা কহত দেখি টপ করি ?

'লাউ' উত্তর আসে ভিতর থেকে।

না হইল। মাথা নাড়েন দাদু।

কুমড়া। অন্য নারীকণ্ঠের উত্তর ভেসে আসে এবার।

হ, হ। বৌবেটি ঠিকই কহিলেরে। দাদু হতাশ!

ফির কহ দাদো, ছোট নাতনী আব্দার করে। --

এলাই সিধা ছিকা দিম্। কহতো—

৬। টিপ্লা সহয়নি।
আছড়ালি ভাঙ্গেনি।

ভাতটৃ। ভাতটৃ। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে সব নাতি-নাতনীরা।

হ, এলাই কহছি ঠিকই। ফির্ একটৃ সিধাছিকা দিম্—। কহতো কিটৃ ?

৭। 'ঘর্ ঘর্ ঘরণী।
ঘরছে তো দৃয়ার নি।'

ইটা হইছে ডিমা। ডিমা। উত্তর আসে ভিতর থেকে হ-হ-ডিমা। সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয় ছোটরা ফির কহো দাদো। ফির কহো। ছোট নাতি আব্দার করে এবার। অন্যান্য নাতি-নাতনীরাও তার সুরে সুর মেলায়। দাদু রাজী হয় না। রাত বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেরা হট্টগোল জুড়ে দেয়। দাদু শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন—

"মোড়লের ঘরে হাতিটি মরিছে।
মরা ডুগ ডুগ্ গন্ধাছে।
বনিয়ার মা—বনিয়ার মা
চুপ্ চাপ্ গুম্।"

হাতির নামে সকলে ভয়ে জড় সড় হয়ে যায়। আর 'রা' কাড়ে না কেউ। তখন দাদু বড় নাতনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—এলা, তোমরালা রঞ্জিত বাবুক একটু জল ম্যাংগা গান শোনাও দেখি।

সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় জল মাংগার গান ভিতর থেকে দিদা ও বৌদিরাও কণ্ঠ মেলায়।

আইসো হে মেঘা বইসো হে মেঘা।
খাও বাটার পানহে।
শালবাড়ী জঙ্গলে
তুহেরে মেঘা শালে
বহিনের ভরুয়া নারে।
সারারাত কাটাইলে
বহিনের বিছানায় রে।
আইসো হে মেঘা, বইসো হে মেঘা।
খাও বাটার পানহে।

শেষ হয় সমবেত কণ্ঠের মধুময় সঙ্গীত। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ি। হেরিকেন হাতে নীচে নেমে আসেন বৃদ্ধ পলাশ বাবু। নীচে নেমে আসে নাতি নাতনী-বৌঝিরাও। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলি, বড় সুন্দর কাটলো সন্ধ্যাটা। আরো ছড়া এবং ধাঁধাঁ ও গান শোনার ইচ্ছা আছে।

সময় করি চলি আইবেন, এলাই বৌ বেটিরা গান শোনাবো। ঠাকুমা বারান্দা থেকে আমন্ত্রণ জানান আমাদের।

আচ্ছা, আচ্ছা, নরেনকে নিয়ে চলে আসবো একদিন। পলাশ বাবুকে বিদায় জানিয়ে টর্চের আলোয় পথ দেখতে দেখতে নরেনকে নিয়ে এগিয়ে যাই কলেজের দিকে।

ছায়ায় ঢাকা গাঁয়ের পথ। আকাশে জ্যোৎস্নার আলো। ভেসে আসছে কুহু কুহু কোকিলের স্বর। বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম ছায়া সুনিবিড় গ্রাম বাংলার কথা। ভেসে উঠলো সেই চির পুরাতন চির নতুন সনাতন বাংলার পটে আঁকা ছবি। মুখর হয়ে উঠেলো অতীত দিনের সনাতন বাংলার মধুময় ছবি—যে বাংলার সন্ধ্যার অবকাশে আজো দাদু দিদিমা—ঠাকুর্দা-ঠাকমারা নাতি-নাতনীদের নিয়ে মেতে ওঠেন গল্পে-গানে-ধাঁধাঁর আসরে। অপরিচিত ব্যক্তিকে আপন করে নিয়ে সহজ সরল বৌঝি-নাতি-নাতনীরা খুলে দেয় হৃদয় দুয়ার। মেতে ওঠে গল্পে-গানে—ধাঁধাঁর আসরে।

এই পলাশ বর্মণও একদিন শিশু ছিলেন তখন তিনিও তাঁর ঠাকুর্মা-ঠাকুর্দার কাছে একইভাবে ছড়া-ধাঁধাঁ-গল্প শুনেছেন! তাঁর ছেলে মেয়েরাও শুনেছে তাঁর বাবা-মার কাছে। তাঁর নাতি-নাতনীরাও শুনছে আজ তাদের ঠাকুর্দা-ঠাকুর্মার কাছে। একদিন এরাও বড় হবে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হবে। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা হয়ে ধাঁধাঁ ছড়া ও গল্পের আসর বসাবে আজকের মতোই। বয়ে চলবে সেই সনাতন ধারা।

বাইরের পৃথিবীতে চলছে কতো ভাঙা গড়া। কতো উত্থান পতন। কিন্তু শত পরিবর্তনের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের নিভৃত গ্রাম প্রান্তে আজো লেগে আছে অতীত দিনের গন্ধ। জীবনযাত্রার সহজ সারল্যে হাসিতে গল্পে-গানে-ছড়ায়-ধাঁধাঁয় পোষাকে-পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায়-স্নেহে-প্রেমে-মমতায় আজো উজ্জ্বল সেই প্রাচীন দিনের গ্রাম জীবনের সহজ সরল ধারা। তবে সেই ধারা আর কতোদিন থাকবে বলা শক্ত।

কালিয়াগঞ্জ থানার ভেউড় গ্রামের আশে পাশে তরঙ্গপুর, আখানগর, মুস্তাফানগর, হাটকালিয়া গঞ্জ, রাতুন, আনাউন, বৈদুল এবং বংশীহারী থানার দেহাবন্ধ, ইটাহার থানার মনসাগ্রাম, কসবা, আমিনপুর, বদলপুর, হেতমপুর, বৈরহাট্টা, কুশমণ্ডী থানার রুয়ানগর, হিলি থানার কামারপাড়া, চোপড়া থানার কদমগাছি, দাস পাড়া, চোপড়া, লোকনাহার প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি সেই ভেউড় গ্রামেরই পরিবেশ। সেই একই সনাতন গ্রাম বাংলার বহমান ধারা।

উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে যেমন আছে আমার স্নেহভাজন ছাত্র নরেন দাস, জিতেন সরকার, সুবোধ চক্রবর্তী, মধু সূদন দাস, আরতি মজুমদার, রাণী বর্মণ, সুকেশী রায়, ভবতোষ সরকার, অনিল রায়, মালতী কুজুর, প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীরা তেমনই আছেন দেহাবন্ধের আনন্দ দাস, বৈরহাট্টার নারায়ণ রায়, আমিনপুরের হরিহর রায়, মুস্তাফানগরের হীরুবর্মণ, রুয়ানগরের কৃষ্ণ বর্মণ, যামিনী রায়, মধুবালা, জালাল গছের সুখেন প্রামাণিক, কদম গাছির বাবু রায়, দীপালী, সাবিত্রী, চন্দ্রেশ্বর, হরদিগছের সঞ্জয়, চোহাসিং, বেলেশ্বরী, চাকুলিয়ার রবীন দাস, সুজালীর অবলা, লোকনাহারের হিতোমনি ও কোফাতুন্নেষা, জামিনা, সাভানা ও সুরুন্নেষা প্রভৃতি অসংখ্য সহজ সরল গ্রাম্য নরনারী।

(খ) উত্তরবঙ্গের সংগৃহীত বিভিন্ন ধাঁধাঁর শ্রেণী বিভাগ :

(১) লৌকিক ধাঁধাঁ ও সাহিত্যিক ধাঁধাঁ :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী এক বিচিত্র লৌকিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। লৌকিক ধর্মাচরণে, ব্রতানুষ্ঠানে, পালাপার্বণে, সংস্কার ও বিশ্বাসে যেমন উত্তরবঙ্গ বাসীদের লৌকিক সংস্কৃতি চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান যথা রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা-লোকসঙ্গীত-ধাঁধাঁয়-ছড়ায় ও প্রবাদ প্রবচনেও।

সংগৃহীত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা ধাঁধাঁগুলিকে গুণগত দিক দিয়ে আমরা লৌকিক ও সাহিত্যগত ধাঁধাঁ হিসাবেই বিচার করবো প্রথমে। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এইসব লৌকিক ধাঁধাঁ গুলি। এই পর্য্যায়ের ধাঁধাঁগুলোর উত্তর খুব বেশী ভাবনা চিন্তা করে দেবার দরকার হয় না। শোনামাত্র স্মৃতি চারণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত ধাঁধাঁর আসরের সবকটি ধাঁধাঁই গ্রামীন মানুষের অভিজ্ঞতা ও লৌকিক চিন্তা ভাবনার ফসল। উত্তর দানের ক্ষেত্রে খুব বেশী চিন্তা করারও দরকার নেই। এসব ধাঁধাঁয় খুব বেশী অলংকার বাহুল্য নেই। ধাঁধাঁ গুলোর উত্তর যথাক্রমে কলুর গাছ, বাঁশ, মরিচ,

ওল, কুমড়া, ভাত, ডিম প্রভৃতি একান্তই পরিচিত বস্তু। লোক জীবনের একান্ত সাধারণ এবং পরিচিত জগতের মধ্যেই ধাঁধাঁগুলোর ঘোরা ফেরা।

আলংকারিক বা সাহিত্যিক ধাঁধাঁর সঙ্গে লৌকিক ধাঁধাঁর মূল পার্থক্য হলো লৌকিক ধাঁধাঁয় অলংকার বাহুল্য বা সাজসজ্জা নেই কিন্তু সাহিত্যিক ধাঁধাঁয় সাজ সজ্জা এবং অলংকার থাকে। ছন্দিল সুরও থাকে।

১। হো গেইল হো আসিল ভাই।
একঠাঁয়ে বসি জানে কত অঙ্গ তাই।

ধাঁধাঁটি ছড়াধর্মী। ছন্দিল সুরও আছে। এর উত্তর হলো **'চোখ'**।

অন্য একটি এই পর্য্যায়ের ধাঁধাঁয় বলা হচ্ছে—

২। 'ধূলায় ধূসর ভাই কুণ্ঠিয়া যাবোরে ?
চুপ্ চুপ্ গাছের টেঁপুয়া ভাই বলিস নারে।
তোক মোকে রান্ধে খাবে একঠিয়ারে।

এটিও ছড়া ধর্মী ধাঁধাঁ। উত্তর হলো কাছিম ও বেগুন।

৩। ঘি চম্ চম্ মাণিক লতা।
এ ধন তুই পেলি কুথা ?
আজার ভাঁড়ারে নাই
আগুনে হারায়।

—(বরফ)—(মালদা)

৪। উপরেতে পাইল ফাটিং গা বরণ।
নাং থিতিবা দিলে বড়ই যতন।

এই ছড়াধর্মী ধাঁধাঁটির উত্তর হলো 'শিলাবৃষ্টি'।

৫। আকাশ হৈতে পইল তীর।
কাপড়া হইল চৌচির।
ধোপী না দেয় ধুইয়া।
দরজী না দেয় সিয়া।
কি হইল কহত মন দিয়া ?

এই ছড়াধর্মী ধাঁধাঁর উত্তর হলো 'কলাপাতা'।

এই ধরণের সাহিত্য রসাশ্রিত আরো কয়েকটি ধাঁধাঁর উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে—

৬। টুঙুর টুঙুর বাজনা বাজায়
বাদ্যি সে ভাই নয়।
মানুষ গরু খায় বটে হায়
বাঘ সে তবু নয়।

(মশা)

৭। তিনভিতি তিন তাল
মধ্যি খানে মহাকাল।
মহাকাল ডিমা পাড়ে
কুন্ ব্যাটা গুণাইতে পারে ?

(তিনদিকে তিনটি তালের মতো উঁচু জিনিষ। মহাকালরূপী হাঁড়ি ডিমা এখানে ভাত) [উনুন-হাঁড়ি-ভাত]

৮। কাঁচ কঞ্চি নৌকা ডাল
ফুল ফুটে বৈকাল।

(তারা)

৯। চেচো চেচি চেচোলা,
ওরের ফুল কাঁচকলা।
তাতে আছে কাপুর বাঙ্গা,
তাতেই আছে কালাই
তাতেই মিলে তূলা
কি কহত বালা ?

(শিমূল ফল) কুচবিহার।

১০। জমিন চষিয়া চাষী করে অনুমান।
ছাপুর হইয়া গাছ দ্যাখে আসমান।
ফুল বটে কাঞ্চন ফুলষেন বেল।
সেই গাছ দেখি মোর ধন্দ লাগি গেইল।

(বেগুন গাছ)

১১। পেচাই পেচাই জন্মতার
ইয়ার কিবাগুণ ?
এই কথা বুঝবার লাগে
জ্ঞানী জনের ধূন্।
চাষা বুঝে আট দশে
জ্ঞানী বুঝে বৎসর ছয়,মাসে।

(বেতের কাঠা) জলপাইগুড়ি।

১২। ছোট্ট সে এক মাইয়া
পান-সুপারি খাইয়া
শাল বাড়ী জঙ্গলেতে
নড়াই করে যাইয়া।

(আগুন) কুচবিহার।

১৩। তেল জুপ্ জুপ্ পাতা
উপরে তার কাঁটা।
খাইতে মধুর
বিচিত গোটা গোটা।

(কাঁঠাল)

১৪। আকাশে বসত বাড়ী
নাম ধরে নারী।
সকলেই চিনে তারে
নহে সে নটিনী।
আকাশে তে গঙ্গা ওরে
হইল সেবন্দী কেমুনি ?

(নারিকেল) জলপাইগুড়ি।

১৫ উঠিতে ডগমগ বসিতে বাহার।
শত শত জীব ধরে করে না আহার।

(মাছধরা জাল)

১৬। দৌড়ে গেনু দৌড়ে এনু
ফকির গঞ্জের হাট।
এক তামাসা দেখিয়া এনু
বুকের ওপর দাঁত।

(বিদা)

১৭। নালটুক টুক নাল টুক টুক্ কাজলের কৌটা।
সোন্দরী সে নুকিয়ে গাছেই বাসা।

(করমচা` মালদা।

১৮। পাশেই দেখি গাছ্টা।
ফল ধরে বারোটা।
পাকলে থাকে একটা।

(একবছর) মালদা

১৯। বাজন শিখবার আশে
হুঁকাটি ভাঙিয়া মুই বানানু দোতারা।
তাই না দেখিয়া হাসে যতো পড়শীরা।
দোতরা ছাড়িয়া মুই এখন করিম্ কি ?
বাজন শিখবার আশে বারানু হুঁকাটি।

(লাউ) জলপাইগুড়ি।

২০। এক দেশেতে দুই রাণী দেখিতে সুন্দর।
কালাবরণ মুকুট মাথায় বাচ্চা ছেলে খায়।
যুবালোক দেখিলেই ভয়েতে লুকায়।

(মাই) কুচবিহার।

২১। ধান নাড় নাড় সখী ধান দিয়া পাও।
মুই সখী হাটে যাই কি কি খরচা চাও ?
অঞ্চল গাঁট চঞ্চল গাঁট।
কামছে মোর পাত্র সোনার ঘাট।
মুরা আনিও, আনিও হাতির দাঁত।
আর যাহা পাও আনিও তোমার সাথ।

(মূলা)

ছড়ার ছন্দে রচিত সঙ্গীতময় এই ধাঁধাঁটি। এই ধাঁধাঁটির নিহিত অর্থ হলো হাতির দাঁতের মতো দেখতে মূলা।

২২। একটুকুনি মাইয়া
ঘরত্ যায় ছাইয়া।

(প্রদীপ) কুচবিহার।

২৩। আজার ঘরের দীঘিলা।
শুকাইতে শুকাইনা।

(জিভ্) জলপাইগুড়ি।

২৪। জঙ্গলেতে বেরাল টিয়া।
নাল টুপি মাথাত দিয়া।

(মোচা)

২৫। আবেগে ভাবো।
বইর খাবো খাবো।
বইর গাছত ভল্লাসাপ।
উল্টায় মারিলে কদালের ছাপ।

(কুসগাছ ও কুল)

২৬। দেয় না তো কেউ ধুইয়া সাবান জলে দিয়া।
সেই কাপড়া পাতিয়া দেই মোর বিটার বিয়া।

(কলারপাতা)

(খ) বিষয়গত দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গীয় ধাঁধাঁ :

(১) প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাঁ :

ধাঁধাঁ রচনার ক্ষেত্রে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতি বিশেষ ভাবে প্রেরণা দিয়ে এসেছে। লৌকিক ধাঁধাঁ রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃতির অতি সাধারণ বিষয় বস্তুও অসাধারণ হয়ে উঠেছে দেখা যায় বহুক্ষেত্রেই। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাঁগুলোর মধ্যে কল্পনা শক্তির আশ্চর্য্য বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। অতি পরিচিত বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব ধাঁধাঁগুলোর এখানে উল্লেখ করবো সেগুলো পর্য্যালোচনা করলেই আমাদের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

১। মাঝ নদীতে সোনার থালি।
ঝক্ মক ঝক্ করছে খালি।

সূর্য্য

২। আপুর কঞ্চি পুরাট বাঁশ
ফুল ফুটে বারো মাস।

(তারা)

বারো মাস ধরে যে তারা আকাশে ফুটে থাকে তাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এখানে।

৩। 'বাপে ডাকে মায়ে ডাকে ছুয়াও ডাকে মামা।
কি কহ্‌তো আস্‌মানে যারা দেয় হামা ?'

(চাঁদ ও সূর্য্য) জলপাইগুড়ি।

৪। উপরেতে পৈল টুম্‌কি
টুম্‌কি নাচন নাচে।
সোনার টুম্‌কি ভাঙি যাইলে
কে গড়াইতে পারে ?

(বৃষ্টি)

ছড়াধর্মী এই প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাঁটিতে পল্লীর ধাঁধাঁকার বৃষ্টির ফোঁটাকে কেন্দ্র করে কী অপূর্ব ধাঁধাঁই না রচনা করেছেন।

পরিচিত ফল গাছ-ফুল-সব্জী নিয়েও রচিত হয়েছে কতো সব ধাঁধাঁ।

৫। হাতে মাখে ডাঙায় চষে।
কে কহিতে পারে বসে ?

(তামাক) কুচবিহার।

৬। চিকন চাকন বাপ জেনো তাই
বেটা সে চাখনাই।

(কলা)

৭। কাঁচাতে খায় পাকাতে খায় না।
কি কহতো ময়না ?

(বেগুন)

৮। লাল টুক টুক পাখীর পা
মা ঝুপরী বেটি সুন্দরী।

(মরিচ) কুচবিহার।

৯। উপরতে পৈল ধূম।
ধূম বলে মোর কোটি গিল শুং।

(পাকা আম)

(ধুপ করে গাছ থেকে পড়ে বলে পিছনটা শুঁকে দ্যাখো)

১০। মাটির উপর লাঠি।
লাঠির উপর কটি।
কটির উপর দানা।
যাই না বুঝিবা।
তার বংশ গিলায় কাণা।

(পদ্মবীজ) কুচবিহার।

১১। কুশি মালুম, হাড্ডি জ্বালুম।
খায় মার,—খেদায় জ্বার।

(পাট)

আখ নিয়ে কি অসামান্য ধাঁধাঁই না রচিত হয়েছে—

১২। ফেলানু মুখুরি কানাই হৈ ভেল্।
হায়রে বাপা, বাছনি মোর কুন্না গেইল ?

(আখ)

১৩। বন হতে বেরাল বুড়ী।
তার চোখ আঠার কুড়ি।
কি কহতো শুনি ?

(আনারস)

১৪। দৌড়ে গেনু দৌড়ে এনু
ধন কলেরই হাট।
বাড়ীত্ আইসে দেখি হাইগে
ফলের উপর পাত।

(আনারস)

বাঁশ, কলারপাতা, সুপারি, কাঁঠাল, ডাব, তাল, শসা, মোচা, ব্যাঙের ছাতা কিছুই বাদ যায়নি ধাঁধাঁর রাজ্যে।

১৫। ডাডাং ডাডাং ঢাক।
ছোট্ট বেলায় পিন্ধে কাপড়
বুঢ়া কালেই ফাঁক।
কি কহতো বাপ ?

(বাঁশ)

১৬। কালো গাই কপালে কুটুস্ চিৎ।
কি কহতো খাবার সে হিত ?

(কলাই)

১৭। আগড়ার উপর ঝাপড়া।
উপরেতে পানি।
কোমর ভাঙিয়া পানি করে টানা টুনি।
কি কহতো গুণী ?

(পাট ধোয়া)

১৮। দুই পালেতে এক মাস্তুল
কে গোনাইতে পারে ?

(কলার পাতা)

১৯। লম্বা গাছটৃ কুলোর পাতটৃ।
বুঝলি পরে ফলটা না বুঝলি কলাটা।
(পদ্মফুলের গাছ)

২০। আসমানেতে হঠাৎ নাড়ু
কুন্ বিরিক্ষের পাত ?
নদী তীরে চিল য্যান সে
দেখবা হাতির দাঁত।

(সুপারি) জলপাইগুড়ি।

২১। ইমার বেটি সীমা
তার বেটিটি ঢিমা।
পেটের ভিতর ডিমা।

(কাঁঠাল)

২২। খালে বিলে নাই জল,
গাছের ডগায় জল।

(ডাব)

২৩। নিমন বীচি উঠে সোজা।
পাতাল চিরি যেন আজা।

(ব্যাঙের ছাতা)

২৪। শুইন্য থিকা পড়ে ছুয়া
মাথায় টুপি দিয়া।

(তাল)

২৫। কাটলি পরে বাড়ে
না কাটলি না ছাড়ে।

(দীঘি)

২৬। উপরত ঝাং তলাতি লেদাং।

(মূলো)

২৭। বন থিকা বেরাল টিয়া
নাল টুপি মাথায় নিয়া।

(মোচা)

২৮। বাপ চিন্ চিন্ মাও পাতারী।
ভাই চেন্দেলা বহিন সোন্দরী।

(শসা) কুচবিহার।

২৯। হেকর কুজা খুরে মাটি।
দশখান্ ঠেং তিনখান কোটি।

(কোটি অর্থাৎ কোমর) [চাষী-লাঙ্গল-বলদ]

(খ) কীটপতঙ্গ পশুপাখী নিয়েও উত্তরবঙ্গের গ্রামের সাধারণ নরনারী কতো সব অসাধারণ ধাঁধাঁই না তৈরী করেছে। এখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই ধরণের কয়েকটি ধাঁধাঁর উল্লেখ করবো এবার।

১। শুন্যে আইসে শুন্যে যায়।
শুন্যে গড়ে ঘর।
পরম ঈশ্বর বানাই দিল
গরাদ নি কামর।
কি কহতো বর ?

(গরাদ ছাড়া কামরা) [মাকড়সা]

শুন্যে অপূর্ব কৌশলে মাকড়সা জাল নির্মাণ করে ঘরের মতো করে তাই দেখে গ্রামীন মানুষের যে বিস্ময় সেই বিস্ময়ই রূপ পেয়েছে এই ধাঁধাঁটির মধ্যে। সামান্য মশাকে নিয়েও রচিত হয়েছে সুন্দর ধাঁধাঁ।

২। গুণুর গুণুর শোনায় সে গান
গান তবু সে নয়।
হাতি-ঘোড়া-মানুষ সে খায়
দৈত্য-দানা নয়।
যে জানো সে কহতো নিশ্চয়।

(মশা) কুচবিহার।

ব্যাঙও বাদ যায়নি ধাঁধাঁর জগতে। কি সুন্দর এই ধাঁধাঁটা।

৩। শোলার পানা ভাসত্ জলে।
পাথর পানা ডুবে।
মান্সের পানা হাত পা-বটে
কুকুর পানা রসে।
কি কহতো বসে?

(ব্যাঙ) জলপাইগুড়ি।

কাঁকড়া, ছাগল, শামুক, কেঁচো, জোঁক, মৌমাছি নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

৪। ঠেঙ্গিয়ারে ঠেঙ্গিয়া
কুন্না গেইল দুই ঠেঙ্গিয়া?
সাত সমুদ্দুর লঙ্কা পার।
মারবা গেইল দশ ঠেঙ্গিয়ার।

(কাঁকড়া)

৫। আগদি মরদানা পাছাতি মাইয়া।
পেট খানা ইয়া বড় ভাইয়া।
(ধাড়ী ছাগল) (কুচবিহার।)

ধাঁধাঁর জগতে হাতিও ঢুকে পড়েছে অনায়াসে।

৬। হাতেতেই নাক তার
পাও লোধা লোধা।
ধুপ ধাপ্ চলে হেঁটে
হাত যেন গদা।

(হাতি) কুচবিহার।

৭। ব্রজেতে জনমতারনিনন্দনালা।
হাজারো গোপিনী সাথে করে নিত্য খেলা।

(ষাঁড়) মালদা।

শামুক নিয়েও তৈরী হয়েছে মজার ধাঁধাঁ—

৮। আজার বিটা ধনেশ্বর।
কোয়ারিসে বান্ধে কড়া কড়।

(শামুক)

ধাঁধাঁকারের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়নি সামান্য কেঁচোও।

৯। চেউর চেউর ঘরত মাটি।
মাটির উপর বাটি।
কুন্‌বা সে জীউ খাঁটি ?

(কেঁচো)

মৌচাকের বিস্ময় রূপায়িত হয়েছে ধাঁধাঁর বিস্ময়ে—

১০। ঘর থাক্ থাক্
সেনা ঝাঁক্ ঝাঁক।
আজা নাই আণী জানা।
সেই ঘরতে ঢুকতি মানা।
(মৌচাক) জলপাইগুড়ি।

১১। ইউরে ইউ।
উপরি মাথায় হাগে কুন্ জীউ ?

(কেঁচো) দার্জিলিং।

১২। আজার বেটি ধনদোল কোটি।
বিন কদালে খুদে মাটি।

(ইঁদুর) জলপাইগুড়ি।

ডাঙার জোঁক নিয়েও তৈরী হয়েছে ধাঁধাঁ।

১৩। বন হৈতে বিরাইল বাঘ
নেতু ধরিয়া এক পাক।

(ডাঙার জোঁক)

১৪। হামি মরেছি।
তুই মরিস না।
বসে আছে ঠগ জানিস না।

(কেঁচো ও মাছ)

১৫। আংখির উপর পাংখির বাসা।
আন্ধারে খাইল ছুয়া, হায় কি তামাসা।

(বিড়াল ও বাজপাখী)

১৬। চার কলসী রসে ভরা।
বিনা ঢাকায় উপুড় করা।

(গাভীর দুধের বাট) মালদা

১৭। আনাক মানাক তানাক তেই।
চোখ আছে তার মাথা নেই।

(কাঁকড়া)

১৮। নিডিম্ চোরেই আফুলা শাক।
কুন্ সে জীবের আঠারো নাক।

(বাদুড়)

১৯। চাইরভাই খুটুর খাটার।
দুই ভাই সনার ঠাকুর।
একভাই চামর ঢুলায়।
দুই ভাই মঞ্জুরা বাজায়।

(গরু)

২০। শতেক সে ঘর ছে
গাছের আগায়।
সাবধানে পাশে যাও
গুণ গুণ্ ছায়।

(মৌচাক)

গরুর জাবর কাটাও দৃষ্টি এড়ায়নি গ্রাম্য ধাঁধাকারের।

২১। দিলি খায় না।
না দিলি খায়।

(গরুর জাবর কাটা)

২২। তিন অক্ষরে নাম তার জলের নীচে ঘোরে
মাঝের অক্ষর দিলি ছাড়ি আসমানেতে ওড়ে।

(চিতল)

২৩। মাসের উপর ঠোংরা।
বুঝেক দিবে সোংরা।

(হাতের নখ)

বগা পাঁঠাকেও নামানো হয়েছে ধাঁধাঁর আসরে।

২৪। নি পাইক নি কোটাল
ঘোরত বাড়ী বাড়ী।
রাজানি মুণীনি।
লাম্বা যে তার দাড়ি।

(বগা পাঁঠা)

জল নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

২৫। হাত নাই পাও নাই
সল সলাইয়া যায়।
পিঠিতে নাই মাস চামরা
সব লোকেতেই খায়।

(জল) কুচবিহার।

২৬। দুই সোতনীর এক পেট।
জলের মাঝে ভেট।

(ঝিনুক)

গার্হস্থ্য জীবন কেন্দ্রিক ধাঁধাঁ :

উত্তরবঙ্গের লৌকিক ধাঁধাঁয় স্থান পেয়েছে গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ও অতিপরিচিত সব দ্রব্য সামগ্রীও।

ছাতা মানুষের পরম বন্ধু। এই ছাতাকে নিয়ে রচিত হয়েছে নিম্নের ধাঁধাঁটি—

১। ঘর ঘর ডুং ডুং
একেং নাচে সুং সুং।
(এক পায়েতে সারা ঘর জুড়ে থাকে)

(ছাতা)

আঁধার রাতের বন্ধু লণ্ঠনকে নিয়ে রচিত হয়েছে এই ধাঁধাঁটি—

২। চারদিকেতে নোহার ঘেরা।
মাঝ খানেতে সোনার চূড়া।

(লণ্ঠন)

নাপিতের কাঁইচি এবং চুল নিয়েও ধাঁধাঁ রচিত হয়েছে।

৩। বেতের গুহায় নাগানু ছুরি
বেত কাটা গেইল আঠারো কুড়ি।

(কাঁইচি ও চুল)

মাটির হাঁড়ি-কলসী নিয়েও রচিত হয়েছে সুন্দর সুন্দর ধাঁধাঁ—

৪। লাল মাটি হাটে যায়।
গালে মুখে চড় খায়।

(হাঁড়ি কলসী)

৫। কাঁচাতে তুল তুল
পাকাতে সিন্দুর।

(হাঁড়ির-কলসী) কুচবিহার।

মেয়েদের ব্যবহৃত শিল-নোড়াও ঢুকেছে ধাঁধাঁয়—

৬। ভাইরে ভাইরে নিছালিয়া (ছাল নেই)
খুটা খান কুণ্ঠি পাই গিয়া। (কোথায়)

(শিল ও নোড়া)

সামান্য ঘর মোছা ন্যাকড়াও ঢুকে পড়েছে ধাঁধাঁয়।

৭। থেপ্ থেপ্ পেচেরৎ
কি কহতো ভাইরে।

(ঘরমোছা ন্যাকড়া)

শোবার চৌকি নিয়েও বাঁধা হয়েছে ধাঁধাঁ—

৮।	চাইর ঠেং হাবা-ডাবা
মাথাও তার নাইরে বাবা।

(চৌকি) কুচবিহার।

নিত্য ব্যবহার্য লবণ নিয়েও ধাঁধাঁ বেঁধেছে গাঁয়ের মানুষ—

৯।	ইচরি বিচরি।
নাই চেচা, নাই বিচি।

(লবণ)

(ইচরি বিচরি—দানা, চেচা—খোসা)

উত্তরবঙ্গের গাঁয়ের মানুষ এখনো হুঁকা টানে। সেই হুঁকা নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

১০।	থাকের উপর থাক্।
তার উপরে তাক।
তার উপরত্ বাপরে বাপ্
গোল গোলিয়া সাপ। (গোলাকার)

(হুঁকা-কলকে)

শোলাকে নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

১১।	ঠাকুর ঠুকুর নয় বটে সে
মাথার উপর চড়ে।
জলেই জনম জলেই ধরম্
আই মালাকার গড়ে।

(শোলার টোপর)

জল সেঁচা ডোঙা নিয়েও ধাঁধাঁ রচিত হয়েছে—

১২।	বারো হাত ব্যাঙ্গিট।
তের হাত বীচিট্।

(ডুঙ্গী)

(ছোট টিনের ডোঙায় তেরোটা বাখারি থাকে)

ধাঁধাঁটি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির সঙ্গে তুলনীয়।

কুপি বা ল্যাম্প নিয়েও ধাঁধাঁ রচনা করা হয়েছে—

১৩।	ধাপে যাই ফুটিল ফুল।
আজার বাড়ী টুল টুল্।

(কুপি) মালদা।

ঝাঁটাও এসেছে, ধাঁধাঁর রাজ্যে—

১৪। 'ই ধাপতে ই ধাপ্ যায়।
বারে বারেই আছাড় খায়।

(ঝাঁটা) মালদা।

পায়ের জুতোও বাদ যায়নি ধাঁধাঁর আসরে—

১৫। চামড়ার ভিতির চামড়া ঢুকে
হায় কিরে হায় 'সুখ'।
খুস্ করি টান দিলি পরে
ঘাং-ঘাং-ঘাং মুখ। (ঘাং ঘাং হা)

(জুতো) কুচবিহার।

হালের মই নিয়েও ধাঁধা বেঁধেছে গাঁয়ের মানুষ—

১৬। ধাপুং ধুপুং ধাপ্।
দুই খান্ ঠেং চাপ্। (ঠেং-ঠ্যাং)

(হালের মই)

ঘরের দরজাও ঢুকেছে ধাঁধাঁর জগতে।

১৭। এক ঠেলাতেই খুলি গেইল।
এক টানেতেই ঝাপুস্ হেইল (বন্ধ)

(দরজা)

চেরাগ বাতি বা প্রদীপ নিয়েও ধাঁধাঁ রচিত হয়েছে।

১৮। চাইর ডেনা এক ঠোঁট।
না কহতো বহিন চোট্।

(প্রদীপ বা চেরাগ)

(প্রদীপের মুখ কেঠোঁট এবং শিখাকে ডানা বলা হচ্ছে)

খড়ম নিয়েও হয়েছে মজার ধাঁধাঁ।

১৯। হুরা-হুরা-হুরা (ওহে)
তোর কমর কেন সুরা ? (সরু)

(খড়ম)

বস্তাকে নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

২০। খাইলে পরে বসে,
নিখাইলে পড়ে।

(বস্তা)

ঘড়ি নিয়েও তৈরী হয়েছে ধাঁধাঁ।

২১। 'নিচোখ নিকাণ চলে ঠিকাঠিক।
নিহাত, নিপা, টিক্-টিকা-টিক।

(ঘড়ি)

মাছ ধরার পলোও ঢুকে পড়েছে ধাঁধাঁয়।

২২। হাতে নিয়ে গেনু খালে।
পানি গেইল পেটে।
ঝুপ্ ঝাপ্ ঘাটে।

(পলো)

সধবা নারীর এয়োতির চিহ্ন সিঁদুরও ঢুকেছে ধাঁধাঁয়।

২৩। সোন্দর অং বটে
নি বোঁটা গোটে। (গোড়ায়)
গাছের মাথাত্ ফুল
কেমুনে সে ফুটে ?

(সিঁদুর)

২৪। গোগো পাখী যায় উড়ে
দেহ ছাড়ি চোখে ধরে।

(ধোঁয়া) মালদা।

মাছ ধরা জাল নিয়েও রচিত হয়েছে সুন্দর ধাঁধাঁ।

২৫। উঠিতে ডগমগ
বসিতে বাহার।
শত শত ধরে জীব
নিকরে আহার ?

(মাছ ধরা জাল)

মাটির প্রতিমাও ধরা পড়েছে ধাঁধাঁয়—

২৬। কাঁচতে তেল তেলে।
পাকিলে রতন জ্বলে।
গুরু হইয়ে শিষ্যের প্রণাম।

(মাটির প্রতিমা) মালদা।

উনুন নিয়েও রচিত হয়েছে সুন্দর ধাঁধাঁ।

২৭। এই টিকুনা বাছুর।
পোয়াল খাবার আসুর।

(উনুন)

(এইটুকু বাছুর। পোয়াল খাবার অসুর)

২৮। 'দিলি গেইল। নাদিলি ভেইল।

(উনুন)

মাছধরা ছিপ নিয়েও ধাঁধাঁ তৈরী হয়েছে।

২৯। নাম্বা নড়ি-হাই টান্। (লম্বা লাঠি)
আই, মা ছুয়ার সুখ খান্।

(ছিপ) কুচবিহার

কাস্তেও বাদ যায়নি ধাঁধাঁর জগতে।

৩০। আট পহরে খায় দায়
আলুক-ফালুক চায়।
নি মিটে তার ক্ষুধার জালা
কি কহতো বালা ?

(কাস্তে)

বন্দুক নিয়েও তৈরী হয়েছে মজার ধাঁধাঁ।

৩১। নাম্বা সুখে পাংখিটি মোর
নোহার কেলাই খায়।

(বন্দুক) দার্জিলিং।

জামা নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

৩২। নি মাথা, নি পা, নি-তার চোখ।
মুখের ভিতির পুরছে দ্যাকো হাজার নোক।

জামা নিয়ে অন্য একটি ধাঁধাঁ—

৩৩। ঘরহৈতে বারাইল বাঘা।
কুণ্ঠি গেইল মাথাট বাপা ?

(জামা) কুচবিহার।

বাড়ীর ছাগীও বাদ যায়নি ধাঁধাঁর আসরে।

৩৪। দূর হৈতে আইল বাগী।
আধেক মদ্দ আধেক মাগী।

(দাড়িওয়ালা ছাগী)

বালিশ নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ।

৩৫। নিখায় নিদ না যায়।
পরের মাথা 'আগা চায়।
এই কথা শুনি মোর ধন্দ লাগি যায়।

(বালিশ) দার্জিলিং।

ঘুড়ি নিয়ে—

৩৬। আকাশত্ নাল পাত।
পাতালত্ ডোর।
এই ছিকা যে বুঝিবা নিপারে
তাক্ দয়া নারে।

(ঘুড়ি) মালদা।

পান নিয়েও ধাঁধা রচনা করেছে—

৩৭। গাঁয়ের মানুষ।
নোঙ্গর সিট্ সিট্ বুক চওড়া।
নি কহিবা পারে যে তার বাপ বোক্‌রা।

(পান)

(নোঙ্গর—লেজ—সিট্ সিট্—সরু—চওড়া বুক—বোকারা—বোকা)

৩৮। শাঁখা, চুড়ি পরা নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে
'হাইসা হাইসা যায় মাইয়া পর পুরুষের কাছে।
দেওয়ার সময় উংয়া করে দেওয়া হইলি হাইসে।

(শাঁখা পরা) দার্জিলিং

৩৯। নিবার সময় উশখুশ্।
ভিতির গেলি খুব খুশ।

(মেয়েদের চুড়িপরা) মালদা

নীচের ধাঁধাটিতে বেশ য়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪০। চিৎ কইর‍্যা দিনু ফেইলা।
চড়নু বুকের পরে।
কমর নড়ে দেহাও নড়ে
ছাড়নু রে কাম সারে।

(শিল-নোড়া)

জাঁতা নিয়েও তৈরী হয়েছে সুন্দর ধাঁধা।

৪১। মুখোমুখী বসে গেনু।
ঘষাঘষি করে নিনু।
কাপড়া দিয়া মুছে নিনু।

(জাঁতা) মালদা।

৪২। বসত পাখী ঝম্ ঝম্।
উড়াল পাখী সাদা।
পাখী যেই বইসে চড়ায়।
ডুম ক্যান বাঁধা ? (ডুম-লেজ)

(খ্যাপলা জাল) মালদা।

৪৩। তিন বরণে নাম তার সবলোকেতে খায়।
শেষের বরণ বাদ দিলি মানষের নাম পায়।
(লবণ) দার্জিলিং।

৩। পারিবারিক সম্পর্ক মূলক ধাঁধাঁ :

পারিবারিক সম্পর্ক নিয়েও উত্তরবঙ্গের গাঁয়ের মানুষরা রচনা করেছে বহু ধাঁধা।

১। মোরা বাপ বেটা, তোরা বাপ বেটা।
তিনটা পিঠা গোটা গোটা।
কি কহতো হবে ইটা ?
(নাতি-বাবা-ঠাকুর্দা) কুচবিহার।

২। এক ঠাঁয়েতেই বসত্ করি
তুই মোর কে ?
মোর ভাতার বিয়া করিছে
তোর ভাতারের মাকে।
(শ্বাশুড়ী-বউ) মালদা।

৩। হাসি হাসি মুখ খানা
ঠাট্টা করো মোক্
মোর শ্বশুর ব্রিয়া করিছে
তুমহারই মাক্।
(বউ-বর) মালদা।

৪। তুমি কার বা মায়ের বাপের বেটা
ভাবি কহতো সিটা ?
(ভাগ্নে বা ভাগ্নীর)

৫। এক বেটার মা ঠাকুরি।
দশ বেটার মা কি ?
(কুকুরী মা)

৬। শাঁখা পিন্ধে গোরা গা।
ধোয়ান পুছান কার ছা ?
উটার বাপ যার শ্বশুর
সেটা হয় মোর ভাসুর।
(ছোট ভায়ের স্ত্রী ও বড় ভায়ের শালা)

৭। এক গাছেতে তিন নারিকেল।
পাড়াও বাপু খাই।
তুমরা খাও বাপ বেটাতে।
হামরাও বাপ বেটাতে
গোটা গোটা পাও।

(ঠাকুর্দা-বাপ-ছেলে)

৮। ছকইন্যা নকইন্যা বেল তলাত যায়।
তিনডা বেল পইড়্যাছে গোটা গোটা খায়।

(মা-ছেলে-মেয়ে) দার্জিলিং।

(ছ-ছা-মাও নবকন্যা)

৪। পৌরাণিক ধাঁধাঁ :

উত্তরবঙ্গের গ্রামীন মানুষের জীবনে রামায়ণ-মহাভারত এবং বেদ পুরাণের কাহিনী নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে দেখা যায়। চণ্ডীমণ্ডপে আজো সন্ধ্যার অবসরে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পঠিত হয় এবং আলোচনাও চলে। দেবদেবীর পূজায় নৃত্যে-গানে-ছড়ায়-যাত্রায়-ব্রতকথায় তথা লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রামায়ণ-মহাভারত ও শাস্ত্রপুরাণাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রপুরাণাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ধাঁধাঁর ক্ষেত্রেও। শাস্ত্র পুরাণাদির ছায়ায় রচিত যে কয়েকটি ধাঁধাঁর কথা বলা হচ্ছে এখানে—তাদের প্রতিটি ধাঁধাঁই সাহিত্য রসাশ্রিত।

১। মজা সুপারি ছাঁচি পান।
বর-বহুতে-বাইশ কাণ।

(রাবণ ও মন্দোদরী)

(রাবণ বয়স্ক, মন্দোদরী অল্পবয়স্কা রাবণের কুড়ি কাণ ও মন্দোদরীর দুটি কাণ)

অপর একটি রূপকধর্মী পৌরাণিক ধাঁধাঁয় ধাঁধাঁকারের আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তির পরিচয় মেলে—

২। লক্ষ্মী-নারাণক্ এক চাপে বসায়ে
নোকে পূজে আগুন জ্বালায়ে।
আগুনের জ্বালা নি সহিতে পারি
বহুর ঘরেতে ঢুকে বর আই মরি।

(জল ও চাল)

এই রূপক ধর্মী ধাঁধাঁটির অর্থ হলো চালরূপী লক্ষ্মী এবং জলরূপী নারায়ণকে এক হাঁড়িতে বসিয়ে আগুনে তাপ দিলে জলরূপী নারায়ণ লক্ষ্মীরূপী চালের মধ্যে প্রবেশ করে।

বনবাসী রাম-লক্ষ্মণের যোগী বেশ নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ—

৩। পাহাড়ে বনেতে ঘোরে পশুদের মাঝ।
আজানি-মন্ত্রীনি যোগীদের সাজ।

(রাম, লক্ষ্মণ) মালদা।

অভিমন্যুকে নিয়ে রচিত এই ধাঁধাঁটিতেও ধাঁধাঁকারের কল্পনা শক্তি এবং কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয় যায়—

৪। 'অষ্টমীতে একাদশী
বিধবা খাইলে পাপ হয়।
নি খাইলে গর্ভ অয়।

(উত্তরা)

অভিমন্যুকে সপ্তরথী এবং জয়দ্রথ বধ করেছিল। অর্থাৎ সাতজন ও একজন মোট আটজন মিলে। বিষপান করে আত্মহত্যা করলে পাপ হবে তাই উত্তরা বিষপান করেনি। ফলে তাঁর গর্ভ রক্ষা পেয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধাঁ—

৫। জনমের পরেতেই ভিন্ ঘরে বাস।
সকলেই জানে তারে পুরে মন আশ।

(শ্রীকৃষ্ণ)

দ্রৌপদীকে নিয়েও রচিত হয়েছে মজার ধাঁধাঁ।

৬। দুই হাত মাইয়্যার অঙ্গন কিবা।
পাঁচমুখ সোয়ামীর কহতো সে কেবা ?

(দ্রৌপদী)

অপর একটি ধাঁধাঁতে রীতি মতো প্রহেলিকার সৃষ্টি করা হয়েছে দেখা যায়। দ্রৌপদী ও অভিমন্যুকে নিয়ে।

৭। ভাই-নি-দাদা-নি—দেওরের ছুয়া।
সতীনের বেটা সেই ভাসুরের পুয়া।

দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী। যুধিষ্ঠির ও ভীমকে স্বামী ধরলে অর্জুন পুত্র অভিমন্য দেওরের ছেলে হয়। আবার নকুল ও সহদেবকে স্বামী ধরলে অর্জুনপুত্র ভাসুরের ছেলে হয়।

অন্য একটি ধাঁধাঁতেও রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কুশকে নিয়ে—

৮। বাপ নি দেয় জনম্ তারে।
জনম্ দিল পরে।
জনম্ যখন হৈল তার
মা নিছিল ঘরে।
কেবা সেই ছুয়া বটে,
বাপ কিবা রটে ?

(কুশ ও রামচন্দ্র) দার্জিলিং।

৯। নিছিল মায়ের গর্ভে
জনম হৈল পরে।
জনম কালে আহাছুয়ার
মা নিছিল ঘরে।

(কুশ) মালদা।

সীতাদেবী যখন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন সেই সময়ে সীতার অনুপস্থিতির সময় লবকে দেখতে না পেয়ে কুশ থেকে মন্ত্র বলে 'কুশ' কে সৃষ্টি করেছিলেন বাল্মীকি। এই প্রচলিত কাহিনীকেই দুই ধাঁধাঁকার রূপ দিয়েছেন দু অঞ্চলে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত যেসব ধাঁধাঁগুলোর উল্লেখ করা হলো এখানে সেই সব ধাঁধাঁগুলোর মধ্যে পৌরাণিক ধাঁধাঁগুলো পর্য্যালোচনা করলে রীতিমতো মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হলো পৌরাণিক ধাঁধাঁগুলোর রচয়িতারা সকলেই শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা এবং বাক চাতুর্য্যের প্রকাশ ঘটেছে এই পর্য্যায়ের ধাঁধাঁগুলোর মধ্যে সঙ্গত কারণেই।

বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করেছি ঐ সব ধাঁধাঁগুলো বহু বছর ধরে এবং এই ব্যাপারে সাহায্যও পেয়েছি অনেকের।

কুচবিহার জেলার ধাঁধাঁ সংগ্রহে কুচবিহার জেলার নিগমনগরের সুনীতি বিশ্বাস ও গোবিন্দ রায় যেমন সাহায্য করেছেন তেমনি জলপাইগুড়ি জেলার ধাঁধাঁ সংগ্রহে অধ্যাপক প্রণব সেনগুপ্ত ও যামিনী রায় এবং স্নেহ ভাজন ছাত্র ভবতোষ সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মালদাহ জেলার ধাঁধাঁগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছে কালিয়াচক থানার বীরনগর গ্রামের মিলন চন্দ্র দাস ও তোফী গ্রামের সফিকুল আলম, শোভানগরের অনিন্দিতা মিশ্র এবং গাংনদীয়ার হিয়াএলাহী। দার্জিলিং জেলার ধাঁধাঁগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছে হরদী গজের সঞ্জয় সিংহ এবং অরুণ ও সাওনি। আর বাকী সব ধাঁধাঁগুলোই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজ পুরের কালিয়াগঞ্জ চোপড়া, রায়গঞ্জ, ইটাহার, চাকুলিয়া, কুশমণ্ডী, বংশীহারি, গঙ্গারামপুর, তপনদীঘি, হিলি ও বালুরঘাট প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছি আমার অগণিত ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন গ্রামের বয়স্ক ও বয়স্কাদের কাছ থেকে। তাদের নাম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি। এদের সকলেরই কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা অপ্রিয় সত্য কথাও প্রকাশ না করে পারছিনা। সত্তরের দশকে বিভিন্ন তথ্য ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে যে আন্তরিকতা এবং উৎসাহ দেখেছিলাম গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে নব্বুয়ের দশকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সেই উৎসাহ এবং আন্তরিকতার পরিচয় কিন্তু পাইনি—সময়ই কি দায়ী এজন্য ?

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড)— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(২) সাহিত্য কোষ— ডঃ জিতেন ঘোষ ও ডঃ অরুণ সান্যাল।
(৩) উত্তরবঙ্গের ভাষা পরিস্থিতি— ডঃ নির্মল দাস।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রবাদ প্রবচন

(১) সংজ্ঞা—বৈশিষ্ট্য—ইতিহাস—শ্রেণী বিভাগ :

জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সময়ে মানুষ যে সব বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের সারাৎসারই হলো প্রবাদ বা প্রবচন। বহুজনের অভিজ্ঞতার বিনিময়েই সমাজ জীবনে গুরুত্ব লাভ করে প্রবাদ বা প্রবচন। প্রবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই বলা হয়েছে—
'Proverbs are folk wisdom distilled from the experience of the many.—'
—'Fundamentals of folk literature'.

—W. Bosewell and I. Rusell page-21

ব্যক্তি বিশেষ তার জীবনের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোন তাৎপর্য পূর্ণ বাক্য বলে থাকে বা তার মতামত প্রকাশ করে থাকে যা দশজনে শুনে নিজেদের সমাজের মধ্যে প্রকাশ করে এবং কালক্রমে ঐ বাক্য বা কথাটি প্রবাদ বাক্য বলে গৃহীত হয় সমাজে।

লৌকিক অভিজ্ঞতার অতি সংক্ষিপ্ত সারাৎসার বলেই ছোট প্রবাদ বাক্যই সমাজে জনপ্রিয় হয় বেশী। যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবাদ রচিত হয়ে থাকে সেই সব বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা যতদিন সমাজে বর্তমান থাকে ততদিন ঐ বিষয়ক প্রবাদগুলোও সমাজে প্রচলিত থাকে এবং গুরুত্বও পায়।

ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার ফসল হলেও কালক্রমে প্রবাদ সমষ্টির সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে থাকে।

সহজবোধ্যতা, প্রকাশভঙ্গীর সারল্য এবং অর্থবহ বক্তব্যের জন্যই দেশে দেশে প্রবাদের এত জনপ্রিয়তা।

প্রবাদের সত্যের সঙ্গে দার্শনিক সত্যের কিন্তু পার্থক্য আছে। প্রবাদের সত্য অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য কিন্তু দার্শনিক সত্য হলো পরম সত্য।

দেশে দেশে প্রবাদের মধ্যে কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যেরই প্রকাশ ঘটে থাকে। তবে ভিন্ন পরিবেশে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীরও যখন একই ধরণের অভিজ্ঞতা হয় তখন একই ধরণের কোন বিশেষ প্রবাদের সত্যতা সেই দেশ জাতি বা গোষ্ঠীর কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রবাদ বা প্রবচনের মধ্যে শিক্ষনীয় অনেককিছু থাকলেও কোন উচ্চতর আধ্যাত্মিক কথা বা নীতি কথার প্রচার করা হয় না।

মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ হয়ে আসছে সমাজ জীবনে। প্রাচীন মিশরেই প্রবাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রায় সাড়ে

পাঁচ হাজার বছর আগে 'বুক অব দা ডেড' বা মৃতের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল বহু প্রবাদ। 'পিটা হোটেপ্ তাঁর উপদেশ সমূহের মধ্যে বহু প্রবাদের ব্যবহার করেছিলেন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। হোমার, হেসিউড্, এ্যারিস্টটলও তাঁদের রচনায় বহু প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। রামায়ণ মহাভারত সহ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপে মধ্যযুগের পাঠ্য পুস্তকের অনেকটাই জুড়েছিল 'হাডরিযানের সংগৃহীত প্রবাদ বাক্য সমূহ। ইংল্যাণ্ডে সুদীর্ঘকাল ধরেই প্রবাদ বাক্য সংকলনের রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। চসার এবং সেক্সপীয়রের রচনাতেও বহু প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'অক্সফোর্ড ডিক্সনারী অব্ প্রভার্বস' গ্রন্থে দশ হাজার প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র রাশিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং এস্‌থোনিয়াতেই প্রবাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষের মতো। এর থেকেই অনুমান করা যায় সারা পৃথিবীতে কতো প্রবাদ ছড়িয়ে আছে।

প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির বা কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায় কেন না প্রবাদ ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতার ফসল হলেও তা কালক্রমে সমষ্টির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক কর্মব্যস্ত প্রতিযোগিতার দিনে প্রবাদের ব্যবহার কমে এসেছে একথা ঠিক কিন্তু তাই বলে প্রবাদ সংগ্রহ এবং পাঠের আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং তা বেড়েই চলেছে বলা যায়।

প্রবাদের জগতে স্থান পেয়ে থাকে অসংখ্য বিষয়। প্রবাদের রাজ্যে যেমন প্রাকৃতিক বিষয় স্থান পেয়ে থাকে তেমনি ধর্ম, নারী, পুরুষ, পশুপাখী, সমাজ ও মানব জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়ই নিয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জীবন যুদ্ধের নিত্যকার দ্বন্দ্ব, দরকষাকষি, পরীক্ষা, উপদেশ, ভর্ৎসনা, সামাজিক রীতি নীতি, সমস্যা, আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে কতো কিছুই না প্রবাদের সাম্রাজ্যকে স্ফীত করেছে দেশে দেশে।

বিভিন্ন দেশের প্রবাদ ভাণ্ডার নাড়া চাড়া করলেই লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতি কেন্দ্রিক প্রবাদগুলোর মধ্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গের চাইতে ব্যবহারিক দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

আবার পারিবারিক সম্পর্ক এবং নারী ও গার্হস্থ্য জীবন কেন্দ্রিক প্রবাদ গুলোর মধ্যে মানব চরিত্রের কতো সব বিচিত্র রহস্যই না উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রবাদ সমূহের মাধ্যমে কোন দেশজাতি বা মানবগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি আচার আচরণ ও জীবনবোধের গভীরতা যেমন জানা যায় তেমনি জানা যায় বহু লোক কথা, প্রাচীন সংস্কার ও ঐতিহ্য। পাওয়া যায় দেশ ও জাতির মূল্যবান ইতিহাসের উপাদানও। আবিষ্কার করা যায় ভাষার প্রাচীন রূপটিও।

আর এই সব নানাবিধ কারণেই লোক সাহিত্যের এই মূল্যবান উপাদানটির দেশে দেশে সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রেমীদের কাছে এত গুরুত্ব।

(খ) বাংলা প্রবাদ ও উত্তরবঙ্গ :

বিশ্বের অন্য প্রান্তের মতো আমাদের ভারতবর্ষ তথা এই বঙ্গভূমিতেও যুগ যুগ ধরে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার চলে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ভারতচন্দ্র, মুকুন্দ রাম এবং ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতে প্রবাদের ছড়াছড়ি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক হাজার প্রবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এখনো নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবচন। সেই সব মূল্যবান প্রবাদ-প্রবচন গুলো এখনই সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা দরকার।

বাংলা প্রবাদের গঠন প্রকৃতি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে এদের মধ্যে ছড়ার রূপটি কৌতুকময়তা, রসিকতা এবং শ্লেষাত্মক ঢংয়ের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। ছন্দের মিল এবং অন্ত্যানুপ্রাসও লক্ষ্য করা যায় বহুক্ষেত্রেই।

বাংলা প্রবাদ ও প্রবচনের স্রষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা। প্রবাদের ব্যবহারও করে থাকে মেয়েরাই বেশী। বাংলা প্রবাদের মধ্যে নারী চরিত্রের নানাদিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বধূ, স্বামী, সতীন, শাশুড়ী, পুত্র, কন্যা এবং আত্মীয় স্বজন ও পাড়া পড়শী নিয়ে রচিত হয়েছে কতো প্রবাদ। প্রকৃতি, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রবাদ প্রবচন। বাদ যায়নি সামাজিক আচার-বিচারও ভণ্ডামিও।

মজার কথা হলো আমাদের দেশের প্রবাদ ও প্রবচনগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু ছিলেন ইংরেজ মিশনারী। সেই সময় থেকেই চলে আসছে এই সংগ্রহের ধারা। এখনো পর্য্যন্ত প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে বাংলায়।

প্রচলিত বাংলা প্রবাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বহু বিদেশী প্রবাদও। আবার ভারতের অন্যান্য ভাষায় রচিত প্রবাদও স্থান করে নিয়েছে বাংলা প্রবাদের মধ্যে। আবার একই প্রবাদ অন্যান্য ভাষাতেও প্রচলিত আছে দেখা যায়।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশেও ছড়িয়ে আছে বহু বিচিত্র ধরণের প্রবাদ ও প্রবচন। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে উপভাষায় কথাবার্তা বলে সেই কামরূপী উপভাষাতে প্রচলিত কিছু প্রবাদ ও প্রবচনের এখন উল্লেখ করবো যেসব প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবন, কৃষি, প্রকৃতি এবং আত্মীয়স্বজন, পড়শী থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক আচার, বিচার, ভণ্ডামি, ধূর্ততা এবং মানব ও পশু চরিত্রের কতো বিচিত্র দিকই না উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের রীতিনীতি এমন কি বাংলা ভাষার মধ্য যুগের রূপটিও লক্ষ্য করা যায় কোন কোন প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে। প্রথমে ছড়াধর্মী প্রবাদগুলোই ধরা যাক।

১। ঘরত্ নিভাত ধাপত্ চুলহা।
ঘরে ঘরে বেড়াচে ধুতি ঝুল্‌হা।

অর্থাৎ ঘরে ভাত নেই, বারান্দায় উনুন, ধুতি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ীর কর্তা। অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য লোক যে বাবুগিরি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রবাদটি মানব চরিত্র বিষয়ক।

এই প্রসঙ্গে চর্য্যাপদের সেই বিখ্যাত পদটির কথা মনে পড়ে যায় নাকি ?

"টালত মোর ঘর নাহি পড়ি বেশী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।"

২। আতি চোরা পাতি চোরা। তুলনীয়—
মাইয়ার পাটানি চোরা। আতিচোর পাতি চোর
দিনে দিনে সিঁধেল চোর।

অর্থাৎ প্রথমে ছোট খাটো জিনিষ চুরি করতে করতে মেয়ের বুকের কাপড়ও চুরি করে। অর্থাৎ পাকাচোর হয়ে পড়ে। এটিও মানব চরিত্র বিষয়ক প্রবাদ।

৩। বন্ধুর ঘরত ভাসান গান।
মন হৈল মোর উজান টান।

সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বেহুলার ভেলা বয়েছিল উজানে। বন্ধুর জন্য ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে বান্ধবীর। এটি মানব হৃদয়ের আবেগ কেন্দ্রিক প্রবাদ।

৪। আইলরে কেয়া আন্ধারে মুন্ধারে।
ঘরের বগলত্ জুড়িল কেয়া মশালরে।

অর্থাৎ সারা পথ অন্ধকারে এসে ঘরের কাছে আলো জ্বালালো। এখানে নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। মানব চরিত্র বিষয়ক প্রবাদ এটিও—

৫। আঁখ দোরোৎ বান্দুলং ছাগ খায় ছেওড়ার পাত।
চেনানাই জানা নাই কাও করেন কাক।

অর্থাৎ পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধানো। চোখের ওপরেই ছাগল বাঁধা শেওড়ার পাতা যাচ্ছে। কিন্তু অকারণ চেঁচাচ্ছে। মানব চরিত্র বিষয়ক প্রবাদ এটি।

৬। চৈতার কুয়া ভাদরুর বান।
মানসের মাথা গড়্ গড়্ যান।

(প্রকৃতি বিষয়ক) খনার বচন ধর্মী। এই প্রবাদের অর্থ হলে চৈত্রমাসে কুয়াসা এবং ভাদ্রমাসে বন্যা হলে দেশে মড়ক লাগে।

খনার বচনধর্মী প্রকৃতি বিষয়ক অন্য একটি প্রবাদ হলো।

৭। আষারুর হাওয়া।
বানত্ ছুয়া। (বানের)

অর্থাৎ আষাড়ের বাতাস বানের পূর্বাভাষ।

খনার বচনধর্মী অন্য একটি প্রবাদে বলা হচ্ছে—

৮। ধান পান গাই।
এইল্যা ঘরৎ থাকিলে কার দূয়ার না যাই।

(এইগুলো থাকলে কারো ঘরে যাবার দরকার নেই)

৯। তিরির পাপে নষ্ট পুরুষ। (তিরি-স্ত্রী)
ভাত নি জোটে ঘরে।

(স্ত্রীর পাপে পুরুষ নষ্ট হলে ভাত জোটে না)
মানবব চরিত্র বিষয়ক প্রবাদ এটি।

১০। নি জানে নাওয়া কাম।
তাক্ দিয়া কিবা কাম? (অকর্মা)

এটিও মানব চরিত্র বিষয়ক প্রবাদ।

১১। বাপ্-মার আশুবাদ।
খা-বাচা ঘিও ভাত।

(পিতা মাতার স্নেহ বিষয়ক)
অর্থাৎ বাপ মায়ের আশীর্বাদ থাকলে ঘিভাত জোটে।

১২। একপাতে খাই।
তোর ক্যান্ গাও দুম্ দুম্?

(মানব চরিত্র)
অর্থাৎ (হিংশুটে নারীকে ঠেস্ দিয়ে বলা) স্বামীর পাতে আমি খাচ্ছি তোর স্বামী নেই বলে গা স্বলছে?

১৩। ঝিকিৎ ঝাকৎ, কাম্না করোত্। (মানব চরিত্র)
অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করো না। কিছুটা উপদেশাত্মক প্রবাদ এটি।

১৪। নিকামার মুখে বাত্। (মানব চরিত্র)
আলসিয়ার ঘরত নিভাত। (কুড়ের অন্ন হয় না)

এটিও উপদেশ মূলক প্রবাদ।

১৫। ছেচ্চা কাথায় মনত্ খোয়া। (মানব চরিত্র)
আগ্ করে সে বাউদিয়া।

অর্থাৎ সত্যি কথায় ছন্নছাড়ার রাগ হয়।

১৬। নেউটি পিন্ধে বেড়ান ঘুরি।
খাবার চান পান সুপুরি। (ব্যঙ্গাত্মক)

(নেউটি—নেংটি, পিন্ধে—পরে)
অর্থাৎ অক্ষমের সাধ্যাতীত কিছু পাবার লোভ।
তুলনীয় (কুজোরও চিৎ হয়ে শুতে সাধ যায়।)

১৭। ছিক্ ছিক্ না যাস্—
ডাউসা বা নাঠুয়া পাশ

(ডাউসা—চরিত্রহীন। নাঠুয়া—মামলা বাজ)।
অর্থাৎ চরিত্রহীন বা মামলাবাজ লোকের কাদে যাস্ না।
(খারাপ লোকের কাছে না যাবার পরামর্শ) উপদেশ মূলক প্রবচন এটি।

১৮। মরণু মাও করছু মোহনী।
শ্বশুরে ভাউসানি।
(মোহনী—জাদু। ভাউসানি—ভাসুর বৌ)
(কেউ কারো দ্বারা বশীভূত হলে নিন্দার্থে বলা হয়। এটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদ।
১৯। মাউরিয়ার ছে ঠাকুর।
হাউরিয়ার ছে কুকুর।
(মাউরিয়া—মা হারা। হাউরিয়া—লোভী)
অর্থাৎ লোভীর কপাল পোড়া। প্রবচনটিতে কিছুটা দার্শনিক উপলব্ধির ছোঁয়া আছে।
২০। নদীর যেমুন জোয়ার ভাঁটা। (মানব চরিত্র)
মাইয়্যার যৈবন পানের বোঁটা।
অর্থাৎ জোয়ারের পরে ভাঁটার মতোনই নারীর যৌবনও ক্ষণস্থায়ী পানের বোঁটা শুখিয়ে গেলে পানের মতোই ঝরে যায়।
২১। মাঝির গুণে নাও। (মানব চরিত্র)
মাহুত গুণে হাতি।
(সঠিক চালকের গুণেই সবঠিক মতো চলে।)
২২। সরিষার ফুল মাঠের শোভা
মাইয়্যার শোভা ঢালুয়া খোপা।
(ঢালুয়া—ঢালের মতো)
প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্য বিষয়ক প্রবাদ এটি।
২৩। বিধির নেকা জীবন জোড়া।
যেমুন সহিস তেমুন ঘোড়া।
অর্থাৎ (স্বামী স্ত্রী বা ঘোড়া-সহিস-বিধি নির্দিষ্ট) দার্শনিক উপলব্ধির ছোঁয়া এই প্রবাদেও।
২৪। আমের ফল ঝোপা ঝোপা।
তিতিলির ফল বাঁকা। (মানব চরিত্র)
বুড়া মাইয়্যা ভাতার ধরে (পিন্ধে—পরে)
তাও পিন্ধে শাঁখা।
ব্যঙ্গাত্মক ছড়াধর্মী এই প্রবাদটিতে বেশী বয়সে মেয়ের বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে।
২৫। কুন্টে পাবি খেক্‌রা ভাত ? (খেক্‌রা-বাসি)
যদি নি ধরিস্ খাট নিয়ার হাত ? (মানব চরিত্র)
অর্থাৎ পরিশ্রমী না হলে বাসি ভাতও জোটে না।
২৬। নাম উচা।
কাম কুচা।
(নামে বড় কামে নয়) মানব চরিত্র

২৭। হলদীর না যায় অং। (মানব চরিত্র)
নাংগাহীর না যায় ঢং।
(নাংগাহী—অসচ্চরিত্রা নারী)

২৮। যেতদিন কড়ি। (জীবন দর্শন)
তেতদিন ছড়ি।
(কড়ি থাকলেই ছড়ি ঘুরানো যায়)

২৯। কিবা মোশি কিবা পিসাই
মায়ের বড় কেহ নাই।
(মোশি—মাসী, পিসাই—পিসী)
দার্শনিক সত্যের ছোঁয়া এই প্রবাদেও।

৩০। বারো হাত ব্যঙ্গিট্ তের হাত বীচিট্। (মানব চরিত্র)
অর্থাৎ (বারো হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি)
ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ হয়েছে এখানে।

৩১। কাণত্ কচু নাভিত্ তেল। (চিকিৎসা শাস্ত্রবিষয়ক)
বৈদের কাম হৈ গেল্।
অর্থাৎ কাণে কচু নাভিতে তেল দিলে বৈদ্য লাগে না।

৩২। বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা।
চালির শোভা ঝারি।
নারীর শোভা সোয়ামী ধন। (জীবন দর্শন)
বিছানার শোভা নারী।
সঙ্গীত ধর্মী এই প্রবচনে নারীর গুণপনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৩৩। বেটায় রাখে নাম। (মানব চরিত্র)
বিটিত্ দ্যাখায় গ্রাম।
(গ্রামের গৌরব মেয়ে, বংশের গৌরব ছেলে)

৩৪। খড়নি ঘরের চালত্। (মানব চরিত্র)
পিন্ধে ধুতি ফরৎ ফরৎ।
(অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি)

৩৫। গাঁয়ের নাম চ্যাং তাড়া।
তার ভিতরি বাবু পাড়া।
(তুচ্ছার্থে বলা হয়)

৩৬। বেটা যাক অণে। (অণে-রণে) (সমাজ ধর্ম)
বেটি থাক কোণে।
অর্থাৎ—বেটার খ্যাতি যুদ্ধে।
মেয়ের স্থান ঘরে।

৩৭। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া
পিঠা খায় বান্দরা।

(সমাজ দর্শন)

৩৮। কালারে ও কালা (হৃদয় চাওয়া)
ছাড় নারে তোর কাল অংগের খেলা।

রেহাই চাওয়া)

৩৯। বউ য্যান সগ্গের হুরি।
না মানে শ্বাশুড়ী বুড়ী।

(রূপসী বউ এর দেমাক) (মানব চরিত্র)

৪০। অজাতিয়া পান খায়
পেচ কুটি কুটি।

(যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।) (মানব চরিত্র)

৪১। সরগোচালি বউ।
কামে নি দেয় মন।

(সরগোচালি—[মানব চরিত্র] পাড়া বেড়ানো)

৪২। উপরত হরি হরি।
বগলত ডিংলা চুরি।

(ভণ্ডামি)

৪৩। নিজির ছুয়াক্ দুধভাত।
সতীন ছুয়াক্ নুনভাত।

(পক্ষপাতিত্ব) (সমাজ দর্শন)

৪৪। কোদাল কটি কলাই দাঁতি
ঘর ভাঙানোর হাতি।

(কোদাল কোমরী ও কলাই দাঁতি ঘর ভাঙে)

৪৫। ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি। (প্রকৃতি বিষয়ক)
বাঁশটা কহে উঠি উঠি।

বাঁশ ঝাড়ে ফাগুনে আগুন দিয়ে চৈতে মাটি দিলে বাঁশ ভাল হয়।

৪৬। বাবুর মুখত উঠা বসা
নাইতো কোন কাম।
হায়রে হায় বাবুর হরিনাম।

(মানব চরিত্র, ধামাধরা, মানব চরিত্র)

৪৭। অকম্মা ভাতার সেঙ্গার দসর্।
সেজা করে খসর-খসর।

(সেঙ্গার—শৃঙ্গার, সদর—সঙ্গী, সেজা—শয্যা, খসর খসর—খস্ খস)
(অকর্মা স্বামীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।)

৪৮। আটে দশে কদালত্ খিল।
আটে দশে মাউগক্ কিল্।

আটদশ দিন অন্তর কোদালে খিল লাগানোর মতোই বউকেও কিল লাগাতে হয়। তাহলে বউ বশে থাকে।

৪৯। ফল পাকিলে মিঠা।
নাং পাকিলে তিতা।

(মানব চরিত্র)

৫০। একেলা নারী
জঙ্গলে বাড়ী।

(সমাজ দর্শন, একানারী অসহায়া)

৫১। কথা বাড়ে কাকালে।
হলদি বাড়ে পিসিলে।

(জীবনদর্শন)

৫২। এক বেটার মা ঠাকুরি।
দশ বেটার মা কুকুরি।

(সমাজ দর্শন)

৫৩। এক মাউগে ঘর আলো।
দুই মাউগে জীবন কালো।

(সমাজ দর্শন)

৫৪। কুটুম চিন্হো নিদানে।
ঘোড়া চিন্হো ময়দানে।

(নিদানে—বিপদে, সমাজ দর্শন)

৫৫। কছাৎ কড়ি।
যাম্ গড়্ গড়ি।

(গাঁটে কড়ি থাকলে নিশ্চিন্তে যাওয়া যায়, জীবন দর্শন)

৫৬। জল-জঙ্গল-নারী।
তিন বিশ্বাস না করি।

(জীবন দর্শন)

৫৭। মদ্দমরে বনে।
মাউগ্ মরে কোণে।

(জীবন দর্শন)

৫৮। মাছ খামু রুহি।
ভাতার ধরমু গাঁয়ি।

(সমাজ দর্শন)

৫৯। দানে নি যায় দুখ।
সিনায়ে নি যায় পাপ।

(জীবন দর্শন, সিনা-স্নান)

৬০। পাঁচ কাজে দিবা মন।
সব কাজ ঝন্ ঝন্।

(জীবন দর্শন)

এখানে যে সব প্রবাদের উল্লেখ করা হলো এর অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কামরূপী উপভাষা ব্যবহার কারী বিভিন্ন গ্রাম্য নরনারীদের মুখ থেকে। কিছু প্রবাদ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার এই উপভাষা ব্যবহারকারী রাজবংশী নরনারীদের নিকট থেকেও সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমার ছাত্র ছাত্রীরাই সংগ্রহ করে দিয়েছে এগুলো।

এইসব প্রবাদ ও প্রবচনের অধিকাংশই রচিত হয়েছে বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়েদের দ্বারা। এইসব প্রবাদগুলো সংগ্রহ করেছি সত্তরের দশকে। অল্প কিছু নব্বুয়ের দশকেও মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে সেগুলোর উল্লেখ করেছি। তবে সত্তরের দশকে গ্রাম্য নরনারীদের মধ্যে কথায় কথায় যেমন প্রবাদ ও প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলাম নব্বুয়ের দশকে কিন্তু তেমনটা চোখে পড়েনি। গঞ্জ এবং শহর বৃদ্ধির ফলে শহুরে ও গঞ্জবাসীদের সান্নিধ্যে আসার ফলে গ্রাম্য নরনারীর মুখের ভাষাতেও পরিবর্তন এসেছে। কামরূপী উপভাষাকে আজ ঐ সব অঞ্চলের নরনারীরা অনেকাংশেই মার্জিত ও উন্নতভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে থাকেন।

শিক্ষার প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শহরের মানুষের সঙ্গে মানসিক দূরত্বও কমেছে। শহুরে মানুষের চলতি বাংলা বা শহুরে মানুষের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে ভীষণভাবে আজ এই উপভাষা।

যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে তারা চলতি বাংলা ভাষায় পড়ালেখা করছে এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা প্রভাবিতও হচ্ছে ফলে এই উপভাষার প্রাচীন ব্যবহার ও উচ্চারণ রীতির চেয়ে তারা চলতি বাংলা ভাষার প্রতিই আগ্রহী হয়ে উঠেছে দিন দিন।

কৃষি নির্ভর গ্রামীন জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরীর দিকেও ঝোঁক বেড়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতা বেড়েছে। গ্রামেও খবরের কাগজ ঢুকছে।

এছাড়া বেতার-টিভির ভাষাও প্রভাবিত করছে গ্রামের নরনারীর ভাষাকে। নতুন নতুন শব্দ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ রীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে তারা।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা আজ পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন উচ্চারণ রীতি বা শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আজকের নবীন সমাজ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে ক্রমেই। পুরাতন রীতি যারা অনুসরণ করে চলতে চান তাদের দলে শুধু বয়স্করাই রয়েছে। কিন্তু নবীন সমাজের আগ্রহ এবং প্রবণতাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। যুগের ধারাকে এবং নাগরিক জীবনের প্রবল ধাক্কাকে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা প্রবীনদের নেই।

সত্যি কথা বলতে কি গোটা উত্তরবঙ্গেই এই কামরূপী উপভাষা আজ ধ্বনিগত, রূপতত্ত্বগত, বাক্য রীতি, শব্দ ভাণ্ডার প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক নানাদিক দিয়েই এসে দাঁড়িয়েছে পরিবর্তনের মুখে।

প্রবাদ ও প্রবচনের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্যটা চোখে পড়ে সহজেই। সত্তরের দশকে যেসব প্রবাদ ও প্রবচন সংগ্রহ করেছিলাম রাজবংশী সম্প্রদায়ের নরনারীদের কাছ থেকে নব্বুয়ের দশকে সেই একই সম্প্রদায়ের নরনারীদের কাছ থেকে প্রবাদ ও প্রবচন সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এই উপভাষার ধ্বনি-রূপ-শব্দ এবং বাক্যরীতিতে কি আশ্চর্য্য পরিবর্তনই না এসেছে।

প্রথমাংশে সত্তরের দশকের সংগৃহীত প্রবাদ গুলোর উল্লেখ করেছি। এবার ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংগৃহীত প্রবাদ প্রবচন গুলোর উল্লেখ করবো। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে বিগত কুড়ি পঁচিশ বছরে পরিবর্তনের ছাপ লেগেছে কতখানি এই উপভাষার গায়ে।

প্রথমে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার বীরনগর-পালগাছি অঞ্চলের কিছু প্রবাদের উল্লেখ করছি এখানে। এগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন শোভানগর বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থী শ্রীমান মিলন চন্দ্র দাস। আমি তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে

(১) মিন্ মিনা গরু গু খাবার আঁধি।
(দুর্বলের বড় কাজ করার আশা)

(২) কাণ্ঠার পিছে লাল শাগ
যাক নাদিব তার রাগ।
কাণ্ঠা ঘরের পিছনে (ইচ্ছাপুরণ না হলেই রাগ)

(৩) ছুয়ার হাতে লোহা। (ছুয়া—ছেলে)
শয়তানে মারে গোহা।
(আনাড়ির হাতে অস্ত্র থাকলে বিপদ যখন তখন)

(৪) ন্যাঙ্গড়া খোঁড়া ঝগড়ার গোড়া।

(৫) দল বিগরায় কাণায়।
পুকুর বিগরায় পানায়।

(৬) যেমুন তুমার খ্যাদ পানি।
তেমুন তুমার কাম টানি।

(খ্যাদ-খাদ্য)

(৭) কে কার গাড়া খুঁদে ?
নিজের গাড়া নিজেই খুঁদে।

(গাড়া-গর্ত)

(৮) যেমুন দেবতা তেমুন পূজা।

(৯) আদা খাবি স্বাদ পাবি।

(উচিত শাস্তি)

(১০) যও জানে যাতা জানে
যে পিষে সে জানে।

(যও—যব) যার যন্ত্রণা সেই বোঝে।

মালদহ জেলার তুলসী হাট্টাওবাংরুয়া অঞ্চলের কিছু প্রবাদের উল্লেখ করবো এবার। এগুলো সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ঐ জেলার গাং নদীয়া গ্রামের হিয়াএলাহী এবং তার বন্ধুরা। এগুলো ক্ষেত্র অনুসন্ধানের কালে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংগৃহীত হয়েছে।

১১। মুখের লাগা হা-জি—হাজি!
পিছু বগল দাগা বাজী।

(পিছনে গাল মন্দ)

১২। যার টিন্ নিভুজা
তার বড় ফোকা।

(ভুজা—মুড়ি, ফোকা—ক্ষিদে)

১৩। মৌলভি মৌলনা
ঘরে ঢোকা ষৌলনা।

(মৌলভির ষোল আনা ঘরে ঢোকার বাসনা)

১৪। উচরুক্কার মরণ চারা কত।
রসিয়ার মরণ জারত।

(চঞ্চলের মরণ আগুনে
রসিকের মরণ ঠাণ্ডায়)

১৫। সুখী থাক্তি ভূতি কিলায়।

১৬। আটকোন বিবির 'খটকোনত পা।
চল্‌গে বিবি কুন্ কুন্ গা ?

('লাজুর বৌ চটি পরে গা বেড়াতে চায়)

১৭। ভূষারত্ ঘি।
ঠক্ ঠকিয়ে কি ?

(ভূষায় ঘি ঢেলে লাভ কি ?)

১৮। বক্‌রে বক্।
দেখি শুনি ঠক্।

১৯। ভাগে ছুরি ভাতার পায়।
গহনার লগে খুন্-খুনাই।

(বায়না করে)

২০। বাসি ভাতত আনুলা পাইদা।

(পেয়াদা)

২১। ছিনারির গল্-গলা।
চুরুনিয়ার চল্লা গলা।

(বাজে মেয়ের গলা বেশী। চোরের গলা চড়া)

২২। যেমুন করব লাস
সাজতি বারো মাস।

(এমনভাবে পরো যাতে বার মাস যায়)

২৩। সিনুরিয়া আম
ঢেট্ কাউয়াস খাম্।

(সিন্দুরে আমকে দাঁড় কাকে খায়)

মালদহ জেলার শোভানগর অঞ্চলের তিনটি কাব্যধর্মী প্রবাদের উল্লেখ করবো এবার। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সংগৃহীত এতিনটি—

২৪। বোকাক্ বুঝ দিল্ বুঝ নাহি মানে।
ঢেকিক লাথ দাও ধান তত ভানে।

(যে বোঝে না তাকে লাথি মেরেই বোঝাতে হয়)

২৫। সুখের কাইলে আইলে বন্ধু দুঃখের কাইলে গেইলা।
যাবার সুমায় পাছা উল্টায় দোষ দিইয়া গেইলা।

(দুঃসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু)

২৬। অ্যালের বক্‌রি অ্যালে চরে।
ঘুরে ঘুরে পেট্টা ভরে।

(ছাড়া ছাগল/গরু)

মালদার কালিয়াচক থানার হামিদপুর, তোফি ও আশে পাশের এলাকা থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু প্রবাদের উল্লেখ করবো এবার। এগুলো সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তোফি গ্রামের সফিকুল আলম ও ঐ গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। এদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

২৭। মাগুনে বেটি লাটাই গুণে ফেটি।

(মায়ের গুণেই বেটি লাটায়ের ফেটি)

২৮। হাসাতো কামনাশা, গোলা পাড়ে নিন্দ (নিদ্রা)
কালা বলটা ছাইর‍্যা দিয়া ধলো বলটা কিন।

(বল—বলদ)

২৯। যদি ঐ পারত থাকে ম্যায়না
তো এই পারত কর বায়না।

(শিঙখাড়া গরু)

৩০। ধোঁয়া উঠছে মোর দিক।
কি দেখব তোর দিক্?

(নিজের কাজ সামলিয়ে অন্যকে তবেই সাহায্য করা)

৩১। মুখের আগত বড়শী
তাও জারে মরছি।

(বড়শী আগুনের পাত্র, জারে—ঠাণ্ডায়)

(অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু কেউ দেখে না)

৩২। যে জানে বিদেশের ঘাও।
সে মারে আগে ভাও।

(বিদেশে যেকোন কাজ আগে করা ভাল)

৩৩। এমুন দেইখ্যা বাঁধেন ঘর
আধা আপন আধা পর।

(আত্মীয় স্বজনের কাছেই ঘর বাঁধা ভাল)

৩৪। হাগড়ির হাতত যাই তাই।
উক্‌টির হাতত্ নাই খাই।

(যে পায়খানা করে বারবার তার হাতে বরং খাওয়া ভাল কিন্তু উকটি অন্যকে বলে বেড়ায় বলে তার হাতে খেতে নেই।)

৩৫। আনধারে চুলকানু গুহা (পাছা)।
তোর গুহা কি মোর গুহা।

(আপন পর না ভেবে অনেক জিনিষের মধ্যে অবিবেচকের মতো একটা নিয়ে নেওয়া।)

৩৬। গোবর গাইড্যা বল
মিন মিনা মানুষ হুল্।

(বলদ)

৩৭। চোখ টিপ-টিপ্ নেংটি ঢিল
তাকে চিনা মুসকিল।

(ঢিলা কাপড়)

৩৮। ট্যাকা গ্যাঁটে মাগী খাটে।

(পয়সা থাকলেই মানে সকলে)

৩৯। জমি কিনো কান্দর।
বউ কিনো বান্দর।

(কান্দর—ভালজমি। বান্দর—বেঁটে। বেটে বউ খুব কাজের হয়)

৪০। আপনা ধন পরে দিয়ে যে গোনে।
সে ময়লা খায় আপন মনে।

৪১। আপনা নুন ধার দিয়া
ঝিঙা রাঁধে খার দিয়া।

৪২। কাগজ ছে আসলে নেই।

(দলিলে আছে দখলে নেই)

৪৩। হাগি মুতি ছুয়ার বাপ।
মোর ছুয়ার কি কথায় পাপ ?

(নিজের টাই সব থেকে ভাল)

৪৪। ন্যাংটার গ্যাঁড়ে পইল কাপড়।
গ্যাড় করে থাপর-ফাঁপর।

(গরীবের হঠাৎ ধন হলে সে উল্টোপাল্টা কাজ করে)

৪৫। কুঁড়েল কে মোড়লি দিলি
পা চেঁড়ে হাঁটে।

(কুঁড়ে মোড়ল হয়ে গেলে অহংকারী হয়ে ওঠে)

৪৬। ভিটা কপালী—ওখল গাঁড়ি
খড়ম পাইয়া নারী।
ঐ বহু না নিস্ ঘরে
বিপদ বাড়ে ভারী।

৪৭। চিক্‌না মুখ সবাই চাটে।

(তেলা মাথায় তেল দেওয়া)

৪৮। পয়সা হলি হাতে।
চ্যারাগ জ্বালি পাতে।

(পয়সা হলে অপব্যয় করে যে)

৪৯। আপনা বেলা আটে কাটে।
পরের বেলা চিম্‌টা কাটে।

৫০। যেমনি হেকড়া তেমনি হেকড়ি।
যেমনি শাগ, তেমনি লেকড়ি।
(মন্দর নিকট মন্দ, ভালোর কাছে ভাল)
৫১। আগে হাঁটা পাঁঠা কাটা।
(সামনেই ঝুঁকি)
৫২। হ্যায় কাপড়া নাই জার।
নেই কাপড়া হ্যায় জার।
(জার—শীত বা ঠাণ্ডা, হিন্দী প্রভাব পড়েছে)
৫৩। হোল কালো শিং মোটা।
সে গরুটা কিনিস্ বেটা।
৫৪। বিল মুখী সাপ আর বাড়ী মুখী বাঙালী
৫৫। বিহাওয়ালার বিহালয়।
গাঁও ওয়ালার ঘুম নাই।
৫৬। কামে কড়ি ভোজনে ডেড়ি।
৫৭। কানা-খোঁড়া বদের গোড়া।
৫৮। গাঁও বিগড়ায় কানা।
পোখর বিগড়ায় পানা।
৫৯। ভারী মহাজন পিছন জমি।
থাকবি যদি খুশী খাসানে
বাখবি হাসি তোর মাগীনে। (বউ)
৬০। খাবি তো খা।
যাবি তো যা।
৬১। যেমন যেমন কাজ।
বিহান বেলায় সাজ।
৬২। বুদ্ধি নিবি তার।
তিন মাথা যার।
৬৩। যতো হইস্ বিদ্যান।
তেবু পুছিস্ পুরাণ।
৬৪। হ্যাকড়া কো হেকড়ি মিলে
রাজাকো রাণী।
ন্যাঙড়া কো লুল্লাই মিলে (হিন্দী প্রভাব)
কানাকো কানি।
৬৫। ঢিল্ তাগাদা পুঁজি নাশ।
(তাগাদা না করলে পাওনা টাকা মেলে না)

৬৬। গু দিয়াও হাঁটা ভাল।
কোট-কাছারী নয়।

৬৭। দহি দুধে বাড়ে বল্।
ভাই ভাতিজা মনের কল্।

৬৮। একলা ঘরে খাইবার সুখ।
মারবার আছে ধরবার দুখ।

৬৯। গাঁয়ের বেটি পোঁটা পড়ি।
ভিন্‌গাঁর বেটি মরি মরি।

৭০। গোদার পাও খাদে।
(বিপদগ্রস্তের আরো বিপদ)

৭১। কাম নেই তো কামনি কোটায়।
(জরুরী কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করা)

৭২। কিনাত চাস তো বাছাড়া কিন্।
(বাচ্চা ঘোড়া)

৭৩। বল লিবি বাইয়্যা।
গাই লিবি দুইয়্যা।
(বল—বলদ)

৭৪। হাগতে হাগে না।
ঘাটতে ছাড়ে না।
(নিজে করবে না অন্যকেও করতে দেবে না।)

৭৫। নরম মাটিত্ বিলাই হাগে।
(বিলাই—বিড়াল)

৭৬। অকামে বকরি দড়ো।
(হিন্দি প্রভাব)

৭৭। হাতের আলসেতে মোচের খারাবি।
(হিন্দী প্রভাব)

৭৮। বুদ্ধি থাকলি ভাসুরের ঘরেও কইর্যা খ

৭৯। মাথালে মারা নয় মাথায় মারা।
(মাথাল—টোকা)

৮০। সব মাছেই গু খায়।
ঘেড়ুয়া মাছের নাম হয়।

৮১। ঠেলা বলে মেলা চাষ।
গোইড়া বলে সব্বনাশ।

(বল—বলদ)

৮২। থাকতি বল না বয় হাল।
তার দুখ চিরকাল।

(বল—বলদ)

৮৩। সহাগের মুরগী ঢাকুনে আণ্ডা।

(হিন্দী প্রভাব)

৮৪। নাদিবি না দিবি রাণী।
শাওনে কাঁঠাল বাণী।

(না দেবার ছল)

৮৫। দুধালি গাই এর লাথও ভাল।

৮৬। সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।

৮৭। ঘরে নাই খাইতে।
গীত গায় রাইতে।

৮৮। নিজের বড়াই বালুর পেচ্ছাব।

(অল্প করেই শুখিয়ে যায়)

৮৯। ভাবাভাবি প্রতিজ্ঞা যেমুন।

৯২। যার দই তার চিড়া।
আর লিবা ? আর লিবা ?

৯১। আনজনে আনে ধন।
মাতব্বর তিনজন।

(পরের ধনে পোদ্দারী)

৯২। যার শিল যার নোড়া।
ভাঙি তার দাঁত গোড়া।

৯৩। দিলি খুদা দেয় ঢেলি।
চাল ফেঁড়ে মোহরালি।

৯৪। লোড়া দিয়ে পাঁজি খোলা।

(সঠিক বস্তু কাজে না লাগানো)

৯৫। যেমুন তেমুন জামাই।
আন্দার সা বানাই।

(আন্দারসা—তেলেভাজা)

৯৬। একের পাপে শও পোড়ে।

৯৭। ভাল মানসের জানা।
ভাল কাপড়ার ত্যানা।

(ছেঁড়া টকুরো)

৯৮। বাপের কালে নাই ছিল গাই।
চালুনি লিয়া দুহিতে যায়।

৯৯। কহিলে মা মাইর খায়।
না কহিলে বাপ কুত্তা খায়।

(উভয়সঙ্কট)

১০০। থুক্ দিয়া ছাতু ছানা।

(দায়সারা কাজ)

১০১। হা করলি হায়।
হলক্ বুঝা যায়।

(মুখ খুললেই বোঝা যায়)

১০২। ঘোড়ার লাথ ঘোড়ায় সহে।

১০৩। যতকার মেঘলয়
ততকার চড়চড়ানি।

১০৪। বাদিয়া হয়না দোষ।
ওঝারি নি হয় রোষ।

১০৫। মরণ কালে সর্বত।

১০৬। কান্দাবার মনে কুটা পড়ে চোকে।

১০৭। যার দুখ সেই বুঝে
আনজনা কথা খোঁজে।

১০৮। কলসী চিনিস ভাসিয়ে।
মাগী চিনিস্ হাসিয়ে।

মালদহ জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। রাজবংশী এবং পোলিয়া ও কোচ সম্প্রদায়ের লোকজন মূলত বরিন্দ অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও অল্প বিস্তর ছড়িয়ে আছে জেলার নানাপ্রান্তেই। এই রাজবংশী-পোলিয়া এবং কোচরাই যে শুধু কামতাপুরী উপভাষায় কথা বলে তা কিন্তু নয়। মুসলিম এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও এভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার পশ্চিম প্রান্তের বিহারের সঙ্গে এ জেলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার ফলে এ জেলার জনগোষ্ঠীর ভাষাতেও হিন্দী ভাষার প্রভাব পড়েছে দেখা যায়। পাশাপাশি থাকার ফলে ভাষার সংমিশ্রন ঘটতে বাধ্য। মালদহ জেলায় সংগৃহীত উপরের প্রবাদ গুলোর মধ্যে এই কারণেই হিন্দী উর্দু এবং ইসলামিক ছাপ পড়েছে দেখা যায়।

ঐ সব প্রবাদগুলো একান্তভাবে গ্রাম্য জন গোষ্ঠীর লোকজনের মুখে মুখেই সৃষ্টি হয়েছে এবং মুখে মুখেই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। তাই বহু ক্ষেত্রেই এই সব প্রবাদে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দের ব্যবহার যেমন লক্ষ্যনীয় তেমনিই গ্রাম্য এবং অশ্লীল শব্দও আছে আজো অবিকৃত হয়েই।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী :

(১) Standard Dictionary of Folk Literature— Mari a Leach 1949.

(২) Fundimentals of Folk Literature— W. Bosewell and I. Russel.

(৩) বাংলার লোক সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

(৪) লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ— ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার।

(৫) ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ— কমল বসাক।

(৬) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা— সুভাষ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৭) Raj Bansis of North Bengal— Charu chandra Sanyal.

(৮) লোক সাহিত্য— ডঃ আশরাফি সিদ্দিকি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লোকসঙ্গীত

(ক) সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

সারা পৃথিবী জুড়েই লোক সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে সঙ্গীতের চর্চা হয়ে আসছে নানাভাবে। সঙ্গীত হলো মানুষের প্রাণের সম্পদ। আদিমকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করেছে। গেয়েছে। নিজে আনন্দ পেয়েছে। অন্যকেও আনন্দ দিয়েছে।

দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রচিত হয়েছে প্রার্থনা সঙ্গীত, দেবস্তুতিমূলক সঙ্গীত ও বন্দনা গান। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে অনুষ্ঠান সঙ্গীত। কর্ম উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে কর্মসঙ্গীত। প্রেম ও বিরহ উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে প্রেম সঙ্গীত।

গোষ্ঠী বদ্ধ মানুষের জীবনে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সেসব সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে যেসব সঙ্গীত কালক্রমে সকলেরই প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠেছে। আদিতে হয়তো ঐসব সঙ্গীত কোন ব্যক্তি বিশেষই রচনা করে থাকে কিন্তু কালক্রমে ঐসব সঙ্গীত সকলেরই যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত সঙ্গীত পরিণত হয় লোক সঙ্গীতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল লোক সঙ্গীতে আবার নানা ধরণের পরিবর্তনও এসে থাকে। কথা এবং সুরেও আসে নানা বৈচিত্র্য।

সাধারণত লোক সঙ্গীত বা লোকগীতি বলতে আমরা বুঝি যে সঙ্গীত একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে রচিত এবং লোক সমাজের দ্বারা গীত ও প্রচারিত হয়ে থাকে এবং যে সঙ্গীত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা রচিত হলেও কালক্রমে লোক সমাজের সম্পত্তি বলে গণ্য হয়ে থাকে তাইই লোক সঙ্গীত বা লোকগীতি। সার্থক লোকসঙ্গীতকে কবিতা হিসাবেও সার্থক হতে হবে।

লোকসঙ্গীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। যথা— প্রথমত, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে লোক সঙ্গীতের মধ্যে কার সার্বজনীন রূপটি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, লোক সঙ্গীতের স্রষ্টা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই গ্রামের সাধারণ মানুষ।

তৃতীয়ত, লোকমুখেই এই সঙ্গীত সৃষ্ট হয়ে মুখে মুখেই তা প্রচারিত হয়ে থাকে সর্বত্র।

চতুর্থত, লোকসঙ্গীতের উৎস হলো লোকের সাধারণ সঙ্গীত প্রীতি।

পঞ্চমত, লোকসঙ্গীত কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয় তা সাধারণের সম্পত্তি।

ষষ্ঠত, দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে থাকে ফলে ঐ সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্ট বিভিন্ন লোক সঙ্গীতেও বৈচিত্র্য এসে থাকে।

সপ্তমত, সাধারনত কোন একটি বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করেই লোক সঙ্গীত রচিত হয়ে থাকে।

অষ্টমত, লোক সঙ্গীত সাধারণত কাহিনী নির্ভর নয়।

নবমত, আকার বা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েও ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নেই।

দশমত, যেহেতু মুখে মুখেই এই সঙ্গীতের প্রচার সেই হেতু কালক্রমে সুর বা কথায় নানা পরিবর্তন এসে থাকে।

একাদশত, লোকসঙ্গীত দরবারী সঙ্গীত নয়। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে রাগ-রাগিণীর বিস্তার করে এই সঙ্গীত গাওয়ার দরকার হয় না। কেতাবী ঢঙের চাইতে আন্তরিক ভাবটাই গুরুত্ব পায় এই সঙ্গীতে।

দ্বাদশত, একক, দ্বৈত এবং সমবেত কণ্ঠেও লোক সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্য সহযোগেও গীত হয়ে থাকে।

ত্রয়োদশত, লোক সঙ্গীত লোক শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবেও দেশে দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চতুর্দশত, এই সঙ্গীতের ভাষা এবং সুর একান্তই সহজ সরল এবং সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে থাকে।

পঞ্চদশত, লোকসঙ্গীত দেশে দেশে আজো গ্রামীন মানুষের অবসর বিনোদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ষোড়শত, গ্রামের সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-মিলন-বিরহ এবং আবেগ উচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে থাকে এই সঙ্গীতে।

সপ্তদশত, জনজীবনের সঙ্গে লোক সঙ্গীতের সুগভীর আত্মিক যোগাযোগের ফলেই দেশে দেশে লোকসঙ্গীতের এত জনপ্রিয়তা। সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার রসে সিক্ত হয়ে জনমনে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে বলেই লোকসঙ্গীত জন গণের প্রাণের সঙ্গীত হয়ে উঠেছে দেশে দেশে।

বাংলা লোক সাহিত্যে'র সমৃদ্ধতম বিভাগ হলো এই লোকসঙ্গীত। ধাঁধাঁ, ছড়া, প্রবাদ বা লোক কাহিনীর জনপ্রিয়তা থাকলেও লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ যে সুর সেই সুরের মাধুর্য্যই লোক সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় থেকে তাকে এগিয়ে দিয়েছে জনপ্রিয়তায় সেই সঙ্গে বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে দেশে দেশে। গর্ভাবাস থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিভিন্ন পর্য্যায় অবলম্বনেই রচিত হয়েছে দেশে দেশে অসংখ্য লোকসঙ্গীত।

বাংলা লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্যই বহু গীতিকার এগিয়ে এসেছেন লোক সঙ্গীত রচনায়। সফলও হয়েছেন অনেকে। আবার সুরের ওপরে জোর দিতে গিয়ে অনেক গীতিকার লোক সঙ্গীতের কাব্য ধর্মিতাকে নষ্টও করে ফেলেছেন বহুক্ষেত্রে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালাতে গিয়েও প্রকৃত লোকসঙ্গীতের ক্ষতিও করেছেন অনেকে।

প্রকৃতি বিচারে বাংলা লোকসঙ্গীতকে উত্তর, উত্তর পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিম এই পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হলেও বিষয় বৈচিত্র্য ও গুণগত দিকে দিয়ে সমগ্র বাংলা লোক সঙ্গীতকে আমরা আঞ্চলিক, ব্যবহারিক পার্বণ, কর্ম ও শ্রম, প্রেম, ধর্ম, আনুষ্ঠানিক, দেহতত্ব, বারমাসী, হাসি ও অন্যান্য সঙ্গীতে বিভক্ত করে বিচার করতে পারি।

(খ) উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত :

বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীতের পরিধি যেমন ব্যাপক তেমনিই বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, মৈষাল, রংপাঁচালী, বাউলের পাশাপাশি ধর্মীয় সঙ্গীত, আবায়ন গান, মনসার গান, সত্যপীরের গান, খন গান, চট্‌কা, পার্বণ সঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক গান, কর্মসঙ্গীত, জাগের গান, বারমাস্যা, প্রেমসঙ্গীত, কীর্তন, দেহতত্ত্ব প্রভৃতিতে উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ।

সত্যি কথা বলতে কি উত্তরবঙ্গে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে কোন না কোন প্রকারের সঙ্গীত চর্চা হয় না। আসলে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশই মানুষকে করে তুলেছে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী। হিমালয়ের পার্বত্যভূমি ডুয়ার্স, তরাই, জলঢাকা, তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা বিধৌত সমভূমি, সবুজ শস্যের ক্ষেত, চা বাগান, ফল ও ফুলের বাগিচা উত্তরবঙ্গের সহজ সরল সাধারণ নরনারীকে করে তুলেছে আবেগ প্রবণ ও সঙ্গীত অনুরাগী। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্যময় অসংখ্য সঙ্গীত যা যুগ যুগ ধরে উত্তরবঙ্গ বাসীকে কাঁদিয়েছে, হাসিয়েছে—দিয়েছে অফুরন্ত আবেগ ও আনন্দের যোগান। একান্ত সহজ সরল ভাষায় দরদী সুরে ব্যক্ত হয়েছে সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন ও বিরহের কথা। কোন কৃত্রিমতা নেই, জটিলতা নেই, সুরের কাঠিন্য নেই—আছে সহজ সারল্য এবং প্রাণের আবেগ। আছে অকৃত্রিম হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাবের মধ্যেও আজো উত্তরবঙ্গের নিভৃত গ্রামের আটচালায় বসে ছড়া বা ধাঁধাঁর আসর, রংপাঁচালী, আবায়ন বা মনসার ভাসান। নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত হয় গম্ভীরার গানে, আলকাপে ও খন গানে। মৈষাল বা ভাও আইয়ার সুরে বেদনার্ত হয় তাদের কোমল হৃদয়। বিয়ের গানে বা পার্বণ সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে আসর। কীর্তনে-বাউলে বা ধর্মীয় সঙ্গীতে তৃপ্ত হয় তাদের তৃষিত হৃদয়।

বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বাঁশী ও দোতরার সুর। ছড়িয়ে যায় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধুর ঝংকার। কর্মক্লান্ত মানুষেরা সঙ্গীতের আসরে খুঁজে পায় আনন্দের সন্ধান। ভুলে যায় জীবন সংগ্রামের তিক্ততার কথা। গানের সুরে, যাত্রার সংলাপে, হাস্যে-কৌতুকে, মিলন ও বিরহের দোলায় দুলতে দুলতে খুঁজে পায় অনাবিল সুখ আর শান্তির সন্ধান। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের জীবনের পানপাত্র আনন্দ সুধায়।

উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীতকে বিষয়গত দিক দিয়ে এবং প্রকৃতি বিচারে আমরা মোট বারোটি বিভাগে ভাগ করে বিচার করতে পারি।

(১) আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত : যথা গম্ভীরা, মৈষাল, চট্‌কা, আলকাপ, জাগের গান ও ভাওয়াইয়া প্রভৃতি এগুলি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গেই প্রচলিত। সুর-ভাষা স্বতন্ত্র।

(২) পারিবারিক বা ব্যবহারিক লোক সঙ্গীত : যথা বিয়ের গান, গর্ভধারণ বা অন্নপ্রাশনের গান, প্রভৃতি। এগুলো মেয়েরাই সাধারণত গেয়ে থাকে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ।

(৩) আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত : সাধারণত প্রতি বছর কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন পূজা পার্বণ বা ব্রতাদি উপলক্ষ্যে যেসব সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে সেগুলোই হলো আনুষ্ঠানিক

লোকসঙ্গীত যথা নবান, ফাগুয়া, ভাসান, হুদুমদেওর গান, বৃষ্টি কামনার গান, কার্তিক ব্রতের গান, শিবের গাজন, পীরের গান, করম, জিতুয়া, ষাইটাল গীত, তিস্তাবুড়ীর গান, যাইটার, ব্যাঙের বিয়ের গান প্রভৃতি।

(৪) পূজাশ্রয়ী লোকসঙ্গীত : বিভিন্ন লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে যেসব সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে সেগুলিই পূজাশ্রয়ী লোক সঙ্গীত যথা মনসা পূজায় ভাসান, রাসযাত্রায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান, রামনবমী উপলক্ষ্যে আবায়ণ বা কুশান গান প্রভৃতি।

(৫) হাল্‌কা রসের গান বা চটুল সঙ্গীত : রংপাঁচালী, চট্‌কা, বন্ধু, খেনের গান প্রভৃতি। এসব গানের সুর চটুল এবং কখনো কখনো পীড়া দায়কও বটে।

(৬) প্রেমসঙ্গীত : নারী পুরুষের প্রেম বিরহ মিলনই প্রেম সঙ্গীত। যথা ভাওয়াইয়া, মৈষাল, বন্ধুর পাঁচালী প্রভৃতি গান।

(৭) ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত : যথা আলকাপ, গম্ভীরা, চট্‌কা, রংপাঁচালী প্রভৃতি।

(৮) বিলাপগীতি : যেসব সঙ্গীতে স্ত্রী-পুরুষের বিলাপ ধ্বনিত হয় যথা 'বারমাস্যা' প্রভৃতি।

(৯) রাখালী গান : মৈষাল সঙ্গীত, বাঘ রায়ের গান প্রভৃতি।

(১০) কর্ম ও শ্রম সঙ্গীত : কাজের ফাঁকে বা কাজে উদ্যম আনার জন্য যে সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে। যথা— ধানবোনা ও ধানভানা, ছাদ পেটানো, কলপোঁতা ও ঘর গড়ার সময়, পাল্কী বহনের সময় বা গরুর গাড়ী চালানের সময় যেসব গান গাওয়া হয় সেগুলিই এই পর্য্যায়ের গান।

(১১) ধর্মীয় সঙ্গীত : যথা কীর্তন, ভজন বা দেবমাহাত্ম্যসূচক গান।

(১২) দেহতত্ত্ব মূলক সঙ্গীত : বাউল, ফকিরি গান বা দরবেশী সঙ্গীত।

(১) আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত :

(ক) গম্ভীরা গান : মালদহ জেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীত হলো এই গম্ভীরা গান। সাধারণত গম্ভীরার পূজা উপলক্ষ্যে বছরের শেষ তিনদিন এই গানের আসর বসে থাকে। গম্ভীরার পূজা আসলে শিবেরই পূজা উৎসব। শিবের গাজন মালদহ এবং উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরের কোন কোন অংশে 'আদ্যের গম্ভীরা' নামেও পরিচিত। উন্মুক্ত আকাশের নীচে চাঁদোয়া খাটিয়ে গম্ভীরা গানের আসর বসে থাকে। একপাশে থাকে একটা শিবমূর্তি বা শিবের আসন বা ঘট।

যদিও গম্ভীরা গানের আসরে শিবের মূর্তি বা ঘট রাখা হয় বা শিবকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নও ছোঁড়া হয় এবং গম্ভীরার পূজা উপলক্ষ্যেই এই গান গীত হয়ে থাকে তবুও এই গান কিন্তু শিব বিষয়ক গান নয়। নির্ভেজাল আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতমাত্র এই সঙ্গীত। এইগান খণ্ড পালাগান বিশেষ। বিদ্রূপ মিশ্রিত নৃত্য ও গীত সহযোগে এই গান গীত হয়ে থাকে।

সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা সমাধানের মধ্য দিয়ে অনেক সময় গম্ভীরা গান শেষ হয়ে থাকে। আসরেও প্রয়োজন মতো সংলাপ তৈরী হয় বহুক্ষেত্রে। রঙ্গ রস এবং

হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীরা শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ে থাকে এই গানে। মূল গায়েন বা পালাকারের নামেই দলের নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন মালদার মটরা এবং নীরুর নামে ছিল বিখ্যাত মট্‌রা ও নীরুর গম্ভীরা।

গম্ভীরার গানের মধ্যে যে বর্ষ বিবরণী পর্য্যালোচনা করা হয় তার সঙ্গে অবর ও মিশমি জাতির বর্ষ বিবরণী পর্য্যালোচনার সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি লোকশিক্ষা দেওয়াও গম্ভীরা গানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক নানা ঘটনার সঙ্গে দেশ ও জাতির নানা সুখ দুঃখ-ব্যথা বেদনার কাহিনীও প্রকাশিত হয়ে থাকে এই গানের মধ্যে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংঘর্ষ ও দেশ প্রেমের বহু সমসাময়িক উত্তেজক ঘটনাই প্রকাশ পায় এই গানে।

গম্ভীরা গানের ভাষা সহজ সরল গ্রাম্য জনগণের মুখের ভাষা। হাসি-ঠাট্টা-ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে গম্ভীরার আবেদন তাই অতি সহজেই জনগণের হৃদয়ে আলোড়ন তোলে।

গম্ভীরা গানে বাদকরা ডুগি, তবলা, বাঁশী, হারমোনিয়াম নিয়ে বসে একপাশে। কিছু দূরেই থাকে গ্রীণ রূম। এই গানে মুখপাদ, বন্দনা, দ্বৈত গান, চারইয়ারী, পালাবন্দী গান এবং খবর বা রিপোর্ট থাকে।

(১) মুখপাদে : বিভিন্ন চরিত্রগুলো একে একে আসরে হাজির হয়ে নিজেদের পরিচয় দান করে ও গানও গায়। এতে ধূয়া এবং চিতানিও থাকে।

(২) বন্দনাতে : শিবকে সাজিয়ে এনে তাঁর বন্দনা করা হয়।

(৩) দ্বৈতগানে : দুজনে আসরে হাজির হয়ে গান গায়। নৃত্যও করে কখনো কখনো। তবে এদের গান একটু হাল্কা রসেরই হয়ে থাকে সাধারণত।

(৫) চারইয়ারীতে : চার পাঁচজন আসরে এসে বিভিন্ন কথা বলে আবার গানও গায়।

(৬) পালাবন্দী গানে : বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক পালা গান থাকে। সংলাপ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় ঐ পালা গান। পালাগানই গম্ভীরার মূল আকর্ষণ। সঙ্গীতের চেয়ে কাহিনী এবং সংলাপই প্রাধান্য পেয়ে থাকে আজকাল এর ফলে নাটকীয়তা এসেছে গম্ভীরা গানে।

(৭) সংবাদ বা বিবরণীতে বিগত বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাই সাধারণত পেশ করা হয় আসরে।

গম্ভীরা গানে বাউল, রামপ্রসাদী ও কীর্তনের প্রভাব থাকলেও আলকাপের প্রভাবই বেশী, দেশপ্রেম এবং সমাজ ধর্মী ও শ্লেষাত্মক বিষয়গুলোই প্রাধান্য পায় কাহিনীতে।

বর্তমান লেখকের কয়েকটি গম্ভীরা গানের আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়ে ছিল সত্তরের দশকে। একটি পালাগানের কথা আজো মনে আছে। তরঙ্গপুর বাজারে (কালিয়াগঞ্জ থানা উঃ দিনাজপুর) 'মটকার' যে গম্ভীরার পালা গানটি হয়েছিল তার বিষয় বস্তু ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকসেনাদের বর্বরতা। টিক্কাখানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মট্‌কা স্বয়ং একটা গান ছিল এই রকম—

ও ভোলানাথ, মরি হায়, হায়।
খান্ সেনারা ছুঁড়ছেগুলি মরছে বাঙাল ভাই।

ঘরবাড়ী সব ছাইড়া দিয়া পলাই মানুষ হায়।
ও, শিব লাজে মরে যাই।
ভূট্টো মিঞার রকম বোঝা দায়।
মুজিব ভাষার খবর কুথা পায় ?
ও, শিব, শিবহে, লাজে মরে যাই।
মান-ইজ্জত লুট্‌তেছে সব খান্‌পশুদের দল।
এই পারেতে লক্ষ মানুষ ইয়হিয়ার ছল্।
ও শিব, শিবহে, আর কতকাল ঘুমাও তুমিহে।
ও শিব, শিবহে! এবার জাগো হে।
হাতে নাও ত্রিশূল তোমার
বুক ভাঙি দাও টিক্কা-ইয়ার।
ও ভোলা শিব, জাগোহে এবার।
দেখাও তোমার দয়াল ব্যবহার।
ও, শিব, শিবহে..........।

তৎকালীন বিধ্বস্ত বাংলাদেশের করুণ ছবি ফুটে উঠেছিল এই পালা গানটির মধ্যে দিয়ে। যে বীভৎস ছবি আজ কল্পনা করাও কঠিন।

জনমত গঠনে গম্ভীরা গান যে কতো খানি শক্তিশালী মাধ্যম তা উপলব্ধি করেছিলাম সেই আসরে জনগণের বিপুল আবেগ আর করতালিতে।

সমসাময়িক দেশের হাল চাল নিয়েও মটুকা বাবুর পালা গান আছে। এমনি একটি আসরে উপস্থিত হয়ে শুনেছিলাম এই গানটি—

ও, শিব, শিবহে, বাবুরা সব করছে খবরদারি।
বাপের গোরে দিচ্ছে ইলেকটিরি।
হালুয়ার ঘরে চেরাগ জ্বলে না।
তাদের প্যাটে খাবার জোটে না।
বিলাকে মাল মিলতি পারে নইলে মেলে না।
ও শিব, এ কেমুন আজব ঘটনা।
সাইচ্যা কথা কইল্যা পরে
নিয়া যাইবে হাজত ঘরে;
হাড় গোড় সব ভাঙি দিবেরে।
ও শিব, শিবহে, একি হৈল দেশের হালরে!
একটা কিছু উপায় করোরে।
ও, শিব, শিব হে ....।

মটুকা বাবুর কাছে শুনেছিলাম এই গানটা বাঁধার ফলে তার ওপরে হামলাও হয়েছিল। তবে তিনি সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে ভয় পাননি কোনদিনই।

(খ) আলকাপ : গম্ভীরার পরেই মালদহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত হলো আলকাপ। গম্ভীরা গানের মতো আলকাপেরও মূল রস হলো কৌতুক। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই সমান জনপ্রিয় এই আলকাপ গান, তবে গম্ভীরার মধ্যে ধর্মীয় গন্ধ থাকলেও আলকাপ গান সেই প্রভাব মুক্ত। গম্ভীরার উপলক্ষ্য শিব। আসর বসে কোন শিবতলা বা কালীতলায় কিন্তু এই আলকাপের আসর বসে মুক্ত মাঠে। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার ছবি ফুটে ওঠে আলকাপ গানে। সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় রচিত হয় আলকাপ গান। বছরের যেকোন সময়েই যেকোন স্থানেই বসতে পারে এই আলকাপের আসর।

আলকাপ শব্দটি আরবী এর অর্থ হলো মস্করা, কৌতুক বা ঢং। কোন সামাজিক ঘটনা, গাথা বা কাহিনীকে কৌতুক বা বিদ্রূপের মাধ্যমে অনেক সময়ে হাল্কাভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। লঘু হাস্য পরিহাস এবং আদিরসের বাড়াবাড়ি অনেক সময় এই গানকে নিম্নস্তরেও নিয়ে যায়।

আলকাপের পালা বন্দনা, টপ্পা, বারোয়ারী, সালতামামি, ধুয়া, মজামারা, খেমটা ও আলকাপ প্রভৃতি ভাগ আছে।

আলকাপের রচয়িতাকে বলা হয় 'খলিফা'। দলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই গায়ক-বাদক থাকে। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের মুসলিম এলাকায় এই গানের প্রচলন বেশী থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের কাছেই এ সঙ্গীত জনপ্রিয়।

আগে গম্ভীরা ও আলকাপের সুর মূলত এক থাকলেও অমরনাথ মণ্ডল এবং লোহারাম খলিফাই এই দুটি গানকে দুটি পৃথক বৃত্তে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম। তবুও এই দুটি লোকসঙ্গীত পাশাপাশি পরিবেশিত হয়ে বহুক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসারে সাহায্য করে আসছে বহু বছর ধরেই।

আলকাপে দলের কোন কিশোর বা যুবক কিশোরী বা যুবতী সাজে। অন্য একজন তার স্বামী সেজে বা প্রেমিক সেজে দুজনে নৃত্য গীত ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নানা বিষয় পরিবেশন করে। দলের অন্যান্যরা দোহার দেয়। যে মেয়ে সাজে তাকে অবশ্য লম্বা চুল রাখতে হয়। নাচও শিখতে হয়। পূর্ববঙ্গের ঘাটু গানের ঘাটুর সঙ্গে ঐ কিশোর বা যুবকের মিল আছে বেশ।

'আলকাপ' গানকে কেউ কেউ ব্যঙ্গাত্মক নাটক হিসাবেও চিহ্নিত করতে চান। উত্তর রাঢ়ের লোক সঙ্গীত গ্রন্থের লেখক দিলীপ মুখোপাধ্যায় মনে করেন সংস্কৃত কাপট্য শব্দ থেকে এসেছে 'কাপ' শব্দটি আর আল্ অর্থে মৌমাছির হুল। 'কাপট্য' হলো ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটক। অর্থাৎ যে ব্যঙ্গাত্মক নাটকে আছে হুল ফোটানোর জ্বালা তাইই আলকাপ।

কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক ঘটনার সমাবেশ থাকলেও একে ঠিক নাটক বলা যায় না। বরং ছড়া, নৃত্য ও লঘু হাস্য রসাত্মক সংলাপ প্রধান আলকাপকে নাট্যধর্মী লোক সঙ্গীত বলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

সাধারণত শীতাকালে ফসল ওঠার পরেই কোন পালা পার্বণ বা মেলা উপলক্ষ্যে আলকাপের আসর বসে থাকে। মূল গায়েন, যুবক যুবতী, দোহার ও বাদকদের নিয়ে দল গঠিত হয়। ডুগি, তবলা, জুড়ি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকে। দর্শক বা শ্রোতাদের মর্জি অনুযায়ীই বা পরিবেশ বুঝে পালা স্থির করা হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় যেকোন সমস্যা বা মজাদার ঘটনাই আলকাপের বিষয় বস্তু রূপে চিহ্নিত হতে পারে। ঘটনার বর্ণনা বা সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে চলে নৃত্য, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যপরিহাস।

আসরে বন্দনা শুরু হয় এইভাবে—

'ওমা কোথায় ওগো বীণাপাণি
ওমা জ্ঞান দায়িনী
কাতর হইয়া ডাকি কর জোড়ে
ওমা, এসো তুমি এই আসরে।
ভর কর এই দীনের কণ্ঠ পরে।
ত্বরায় এসে উদ্ধারো মা বিষ্ণু পদরে।

(বিষ্ণুপদ) মালদা।

মালদার কালিয়াচক থানা থেকে সংগৃহীত একটি গানে দ্রব্য মূল্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—

ঘরের কথা কৈলে তুমি দ্যাশের কথা কৈ?
দ্যাশের কথা কইমু কিছু এই আসরে মুই।
একসের চাল কিনতি হলি ছয়টি ট্যাকা চাই।
ত্যাল কিনিতো নুন কিনি না—পয়সা হাতে নাই।
একখান ধুতি একখান্ শাড়ী কিনবার যদি চাও।
একশো টাকার নোট-খানা ঐ দোকানীর হাতে দাও।
ধার না মিলে দুনিয়া ঢুইড়্যা।
খালি প্যাটে বসন বিনা থাকরে পইড়্যা।
বলি হায়রে কলিকাল।
দেশ জুড়িয়া হইছুরে আকাল।
চাইয়্যা দ্যাখো দ্যাশের কিবা হাল।
ট্যাকা-কড়ির দাম নাইকো হায়রে কলিকাল।

(গ) ভাওয়াইয়া :

উত্তরবঙ্গের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হলো 'ভাওয়াইয়া'। মূলতঃ কুচবিহার জলপাইগুড়ি এবং রঙপুর অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হলেও গোটা উত্তরবঙ্গেই ছড়িয়ে আছে এ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা।

'ভাওয়াইয়া' বলতে বুঝায় ভবঘুরে বা ছন্ন ছাড়া। সেই অর্থে ভাওয়াইয়া হলো ছন্নছাড়া বা ভবঘুরের গান। আবার 'ভাও' শব্দটি এসেছে ভাব থেকে। এইভাব হৃদয়ের মিলন-বিরহজনিত ভাব। ভাও+আই+ইয়া= ভাওয়াইয়া অর্থাৎ যা ভাবের বিস্তার জনিত আবেগ থেকে উদ্ভুত তাইই ভাওয়াইয়া। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাইই হোক না কেন এই সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে নরনারীর প্রেম অর্থাৎ মিলন-বিরহ ও বিচ্ছেদের কথাই ব্যক্ত হয়ে থাকে সুরের মায়াজালে হৃদয় কাঁদিয়ে।

সাধারণত একতারার সাহায্যে একক কণ্ঠেই গীত হয়ে থাকে এই গান। বিরহ কাতর নরনারীর হৃদয় বেদনাই এই গানে প্রকাশ পায়। সুর ও বিরহের সর।

যুগ যুগ ধরে এই গান কাঁদিয়ে এসেছে অগণিত নরনারীকে বিষাদ সাগরে ভাসিয়ে। এই গান কখনো পুরনো হয় না। এর আবেদন চিরন্তন। দেশকাল অতিক্রম করে এই সঙ্গীত হয়ে উঠেছে চিরকালের। হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকলদেশের বিরহ কাতর নরনারীরই প্রাণের সঙ্গীত। এইখানেই এই সঙ্গীতের সার্থকতা।

দুএকটি সঙ্গীতের উদ্ধৃতি দিলেই এই গানের চিরন্তন বিরহের সুরটি ধরা পড়বে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চলের একটি গানে প্রোষিতভর্তৃকার হৃদয় বেদনার করুণ ছবি ফুটে উঠেছে দেখা যায়—

"ওকি বৈলারে, না যাইস্ রে
না মোক্ শ্বশুর বাড়ীত্ থুইয়ারে।
সতীন করে মেকের মেকের শ্বাশুরী পারে গালি রে।
না যাইস্ মোক্ শ্বশুর বাড়ীত্ থুইয়া রে।
কেম্‌নে থাকুম্ শ্বশুর ঘরে সোঁয়ামী নাই ঘরে রে।
হ্যাঁচর-প্যাঁচর বুকের মাঝে—মন্‌ডা কেমন করে রে।
ওকি বৈলারে, নাযাইসরে
না মোক্ শ্বশুর বাড়ীত্ থুইয়া রে।
কুন্‌বা রসিক কইয়্যা গেইসেরে
বৈনা কুন্‌বা রসের কথা রে।
ঐ রসেতে পাগল যে মুই কান্দি দিবা নিশিরে।
ওকি বৈলারে না যাইস্ মোক্ শ্বশুর বাড়ীত্ থুইয়ারে।
মাঝির গুণে নৌকা চলে যৈনা মাহুত গুণে হাতিরে।
এ হেন সোনার যৈবন যাবে আধো গতি রে।
ওকি বৈলারে না যাইস্ মোক্ শ্বশুর বাড়ীত্ থুইয়া রে।"

(মেকের মেকের—খ্যাঁচ খ্যাঁচ করা, যৈনা—যেমন, হ্যাঁচর-প্যাঁচর—যন্ত্রণা)

জলপাইগুড়ি জেলার 'বেলাকোবা' অঞ্চলের একটি গানে প্রেমিকার ব্যর্থ প্রতীক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে— সহজ সরল ভাষায় গভীর হৃদয় বেদনার তীব্র ঝড় তুলে—

ও দাদা মোর রসিয়া।
দ্যাখা দিয়া যান একবার আসিয়া।
আসিবার চাইয়া দাদা মোর আসিলেন না রে।
বাটার পান মোর খাইলেন নারে।
ও দাদারে, দ্যাখা দিয়াযান্ একবার আসিয়ারে।
নয়া গাছের মোর মাল ভোগ কলা,
হস্তিসের দৈ মোর সিকিয়া তোলা;
ওরে, আসিবার চাইয়া মোর দাদা আসিলেন না।
বাটার পান মোর খাইলেন না।
বিন্নিদ ধানের ভাজিলাম খৈ,
নবানু দাদা মোর আইলেন কৈ?
ও দাদা মোর রসিয়া!
দ্যাখ্যা দিয়া যান্ একবার আসিয়া।

জলপাইগুড়ির 'বেলাকোবা' অঞ্চলের অন্য একটি গানে নায়িকা নায়ককে বার বার উঁকি ঝুঁকি মারতে নিষেধ করছে এবং বিয়ে করার জন্য অনুবোধ করছে। আবার আক্ষেপও করছে ভাগ্যে বোধ হয় বিয়ে নেই তাদের—

ও মোর দাদারে, ও মোর দাদারে,
সদাই না দ্যাকেন দাদা, ঢুল্কি মারিয়া।
ঢুল্কি মারিয়া দ্যাকেন মোকে,
মন্দ বলে পাড়ার নোকে,
ও দাদারে, না দ্যাকেন মোক্ ঢুল্কি মারিয়া।

আসেন দাদা জুরি গাথিয়া।
নিয়া যান্ মোক্ বিয়া করিয়া।
ও মোর দাদারে, ও মোর দাদারে।
না দ্যাকেন্ মোক ঢুল্কি মারিয়ারে।

সরিষার ফুল মাঠের শোভা।
নারীর শোভা ঢালুয়া খোপা।
তোরও যেমুন টেরিয়া সিঁথা
মোর তেমনি ঢালুয়া খোপা।

তোতে মোতে হায় বিধি রে,
নাই লেখে হায় জোড়ারে!
ও মোর দাদারে; ও মোর দাদারে
না দ্যাকেন মোক্ ঢুল্‌কি মারিয়ারে।

(ঢুল্‌কি—উঁকি, জুরি—জুড়ি, ঢালুয়া—ঢালের মতো, টেরিয়া—ট্যারা)

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি অঞ্চলের অন্য একটি গানে ব্যর্থ যৌবনের হাহাকার ফুটে উঠেছে। প্রিয়তমকে কাছে পাবার কী তীব্র ব্যাকুলতাই না ফুটে উঠেছে এই গানটিতে—

ও বসন্ত ফিরিয়া যা তুই ঘরে।
যুব্বা নারীর মনের আগুন জ্বালাইস্ কেনেরে?
মনত্ জ্বলে মনের আগুন।
গাও হেলে মোর বায়।
তোর বসন্তের রঙ্গেতে মোর
মন্‌ডা যে আওলায়।
ও বসন্ত ফিরিয়া যা তুই ঘরে।
আংখাও নাই মোর, পাংখাও নাই মোর,
ধরিবার নাই মোর ডাল।
নারীর যৈবন পানের বোঁটা
রাখিম্ কত্ত কাল?
ও বসন্ত ফিরিয়া যা তুই ঘরে।
বিধি যদি মোক্ দিতেন পাখারে
উরিয়া যাইয়া বন্ধুর সনে করতাম দেখা রে।
ও বসন্ত, ফিরিয়া যা তুই ঘরে রে।
যুব্বা নারীর মনের আগুন জ্বালাইস্ কেনেরে।

(যুব্বা—যুবতী, বায়—বাতাস, পাংখ্যা—পাখা)

কুচবিহার জেলার নিগমনগর অঞ্চলের এই গানটিতে বিবাহিতা নারীর হতাশা এবং বাবা মার ওপরে অভিমান ফুটে উঠেছে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দেওয়ার জন্য—

আই এ. বি. এ মেট্রিক পড়া
তার সাথে না হইল জোরা।
জোরা হইল মোর হালুয়া চাষার ঘরে।
ও হায় বিধিরে, নাই নিখিল বিদ্বান মোর তরে।
মুই নারীটা ভর-যুবতী
পাইনু না মুই বিদ্বান পতি।

মুইতো অনেক জানুম নেকা পড়া।
হায় বিধি মোর হালুয়াক্ দিলা জোরা।
মুই নারীটা কর্ম দোষে আসিনু এই হালুয়া ঘরে।
হাতের গহিন মাটিতে না পরে।
বাড়ীর বগলত তোরসা নদী
ঝাঁপ দিয়া মুই মরং যদি
মন্দ কবে সবাই পাড়ার নোকে।
হায় বিধি মোর কপালে কি নেকে ?
মোর যদি হায় কপাল পোড়া
বাপমায় ক্যান্ শিখাই নেকা পড়া ?
হালুয়ার সাথে নিকিলেক মোর জোরা।
ও হায় বিধিরে হায়রে কপাল পোড়া।

(গহিন—গহনা, বগলত—পাশে, হালুয়া—অশিক্ষিত চাষী)

কুচবিহারের নিগমনগর অঞ্চলের অন্য একটি গানে দূর দেশে বিয়ে দেবার জন্য বাপমাকে দুষছে মেয়ে এবং কাককে দূত করে পাঠাতে চাইছে বাপ মায়ের কাছে—

ওরে ও কাগারে,
ঐ না ডালে, তুই না বান্ধিস্ বাসারে।
তোর কাগার কদলা বাও।
মোর মনডা না মানে ভাও।
বাপ মাও মোর নিদয়া হইয়্যা
দূর দ্যাশত্ মোক খাইল বেচায়্যা।
কাঁচা বয়সে মুই আইনু সোয়ামীর ঘরে
ওরে, ও কাগারে।
ঐ নাডালে তুই না বান্ধিস্ বাসারে।

উরিয়া যা তুই স্বগ্য পথে।
খবর দেরে বাপ মার কাছে।
বেচায়্যা দিয়া কেন না করে খবর রে ?
ওরে ও কাগারে,
ঐ না ডালে তুই না বান্ধিস্ বাসারে।

(কদলা—কর্কশ, ভাও—রাগ, নিদয়া—নিষ্ঠুর, বেচায়্যা—বেচে দেওয়া [কন্যাপন নিয়ে])

কুচবিহারের দিনহাটা অঞ্চলের অন্য একটি গানে দেখা যাচ্ছে বিগতা স্ত্রীর শোকে কাতর এক বিপত্নীক পুরুষ—

মাইয়্যা মইর‍্যা হইলুং রে ঢেনা।
শুইন্য হৈছে মোর সুখের বিছানা।
কাউক্‌সা পরিছে মোর চিরুণী আয়না।
আষাড় মাসের বাদল রাইতে
না আইসে নিদ দুই চোখেতে,
কায় হাকাবে ফুলন বিছন দিয়া।
ও কি হায়রে, না আসিবে মোর সে মাইয়্যা।
মাছ মারিয়া আইসং বারি।
মাছ কুটিয়া চরাং হারি।
কায় আন্ধিবে হরন-ফোরন দিয়া।
ও কি হায়রে, না আসিবে মোর সে মাইয়্যা।
মাইয়্যা মইর‍্যা হইলুং ঢেনা।
শুইন্য হৈছে মোর বিছানা।
কাউক্‌সা পরিছে চিরুণী আয়না।

(ঢেনা—দেওয়ানা-কাতর, কাউক্‌সা—নোংরা, কায়-কে ফুলন বিছন—ফুলের মতো নরম বিছানা, হরণ—ফোরন, মসলা—ফোড়ন, আন্ধিবে—রাঁধিবে, মাইয়্যা—স্ত্রী।)

এই ধরণের অসংখ্য ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে কতো যে রচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার হিসাব রাখা মুস্কিল।

তবে শুধু ঐ দুটি জেলাতেই নয় উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং এর সমতল এলাকাতেও এই গান রচিত হয়ে থাকে এবং গীতও হয়ে থাকে। এখানে ঐ দুই জেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি গানের কথা উল্লেখ করবো এবার।

প্রথমে দার্জিলিং জেলার হরদিগছ গ্রামের অরুণ সিংহের লেখা একটি গানের উল্লেখ করবো—একটিতে নায়িকার জন্য কাতর নায়ক বলছে—

ও কইন্যা, তুই মোর পরাণ রে,
কী দোষে তুই ছারিলি মোর মায়ারে
সাদা মনে দাগা দিয়ারে—!
ভাঙ্গিলেন কইন্যা রসের জোরারে।
ভাঙা পিরিতি আর জোরা তো নিবে নারে;
কওয়া কথা কইছেন আগে এলা কি নাই মনে রে?
মনে পরিলে মোর বুকখান যায় ভাঙিরে।

ভাগে যদি থাকে জোরা
পরের কথায় কি যায় ছারা ?
ও কইন্যারে, কার আশায় তুই ছারিলি মোক্‌রে।
ও কইন্যারে তুই মোর পরাণরে।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার সুজালীর অবলা দাস রচিত একটি গানে নারীর হাহাকার ফুটে উঠেছে দেখা যায়—

'আসিনু মুই ফুল বাগানে
মনের আনন্দে।
জানিনু মুই ফুলের সৈরভ রে।
দেখনু সেথায় ভোমরা ঘুরে রে।
ও কি ও, হেই ভগবান রে—
মোর নারীর যৈবন বৃথায় গেল রে!
কেউ নাই মোর যৈবন কালেরে!
ওকি ও, হেই ভগবানরে!
কি দোষে মোর যৈবন গেলরে ?

সত্যি কথা বলতে কি রেডিও, টিভিতে যেসব ভাওয়াইয়া গান পরিবেশিত হয় সে সবের মধ্যে প্রকৃত রস পাওয়া যায় না। পল্লীর নিভৃত পরিবেশেই এই গানের যথার্থ রস পাওয়া সম্ভব। এই গানের করুণ এবং মর্মস্পর্শী আবেদন বুকের গভীরে দোলা দিয়ে যায়। হায় হায় করে ওঠে বুকের ভিতরে। গান শেষ হয়ে যায় কিন্তু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকে সুতীব্র বেদনার রেশ। নৈরাশ্যের বেদনা গ্রাস করে হৃদয়কে।

ভাওয়াইয়া আসলে প্রেমেরই সঙ্গীত নিভৃতে বসে প্রেমিক বা প্রেমিকা তাদের অতীতের স্মৃতি চারণ করে এই সব গানে।

বিলম্বিত লয়ে গায়ক যখন এই গান করে তখন হৃদয়ে কার না দোলা লাগে ? কেঁদে ওঠে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও। সাধারণ মানুষের প্রেম-বিরহ-মিলন ও বিচ্ছেদের উপাদান নিয়েই রচিত এই গান—এর আবেদন চিরন্তন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাওয়াইয়ার মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন সেই মন্তব্য দিয়েই আমাদের বক্তব্য শেষ করি। তাঁর ভাষায়—"এগানের আদর্শ হলো লোকায়ত, অবলম্বন হলো মানব জীবন এবং অনুভব হলো অশ্রুমুখী প্রেম ও বিরহ।"

ভাওয়াইয়ার এর চাইতে সুন্দর মূল্যায়ন আর কিই বা হতে পারে ?

(ঘ) চট্‌কা গান :

উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ভাওয়াইয়ার পাশাপাশি একশ্রেণীর লঘুসঙ্গীত প্রচলিত আছে যা চট্‌কা নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন চট্‌কা গান হলো ভাওয়াইয়ার অবক্ষয়িত রূপ। এটি ছন্দ প্রধান লঘুসুরের গান এবং জীবনের লঘু দিকটিকেই তুলে ধরা হয় এই গানের মধ্যে দিয়ে।

ভাওয়াইয়া গানের মধ্য দিয়ে নরনারীর বিচ্ছেদ বেদনা বা মিলনের আকৃতি বা অতৃপ্তির সুরই ধ্বনিত হয়ে থাকে কিন্তু জীবন ও জগতের বহুবিচিত্র বিষয় নিয়েই রচিত হয় চট্কা গান। মানুষের হৃদয় যখন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে, বিষাদের গুরুভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে হৃদয় তখন সেই গুরুভার থেকে মুক্ত হবার জন্যই প্রয়োজন হয় লঘু বিষয়ের। গুরু এবং লঘু মিলেই পূর্ণ করে তুলেছে উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতির ভাণ্ডার। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য যথার্থই বলেছেন—"এ গান না হলে ভাওয়াইয়া ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সেই জন্য ভাওয়াইয়া ও চট্কা পরস্পরের পরিপূরক। গুরু ও লঘুতে মিলেই এখানে একটি বিষয়ের পূর্ণতাসাধিত হয়।"

—ভূমিকা উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি।

(*হরিশ্চন্দ্র পাল সংকলিত*)

এই গান লঘু সুরে গাওয়া হয় বলেই একে চট্কা গান বলা হয়ে থাকে। এ গান জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এ গানের মধ্য দিয়ে একটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুর প্রতিধ্বনিত হয়।

ভাওয়াইয়ার মতো চট্কা গানেরও প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো দোতারা। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত দোতরার সাহায্যে যত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অন্য কোন যন্ত্রে সেভাবে প্রাণবন্ত হয় না।

দেবদেবী থেকে শুরু কের সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা, প্রণয় কাহিনী বা যেকোন চটুল বিষয়ই চট্কা গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। ব্যঙ্গ ও কৌতুক রসে মিশ্রিত হয়ে চট্কা গান মানুষকে হাসায় উৎফুল্ল করে, ভার মুক্ত করে আবার কখনো কখনো ভাবনার খোরাকও জোগায়।

চট্কা গান অনেক সময়ে দ্বৈত কণ্ঠেও গীত হয়। তবে দ্বৈত কণ্ঠের সঙ্গীতে বৈচিত্র্য আসলেও একক সঙ্গীতে যে ভাবগত নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায় সেই নিবিড়তা আসে না।

'চটক্' থেকেই চট্কার উৎপত্তি। চটক অর্থে রং বুঝায়। মনে রঙের চটক্ ধরায় বলেই এই গানের নাম হয়েছে চট্কা।

বিভিন্ন পালা গানের আসরে আকর্ষণ বাড়াবার জন্যই গাওয়া হয় চট্কা গান। কীর্তন, বিষহরি পালা এমনকি ভাওয়াইয়ার আসরেও পরিবেশিত হয় চটকা গান।

আসরে দোতরায় 'ডাং' পড়া মাত্রই চঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রোতারা। সকলের হৃদয় মন উন্মুখ হয়ে থাকে সঙ্গীতের রস উপভোগের জন্য।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে চট্কা গানকে চার ভাগে ভাগকরা যায়— (১) প্রেমবিষয়ক (২) সমাজচিত্র মূলক (৩) হাস্যরসাত্মক ও (৪) নৃত্য বিষয়ক। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি প্রেম বিষয়ক 'চট্কা' গানে স্নানের ঘাট থেকে ফেরার পথে রাধা রূপী বউ এর হৃদয় বেদনাকে কি সুন্দর ভাবেই না হাল্কা সুরে ফুটিয়া তোলা হয়েছে—দেখা যায়—

ও, মোর কালারে, কালারে মোর কালা!
ছাড়রে মন কালা রঙের খেলা।
ও বন্ধু, পশ্চিমে ডুবিল বেলা

বেলা ডুবিলে হবে যে আন্ধার।
ও মোর কালারে, কালারে মোর কালা।
ননদী মোর চোখের বৈরী
বাদী হৈল মোর কাল শ্বাশুরী।
দেরী হৈলে পরিব জঞ্জালে।
ও মোর কালারে।
ও মোর ভিজা কাপর কালা,
ভিজারে মোর সায়া।
মুই শীতে কাপং কালা দাও ছারিয়া রে।
মুই চলিয়া যাং ঘরে।
ও, মোর কালারে।

ঐ অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত অন্য একটি চট্‌কা গানে দেখা যায় বৌদিটি তার দেওরার প্রতি আসক্ত। দেওরটি এখন দূরে চলে গেছে তাই্ই বৌদিটি এখন মনের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে—

ও মোর পরাণের দেওরারে
তোক্ দেখুং মুই সব ভুলিনুরে।
যেদিন হৈতে দেওরা দিছেন শাড়ীরে
সেদিন হৈতে দেওরার লাগি পরাণ কান্দেরে।
যেদিন হৈতে দেওরা দিছেন লাল ফিতা আর সায়া
সেদিন হৈতে দেওরার তরে বাইড়্যা গেছে মায়া।
ও মোর পরাণের দেওরারে।
তোক্ দেখুং মুই সব ভুলিনু রে।
যেদিন হৈতে দেওরা গেছেন বৈদেশরে
সেদিন হৈতে মুই অভাগী জ্বলি দিবা আতিরে।
ও মোর পরাণের দেওরারে
তোক্ দেখুং মুই সব ভুলিনুরে।

প্রথম গানটির মতোই এটিও পরকীয়া প্রেম বিষয়ক গান। হাল্কা সুরে রচিত এই গানটি হাল্কা সুরেই গীত হয়ে থাকে।

হাস্যরসাত্মক একটি চট্‌কা গানে ভেজাল তেল খেয়ে নতুন জামাই বাবাজীর দুরবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই গানটি একান্তই চটুল সুরের হাল্কারসের গান। কুচবিহার জেলার দিনহাটা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই গানটিতে শাশুড়ী ভেজাল তেলকে উদ্দেশ্য করে বলছে—

ও, ত্যাল, ও সরিষার ত্যাল্‌রে,
তোর তরে মোর নয়া জামাই বেজার হইয়া যায়।

চান করিতে গেলত্ জামাই মাখিয়া ঐ ত্যাল্
চুলকাইয়া জামাইর পিঠির ওঠে ছাল।
ও, ত্যাল ও সরিষার ত্যালরে।
বাইগন পোড়া খায় মোর জামাই ঐ না ত্যাল দিয়া।
কাপড়-কাথা করিল নষ্ট হলদি অং মাখিয়া !
আন্ধন আন্ধিতে মোর তিসির ত্যাল ভাল।
ও তোর সরিষার ত্যালে ভূত্ত আছেরে।
ওই ত্যালে মোর কাম-না- আছেরে।
ও, ত্যাল ও সরিষার ত্যালরে।

(আন্ধন—রন্ধন, বাইগন—বেগুন)

অন্য একটি হাল্কা রসের গানে জনৈক চাষী মজুরের হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কুচবিহারের দিনহাটা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই গানটিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চাষী মজুর বলে—

"ওকি বাপরে বাপ, ওকি মাওরে মাও !
না পাঙ মুই কামাই করিবার।
হাল বাহিয়া আসিনু বাড়ী ঝাপি মাথাত্ দিয়া—
ওৎথি থো তোর নাঙ্গল-জোয়াল বাবু বলেক আসিয়া।
ওকি বাপরে বাপ্, ওকি মাওরে মাও ;
না পাঙ মুই কামাই করিবার।
বাড়ী আসিলু ভাল করিলু খুদি-চারডা খা।
কলসী দুইটা ভার সাজাইয়া জল আনিবার যা।
ওকি বাপরে বাপ, ওকি মাওরে মাও ;
নাপাঙ মুই কামাই করিবার।
জল আনিলু ভাল করিলু ঘরের কোনত্ থো।
তিন দিনিয়া বাসিয়া ডোকা ভাল করিয়া ধো।
ওকি বাপ্‌রে বাপ্, ওকি মাওরে মাও ;
নাপাঙ মুই কামাই করিবার।
ডোকা ধুলু ভাল করিলু তুই যে প্রাণের নাথ।
চট্ করিয়া দে তুলিয়া দুইডা মানসির ভাত।
ওকি বাপরে বাপ্, ওকি মাওরে মাও ;
নাপাঙ মুই কামাই করিবার।

(নাপাঙ—পাইনা, ঝাপি—টোকা, ওৎথি—ঐখানে, ডোকা—থালা, বাসন)

হাল্কাসুরের এই গানটির মধ্য দিয়ে দিন মজুরের কী করুণ ছবিই না ফুটে উঠেছে। সামাজিক চিত্রের এক অমূল্য দলিল স্বরূপ এই গানটি।

অন্য একটি গানে কলিযুগের বউ নিয়ে রঙ্গরসের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও সামগ্রিক ভাবে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সমাজের করুণ চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন গীতিকার। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার সুজালি গ্রাম থেকে সংগৃহীত এই গানটিতে নতুন বউকে ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে—

'ও দাদারে, বাপরে বাপ্ কলির কেমুন আজব ঘটনা!
বউ হইচুরে সরগের চান্দ শ্বাশুরীর মান আখে না।
বউ হইচুরে হীরক কণা সনা ও না হয় তুলনা।
ও দাদারে, বাপরে বাপ্ কলির কেমুন আজব ঘটনা।
বউকে যদি পার গালি পালিয়ে যাবে বাপের বারী
আনতি গেলি দিবে ডিস্‌মিস্ জারী।
বলবে রেগে—'তুমার বিটার ভাত আর খামু না।
কর যদি জারি জুরি কোর্টে করবে ডিক্রি জারি।
কার সাথে যে পালিয়ে যাবে খুঁজতে পাবে না।
ও দাদারে, বাপরে বাপ্ কলির কেমুন আজব ঘটনা।

এইখানে ডিস্‌মিস্, ডিক্রি প্রভৃতি ইংরাজী শব্দ কেমন সহজেই না ঢুকে গেছে পল্লীগীতিকারের গানে।

(ঙ) জাগের গান :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে জাগগান বা জাগের গান বলে একটি বিশেষ ধরনের সঙ্গীত প্রচলিত আছে। রাত জেগে এই গান করা হয় বলেই একে বলা হয় জাগের গান। 'জাগা' শব্দ থেকেই 'জাগ' শব্দটি এসেছে। এই গানের কেন্দ্রস্থল রংপুর হলেও মালদহ জেলাতেও প্রচলিত আছে এই জাগের গান।

মালদহ জেলার রাখাল বালকরা সারা পৌষ মাস ধরে দল বেঁধে রাত্রি জেগে এই জাগের গান গেয়ে থাকে। গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল-ডাল-আলু মসলাদি সংগ্রহ করে পৌষ সংক্রান্তির দিনে তারা বনভোজনের আয়োজন করে।

জাগের গানের মধ্য দিয়ে সত্যপীর, মাণিকপীর, শ্রীকৃষ্ণ বা নিমাই এর জন্মকাহিনী বা বাল্য লীলা বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তবে মালদহ জেলার বীরনগর, ভীমা গ্রাম, পালগাছি ও কালিয়াচক থানার বিভিন্ন গ্রামের রাখাল বালকরা বর্তমানে আর রাত জাগে না, তারা সন্ধ্যার সময়েই (পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে) বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গায় এবং চাল ডাল সংগ্রহ করে বা পয়সা সংগ্রহ কবে গ্রামের বাইরে বেদী তৈরী করে কৃষ্ণের বাল্য কালের মূর্তি স্থাপন করে পূজো করে। মূর্তিটি বাছুরের গায়ে হেলান দিয়ে থাকে।

রাখাল বালকরা কৃষ্ণের বাল্যকালের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান গেয়ে থাকে। একজন গায় অন্যরা ধূয়া ধরে—

(ধূয়া)— খেলা করেরে কাইল্যা কৃষ্ণ খেল কদম্বের তলে।
(গায়ক)— নন্দ গেইল বাথানে যশোদা গেইল জল্‌কে।

শুইন্য ঘরত্ পাইয়া কৃষ্ণ ননী চুরি করে রে।
মা যশোদা ঘরত আসি কৃষ্ণেরে শুধাই
—ওরে কিষণ্, ননী কেবা খায়?
কৃষ্ণ বলে, আমি তো মা খাইনি ননী, খেয়েছে বলাই।
—হাঁরে বলাই, হাঁরে বলাই, ননী কেবা খায়?
—আমি তো মা খাইনি ননী, খেয়েছে কানাই।
(ধূয়া)— খেলা করেরে কাইল্যা কৃষ্ণ খেল্ কদম্বের তলে।
(গায়ক)— তখন ভয়ে কৃষ্ণ ঠাকুর পলাইতে লাগিল।
খেল্ কদম্বের গাছে কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া উঠিল।
কৃষ্ণ বেড়ায় ডালে ডালে পাতে না দেয় পা।
কৃষ্ণ বেড়ায় পাতে পাতে ডালে না দেয় পা।
মা যশোদা ডাকেন, ওরে, সোনার যাদু মণি।
গাছ থাইক্যা নাইম্যা আইসো, খাইতে দিমু ননী।
কদম্বের ফুল দিমু পাড়ি নাইম্যা আইসো যাদু।
কইবো না আর কোন কিছু খাও ননী-মধু।
মায়ের কথায় ভুলিয়া কৃষ্ণ ভূঁয়েতে নামিল।
মা যশোদা সেই খনেতে কৃষ্ণেরে ধরিল।
(ধূয়া)— খেলা করেরে কাইল্যা কৃষ্ণ খেল কদম্বের তলে।
(গায়ক)— সামনে পাইয়া মা যশোদা বাছুর বাঁধা দড়ি গো।
সেই দড়িতে দুধের বাছা কৃষ্ণকে বাঁধিল গো।
—বেঁধোনা বেঁধোনা মাগো বাছুর বাঁধা দড়ি।
বাঁধনের যাতনা মাগো সহিতে না পারি।
মেরোনা, মেরোনা মাগো, কাঁচা কঞ্চির বারি।
মারার যাতনা মাগো সহিতে না পারি।
মেরোনা মেরোনা মাগো সরুল বেতের বারি।
মারার যাতনা মাগো সহিতে না পারি।
(ধূয়া)— খেলা করেরে কাইল্যা কৃষ্ণ খেল কদম্বের তলে।
—মাগো, কোমরের বিছা বেইচ্যা দিমু ননীর কড়ি।
—মাগো, পায়ের পাজনী বেইচ্যা দিমু ননীর কড়ি।
—মাগো হাতের বাঁশী বেইচ্যা দিমু ননীর কড়ি।
মাগো, মাথারো মুকুট বেইচ্যা দিমু ননীর কড়ি।
এতেও যদি নাহয় মাগো যামু মামার বাড়ী।

গায়ক— সেই না কথা শুইন্যা যশোদা বাঁধন দিল খুলি।
আদর করি কৃষ্ণরে কোলত্ নিল তুলি।
কৃষ্ণের বন্দনা গান সাঙ্গ হইয়্যা গেইলো।
এক সাথে তুম্‌রা সবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।
(ধূয়া)— খেলা করেরে কাইল্যা কৃষ্ণ খেল কদম্বের তলে।
ও ভাই খেল খেলারে খেল কদম্বের তলে।

অন্য একটি বন্দনা গানে কৃষ্ণের পাচনি হারানো ও বাঁশী বাজানোর কথা বলা হয়ে থাকে।

(গায়ক)— ঐ পারেতে কদম্বের গাছ পাতা ঝুর্ ঝুর্ করে।
তার তলেতেই কাইলা কৃষ্ণ সদাই নিত্য করে।
কৃষ্ণ গেইল বিষ্ণুপুরী না গেইল জানাইয়া।
সেইখান থাইক্যা আইল কৃষ্ণ পাচনি হারাইয়া।
চলোরে সকলে যাই পাচনি খুঁজিতে।
পাচনি মিলিল শেষে কালীদহের কূলে।
(ধূয়া)— সজনি গো বিন্দাবনে বাজে কি ধ্বনি?
গায়ক— কালীদহের কুলে প্রভুর এড়েছিল কেশ।
কেশের দিকে চাহিয়া প্রভুর মনো হলো শেষ।
কেশলড়ে কেশুয়ালী গো লড়ে তল্লাবাঁশের আগা।
তল্লা বাঁশের আগাতে গো শুধু বলে রাধা রাধা।
(ধূয়া)— সজনি গো বিন্দাবনে বাজে কি ধ্বনি?
গায়ক— এখানেতেই কৃষ্ণ কথা সাঙ্গ হইয়া গেইল।
আর কতো কহিমু মাগো রাত্তির বইয়া গেইল।

(চ) মৈষাল বন্ধুর গান :

জলপাইগুড়ির এবং কুচবিহার জেলার বিভিন্ন অংশে মৈষাল বন্ধুর গান খুবই জনপ্রিয়। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ষাকালে মোষের 'বাথান' হয়। রাখালরা মোষের পিঠে চড়ে বা মোষ ছেড়ে দিয়ে নদীর তীরে বা গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে যে গান ধরে টানা সুরে তাইই মৈষাল বন্ধুর গান বলে পরিচিত।

এগানের বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রেম। মাহুত বন্ধুর গানের সঙ্গে এই গানের যথেষ্ট মিল আছে। উভয়েরই বিষয়বস্তু প্রেম এবং সুর বিলম্বিত ভাওয়াইয়ার সুর।

কুচবিহারের একটি গানে দেখা যাচ্ছে এক যুবতী মৈষাল বন্ধুর প্রতি তার প্রেম নিবেদন করছে এই ভাবে—

ওকি, ও মৈষাল বন্ধুরে,
মইষ চরাও মাঠের পরে

কুন্‌বা নদীর পারে ?
ওকি ও মৈষাল বন্ধুরে !
মুখখান তোর শুখায়ে গেছে নিদয়া পহরে।
ঢুরকি মাইর‍্যা দেখন্‌ মুইরে
প্রাণ কান্দে তোর তরে।
ওকি, মৈষাল বন্ধুরে।
মুই নারী যাও নদীর ঘাটে বনের ভিতর দিয়া।
ঐ না পথে দিও দেখা জাঙ্গালী সাজিয়া।
ওকি ও মৈষাল বন্ধুরে।

(নিদয়া—নির্দয়া, ঢুলকি—উঁকি, জাঙ্গালী—জঙ্গলী)

অন্য একটি গানে দেখা যায় মৈষাল বন্ধুর গান শুনে নদীর ঘাটে কাপড় কাচতে কাচতে বিহ্বলা হচ্ছে এক যুবতী তাই সে গাইছে—

ও, মোর মৈষাল বন্ধুরে,
কুন্‌বা দ্যাশে যান চইল্যা
মইষের পাল লাইয়ারে।
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে।
মইষ চরাইছেন তুমরা মৈষাল
ঐ না নদীর পারে,
ওরে, মুই ও নারী কাপড় কাচি
ঐ না নদীর জলেরে,
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে।
গান করেন গে মৈষাল বন্ধু
মইষের পিঠে চড়িরে,
মুই নারীটা সেই গান শুনি
কাপড় কাচা থুইয়ারে।
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে।
গান শুইন্যা মোর পরাণ কান্দে
বন্ধুরে তোর তরে।
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে।

কুচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকার অন্য একটি গানে নায়িকার কণ্ঠে কিছুটা অভিমানের সুর শোনা যায়—

ধিকো, ধিকো, ধিকো মৈষালরে,
ও মৈষাল ধিকো তোমার হিয়া।
কুন্‌ পরাণে যাইবেন মৈষাল

আমাক্ ছাড়িয়ারে।
ধিকো ধিকো, ধিকো, মৈষালরে!
হাট যাইবেন, বাজারে যাইবেন রে,
ও মৈষাল, মোর তরে কিইবা আন্‌বেন রে?
ঢ্যাংরা বাপটোর লাল বটুয়া
মোরো দাঁতের মিশিরে।
ধিকো-ধিকো ও মোর মৈষাল রে।
তোমরা যাইবেন অমপুর মৈষাল রে
মোর ঝুরিছে হিয়া
আর কতোকাল আখিম যৈবন
অন্‌চলে বাঁধিয়া
ওমোর মৈষাল বন্ধুরে।

অন্য একটি গানে বিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে—

তিস্তা নদীর পারে পারে রে
ওমোর মৈষাল বন্ধু আইসেরে—!
ঘসিয়ার হইয়া বন্ধুরে
মোর ঘাস কাটিয়া দিছেরে।
বোঝা বান্ধিয়া মাথাত্ তুলিয়া দিছেরে।
ও মোর পরাণের বন্ধুরে,
মোক্ ফ্যাইলা চইলা গেছে
কুন্‌বা দূরের দেশে রে।
মনের হাউসে মুই বইস্যা বান্ধি ওমোর খোপারে।
তিস্তা নদীর পারে পারে সেই না খোপাবে
সদা আওলায় বাতাসেরে
ওমোর মৈষাল বন্ধুরে।
আশা দিয়া মৈষাল বন্ধু কুথায় রৈল বৈসেরে?
কুন বা পাপে বিধি হামাক্ দিলে এমুন জ্বালারে?
মুই অভাগী দিনে আতে ভাসি চোখের জলেরে।
এহেন নহুলী যৈবন গেল অধগতিরে।
তিস্তা নদীর পারে পারে রে
ওমোর মৈষাল বন্ধু আইসেরে।

সহজ সরল গ্রাম্য নারীর হৃদয় বেদনা কি গভীর করুণ রসেই না সিক্ত হয়েছে এই গ্রাম্য গীতিকারের রচিত গানটিতে।

(ছ) ডোমনীর গান :

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হলো 'ডোমনীর গান'। এ জেলার সবচেয়ে নীচু তলার মানুষদের লোকসঙ্গীত হলো এই 'ডোমনীর গান'। সহজ সরল নরনারীর জীবনের আশা নিরাশা, চাওয়া-পাওয়া মিলন ও বিরহের নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এই গানের মধ্যে।

মালদহের মাণিকচক এলাকা থেকে সংগৃহীত একটি ডোমনীর গানে দেখা যাচ্ছে বৌদি তার দেওরকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে হুঁকা খাওয়াচ্ছে—

যারা আবেতো দেউরা
কারিয়েন নিহরা,
হুক্কা পিলিহেন খাড়া খাড়া।
হুক্কা পিলিহেন খাড়া খাড়া।
হামার হুক্কা ছ্যায় হে দেওরা
পিতলকে বান্ধা।
ধুয়ে-মেজে চিক্‌না লাগাউ
পিয়েমে ঠাণ্ডা।
হামার হুক্কাকে মুখ ছাউহে লাম্বা।
হাত্‌কে ইশারা দেকে ভাউজি
দেউরাক্‌ ডাকলে ঘরত্‌ আন্ধে।
বিচ্‌ ঘরমে বাইঠিকে হুক্কা পিলাইলে।
বাদমে পাড়াক লোককে জানাইলে।
দেউরা বলে ভাউজি রে মুই
নাই পিব হুক্কা!
মন্‌মে দিছ আজকে ধোঁকা।
নে হুক্কা বলে দাম চোরাগে।
নে হুক্কা বলে দাম চোরাগে।

গানটিতে হিন্দী বলয় ঘেঁষা অঞ্চলের প্রভাব পড়েছে দেখা যাচ্ছে। দেওরটি গোপনে বৌদির ঘুরে ঢুকে হুঁকা খেয়ে আরাম করতে চেয়েছিল কিন্তু সেয়ানা বৌদি পাড়ার সবাইকে জানিয়ে দিতেই তার গোঁসা হলো। তখন হুঁকা দিতে চাইছে ক্ষমতা নেই বলে।

(জ) রং পাঁচালী :

এগান হাল্কা রসের। লঘু সুরের এই চটুল গানে অনেক অশ্লীল শব্দেরও প্রয়োগ ঘটে থাকে বহুক্ষেত্রে। উত্তরদিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটি রং পাঁচালী তুলে ধরা হচ্ছে এখানে—(চোপড়া থানার গান এগুলি)

মুইসার্কাস দেখিতে গেনু যে আমগঞ্জ।
তারের খেলা দড়ির খেলা কতোই খেলার ঢং।
খেলা দেখিয়া মোর মনথ নাগিল রং।
চেংড়া-চেংড়ি খেলা দেখে পাউডার ঘসা মুখে।
দুকানে দুকানে ঘোরে মণ্ডা মিঠাই সুখে।
যা করিস্ তা করিস্ ওরে ইজ্জত খোয়াসনা!
আমগঞ্জের হাসপাতালে বড়ালকে দেখাসনা।
বড়াল ডাক্তার বড়ই সেয়ানা।
চেংড়ী বুড়ীর মান রাখে না।

(কদমগাছি/সাবিত্রী)

অন্য একটি গানে মা বোনের পরণে ছেঁড়া পাটানি কিন্তু যুবক হবিবুরের বড় লোকী চালে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে—

"মাইগে, এলিসন্, বেলিসন, সেলিসন্ ফুটানি।
হাবিবুর ছোঁড়াটার গোগো ফুটানি।
গোগো পিন্ধিয়া আমগঞ্জ নে যাছে।
আমগঞ্জে সিনেমা দেইখ্যা চা মিঠাই খিলাছে।
মা বহিনা চীরা পাটানি পরে
হবিবুর ছোঁড়ার ফুটানি নি ধরে।
এত্ত যে বুঝানু তারে—নাই বুঝিল সে।
এলায় গোগো পিন্ধিয়া আমগঞ্জে সে।

(কদমগাছি/কাদেরী)

অন্য একটি গানে মামার প্রতি ভাগ্নীর দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে দেখা যায়—

পাতকাটি কুচি কুচি পাতকুল কুলাইগে।
দুয়ার দিয়া যাছেন মামা খুশী হইয়া গে।
ও মামা মোর মাথা খাস্রে।
একবার আসি ঘরত্ বসোরে।
নরম গরম বিছানা মোর কেউ নাইরে ঘরে।
ও মামা তুই একবার আসি ঘরত্ বসোরে।
ঠাণ্ডা পানি খিলামু মুই দিমু সাঁচী পান।
একবার আসি ঘরত মোর তুই বসিয়া যান।
মামা তোর হাতের বাঁশী মুখের হাসি একবার দিয়া যান,
মোরএ কলসীর ঠাণ্ডা পানি একবার খায়াযান।

(২) ব্যবহারিক বা পারিবারিক লোকগীতি :

যে সব গান সাধারণত পরিবারের মেয়েরা বা পাড়ার মেয়েরা গেয়ে থাকে কোন বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেই সব গানকেই বলা হয় ব্যবহারিক বা পারিবারিক সঙ্গীত। ইংরাজীতে এই সব গানকে বলা হয় Functional Song. সাধারণত বিয়ে সাদি, অন্নপ্রাশন, ষষ্ঠী পূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যেই গাওয়া হয় এই সব গান। তবে এক অনুষ্ঠানের গান অন্য অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের নানা পর্য্যায়ে কত বিচিত্র গানই না গাওয়া হয়।

(ক) বিবাহ সঙ্গীত :

গানের মাধ্যমে বিয়ের অনুষ্ঠানকে আনন্দদায়ক করে তোলা একটা আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া বিশেষ। বাঙালীর বিয়ে ব্যাপারটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান। হিন্দু মুসলমান, তপশীল জাতি ও উপজাতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে বিবাহ সঙ্গীত। সমবেত কণ্ঠেই বাঙালী মেয়েরা গেয়ে থাকে এই গান। যুগ যুগ ধরে দেশের নানা প্রান্তে বাঙালী মেয়েরা বিয়ের গান গেয়ে আসছে এবং ঐ সব গান সংরক্ষণও করে আসছে। বিয়ের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাসর শয্যা পর্য্যন্ত কত বিচিত্র ধরনের গানই না মেয়েরা গেয়ে থাকে। এই সব গানের মধ্যে যেমন লঘু হাস্য পরিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি আবার কন্যার বিদায় লগ্নে সুগভীর বেদনার সুরও ধ্বনিত হয়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিয়ের গানগুলোকে কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— গায়ে হলুদের গান, স্নানের গান, বর বা কনে সাজানোর গান, বরযাত্রার গান, বাসর শয্যার গান, কনে বিদায়ের গান, এছাড়া বিয়ের আসরে বর এবং কনে পক্ষের মেয়েরা ছেলেমেয়ের গুণাগুণ বর্ণনা করে যেভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমন করে গান গেয়ে থাকে সে গুলোও কম আকর্ষণীয় নয় যদিও সবক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে পারে না কোন পক্ষই। তবে দলবেঁধে সমবেত সুরে মেয়েরা যেসব গান গায় সেসব গান সত্যিই উপভোগ্য।

তবে উত্তরবঙ্গের কোন কোন অংশে গায়ে হলুদের আগেও মাড়োয়ার গীত এবং ফোরোল ডুবার বলে দু ধরণের বিশেষ গানও গাওয়া হয়ে থাকে।

(১) মাড়োয়ার গীত :

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বিয়ের দিনক্ষণ ঘটকের মাধ্যমে স্থির হয়ে যাবার পরে কোন কোন অংশে মেয়ের বাড়ীতে 'মাড়োয়ার' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। একটা বিশেষ ছায়া মণ্ডপের নীচে এয়োস্ত্রীরা সমবেত হয়ে নতুন উনুন তৈরী করে রান্না করে ও সমবেত ভাবে গায়—

"আজা ঘোরে ডালে ডালে
বুলবুল ফেরে তালে।

আইসো আইসো ওরে বুলবুল্
ছায়া মাড়োয়ার তলে।
কি নাব হইবে ওরে আজা
বসি ছায়া মাড়োয়ার তলে ?
ছায়া মাড়োয়ায় বইস্‌লেরে আজা
মাও কানদিবে মোরে।"

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে বিয়ে ভেঙে না যায় তাই দেখা। তবে বর্তমানে এই অনুষ্ঠান প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়।

(২) ফোরোল ডুবার গীত :

মাড়োয়ার অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পরে 'ফোরোল ডুবার' অনুষ্ঠানটি হয়। বিয়ের দিন কয়েক আগে মেয়ের আত্মীয়া ও গ্রামের মেয়েরা কনের বাড়ী থেকে মাটির কয়েকটি প্রদীপ সাজিয়ে নিয়ে যায় নদী বা পুকুরের ঘাটে তারপরে সেগুলো জলে ভাসিয়ে দেয়। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রদীপগুলো ডুবে যেতেই মেয়েরা গাইতে থাকে—

ফোরোল ডুব্বার গেনু মাও মুই
তাঁতি পাড়া দিয়া।
বারাও রই
তাঁতির তাই তেনী হাতে গামছা নিয়া।
তোরে গামছা আবানে রই তাই তেনী
বাছার বিয়া ঠ্যাকা।
ফোরোল ডুব্বার গেনু মাও মুই
হলদি আওলির পাড়া দিয়া।
বারাও রই
হলদির হইল দানী হাতে হলদি নিয়া।
তোরে হলদি আবানে রই হইল দানী
বাছার বিয়া ঠ্যাকা।

তবে বর্তমানে এই গানটির প্রচলন নেই বললেই চলে এপার বাংলায়।

(৩) গায়ে হলুদের গান :

বিয়ের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান সাধারণভাবে স্ত্রী আচার নামেই পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের গানই ঐসব স্ত্রী আচারের মন্ত্র স্বরূপ। বিয়ের উল্লেখযোগ্য স্ত্রী আচার হলো গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে এয়োস্ত্রীরা নানা রঙ্গ রসিকতা করে। গানও গায় যেমন—

ছাব্ ছাব্ কেশাই গে
কাহার কছায় মিলে ?

ছাবিতে টুরিতে গে
বহিনের কছায় মিলে।

অন্য একটি গানে কিছুটা সংলাপের ভঙ্গীতে বলা হয়ে থাকে—

বৈরাতী (এয়োস্ত্রী)— কেশাইরে কেশাই, তোর জনম
কুণ্ঠিয়ারে ?
কেশাই— মোর জনম্ গিরসের বাড়ী রে।
গিরসে বেচে গিরথানে কিনেরে।
মোর কেশাইর মোহ মোহ বাস্রে।
বৈরাতী— কেশাইরে কেশাই, তোর কাম্ কিরে ?
কেশাই— আওপারী কইন্যার গাতে নাগিরে।
নাগি নাগি আওপার দুলহার গাতে নাগিরে।

(গিরস—গৃহস্থ, গিরথান—গৃহিনী, কুণ্ঠিয়া—কোথায়, আওপারী—বাগদত্তা, দুলহা—বর)

উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের এই রাজবংশী সম্প্রদায়ের গায়ে হলুদের গানের মতো উত্তর দিনাজপুর অঞ্চলেও প্রচলিত আছে নানা ধরণের গায়ে হলুদের গান। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার বিভিন্ন গ্রামে বেশ উপভোগ্য গানের সন্ধান পেয়েছি। একটি গানে বলা হচ্ছে—

হামার বেটির হলুদ মাখার
মনত্ নাছিল জোররে।
হলুদের জনম কেদ্দূরগে ?
কেশাই এর জন্ম কেদ্দূরগে ?
হলুদের জনম্ গিরসের বাড়ী।
কেশাইর জনম্ বাঘালীর দুকান।
আন্ কেশাই বুড়ার বেটাক্ বান্ধিয়া।
আজ হোক বেটির অধিবাস।

আবার মালদহ জেলার তুলসী হাট্টা ও গাংনদীয়া গ্রামের আশে পাশে গায়ে হলুদের সময়ে এয়োস্ত্রীরা যে গান গায় তাও বেশ উপভোগ্য। তারা গায়—

"আজ বেটা আম্মাক্ ত্যেজিলেন বেটা।
তেল নাগালেন বেটা, হলুদ নাগালেন বেটা।
আজ বেটা তু শ্বাশক মা করলেন বেটা।
তেল নাগালেন বেটা। হলুদ নাগালেন বেটা।
আজ বেটা তু বহিনিক ত্যেজিলেন বেটা।
তেল নাগালেন বেটা, হলুদ নাগালেন বেটা।

আজ বেটা শালিক বহিন করলেন বেটা।
তেল নাগালেন, হলুদ নাগালেন বেটা।

(আম্মাক্—আমাকে, শ্বাশক—শ্বাশুড়ী, তু—তুই)

আবার মালদহ জেলার জালালপুর, সুজাপুর, চাষপাড়া, বাখারপুর, গয়েশ বাড়ী ও আশে পাশের গ্রামে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের সময় গাওয়া হয়—

'হলদি তুমার জনম্ কুণ্ঠে হে ?
মোর জনম্ বাবুর বাগানে হে।
হলদি তুমি কোন্ কোন্ কামে নাগ হে ?
মুই নাগি আজা আণীর গায়ে হে।

আবার ঐ অঞ্চলে ওপরের গানটির সঙ্গে এই গানটিও গাওয়া হয়ে থাকে—

"কাঞ্চনা হলদি ডগমগ করে রে।
অঞ্চল দিয়া মুছ বাছার ঘামরে।"

অর্থাৎ সোনার বরণ হলুদ গায়ে ঝলমল করছে। বাছার ঘাম মুছিয়ে দাও। একই অনুষ্ঠানে পাশাপাশি তিন জেলাতে কতো বিভিন্ন ধরণের গান গেয়ে থাকে মেয়েরা তা বুঝাবার জন্যই এখানে ঐ তিন জেলার কিছু গানের উল্লেখ করা হলো। অন্যান্য জেলাতেও এই গানের বৈচিত্র্য আছে।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের এই রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা ধরনের বেশ উপভোগ্য গানের প্রচলন আছে।

(৪) স্নান করানোর গান :

উত্তর দিনাজপুরে বর বা কনেকে স্নান করানোর সময় তাদের গুরুজন স্থানীয় মা-জেঠী-কাকী বা দিদি, বৌদিরা গেয়ে থাকে—

"তেল মাখাইতে হামার বাবার
তেল সরকে পরে রে।
আইজ বাবার উদিবাস
কিবা মনথ পরে রে।
আইজ বাদে কাইল
হামার বাবার বিয়ারে।
তেল মাখাইতে হামার বাবার
তেল সরকে পরে রে।

(৫) বিবাহ যাত্রার গান :

ভাবী বরের অধিবাস হয়েছে। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। বরযাত্রীদের নিয়ে এবার যাত্রা শুরু হবে। মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছে বর বেশী ছেলে—

সে বলে— 'সাজায়ে দেহ্ গে মায়ো পায়ের ধূলা দিয়া।
দেহগে মায়ে মোক্ সিন্দুরের পুঁড়িয়া।
মা উত্তর দেয়— 'পায়ের ধূলা দিনুরে বেটা নিজ মনে।
সিন্ধুরের পুঁড়িয়ারে বেটা নেযাবি কেনে?
ছেলে— পায়ের ধূলা গে মায়ো মাথাত বুলামু।
সিন্দুরের পুঁড়িয়াক গেমায়ো মুই আরসক্ পিনাহ্ মু।
মা— যাও যাও বেটা হলদা বরণে যাও।
বেটা তুম্রা রণ বন জিতিয়া আসন।
বহিন বরনি হলে রে বেটা জাঙ্গিয়ায় বসায় আনন।
মাহমারি হলেরে বেটা মাল্লাক্ দান করন।
ধুতি গামছা পিন্ধিয়ারে বেটা মায়ের আরজি লেছনা।
বেটা তুম্রা রণ-বন জিতিয়া আসন।

(বিবাহ্ যাত্রাকে এখানে যেন যুদ্ধ যাত্রার সঙ্গে এক করে ভাবা হয়েছে। প্রাচীন সামাজিক রীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় এখানে যখন পাত্রী পক্ষদের পরাজিত করে পাত্রীকে নিয়ে আসা হতো বিজয়ীর বেশে।)

বিবাহ্ যাত্রার প্রাক্কালে বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা গ্রামের কালী মন্দিরে যায় মায়ের আশীর্বাদ নিতে। দলের গায়িকাগণ মাকালীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে—

গাঁয়ের কালী ঠাকরাণ রং রসিয়া হো।
আহো উছি উছি বাংলা ঘর উঠায় মাঙ্গে হো।
সোনা কড়ি ঝাপেনিগড়ায় মাঙ্গেহো।
রূপা কড়ি নলুক পিনা হয় মাঙ্গে হো।
মোদের গাঁয়ের কালী ঠাক্রাণ রংরসিয়া হো।
ভক্তি দেছে মোর ভাই নজর রাখিস হো।
বেহা করবার যাছেরে ভাই জোড়া মিলাইস্হো।

মা কালীকে প্রণাম করে ও আশীর্বাদ্ নিয়ে বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা এগিয়ে চলে রিক্সা-লরী-বাস বা ভ্যানে। গায়িকারা চলে গান গাইতে গাইতে।

বর সহ্ বরযাত্রীরা এক সময়ে এসে পড়ে কন্যার বাড়ীর কাছে। কিন্তু কনেপক্ষ সহজে ঢুকতে দেয় না বরপক্ষকে। চলে ছড়ায়-গানে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ। তার পরে পাত্রপক্ষদের মেয়ের বাড়ীতে প্রবেশের মুখে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ব্যঙ্গের সুরে গেয়ে ওঠে—

কন্যাপক্ষ— "আসিলরে কেয়া আন্ধারে মুন্ধারে
ঘরের বগলত্ আসিয়েরে কেয়া
জুড়িল মশাল রে।
অন্ধকারে চুপি চুপি এসে ঘরের কাছে আলো জ্বালিয়েছে রে কেয়া)

কিন্তু এখানেই থামে না তারা। আরো বলে—

আম বাড়ী মিলিমিশি জামের বাগিচানারে।
কুন্‌পাকে দেখা পালে হামার মাইয়্যার বাড়ীরে ?
ঐঠিয়া নাছিল ছচা কারুয়ার বাড়ী নারে।
তাহিনা দেখায় দিলে হামার মাইয়্যার বাড়ী আরে।

(ঐঠিয়া—ঐখানে, ছচা—শয়তান, কারুয়ার—ঘটক)

প্রথমটা বরপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই পায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের নিমন্ত্রিত লোকজন আসে। বরপক্ষ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে কনের বাড়ীতে প্রবেশ করে কোনক্রমে।

(৬) বিবাহ বাসরের গান :

বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা কনের বাড়ীতে ঢোকার পরেই মেয়েপক্ষের এয়োস্ত্রীরা আবার তীব্রভাবে আক্রমণ করে বরকে—তারা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে গেয়ে ওঠে—

ছিক্ ছিক্ মামোর মায়োগে।
ইট্ দুল্‌হা কেমন গে।
ইট্ দুলহার নাকট।
ঢেট কৃয়ার ঠোঁট ট।
ইট্ দুলহার পিঠখান।
খার করা পিরা খান্।
ইট্ দুল্‌হার হাতখান্।
খার করা মুগুর খান্।

(ছিক্-ছিক্—ছিঃ ছিঃ, ঢেট কৃয়া—দাঁড় কাক, দুলহা—বর, খার করা—কাপড় কাচা, পিরা—পিড়া)

কিন্তু নবীন বরের নাক, হাত, পিঠের ব্যাখ্যান করেই তারা থামে না। বরের বয়স নিয়েও কটাক্ষ শুরু করে দেয়—

ছণ্ডা বয়সের কামাই
খিলালু বহিন মাগিকরে।
বুঢ়া বয়সের কামাই
বেহা করবা সাজলুরে।
বয়স গেল তোর হটিরে।
বয়স গেল তোর খাটিতে।
এলা নাকি সাজেরে
বেহা করিতে।

(ছণ্ডা—ছোঁড়া, খিলালু—খাওয়ালে, এলা—এখন)

(অন্নদামঙ্গলের বরবেশী শিবকে নিয়ে এয়োস্ত্রীদের হাসি ঠাট্টার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়।)

দিনের আলোয় বিয়ে করতে আসে নি বলেও মেয়ে পক্ষ আক্রমণ করতে থাকে

বহিন মাগিয়াক দিনে আসি বা কহিসনু
বহিন মাগিয়াক্ দিনে কেনে নি আইসে?
আন্ধারে-মুন্ধারে কেনে আইসে?
দোসর সাথে কেনে দিনে নি আইসে?

(বহিন মাগিয়া—যে বোনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে বা করেছে)

কন্যাপক্ষ— বরযাত্রীদেরও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

নেওতিরে নেওতি পান সারি সারি।
দুলহার বাপটু পাঠাই দিচ্ছে নাংগাই বয়রাতি।
আইনতোরে কইন্যার ভাই এক মোটা কঞ্চি।
ঝরিয়া উঠাউং ঝারিয়া বসাই উংনাংগাই বয়রাতি।

(নেওতি—নিমন্ত্রিত, নাংগাই—দুশ্চরিত্র, বয়রাতি—বরযাত্রী)

মেয়ের ভাই বরযাত্রীদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসে তলোয়ার হাতে। বর এবং দুশ্চরিত্র বর যাত্রীদের সে কিছুতেই সহ্য করবে না। তখন রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়ে পাত্র পক্ষের মেয়েরা। তারা অনুরোধ করতে থাকে—

পাত্রপক্ষ— মায়ির বাপের বাড়ীগে আইমন মুসুরি গে।
বিনাবায়ে হালিয়া হালিয়া পরে গে।
মায়ির ভায়ট দুয়ারে ডাণ্ডালেগে।
হাথত্ তেরুয়াল রাখি ঘুরাচ্ছে গে।
না ঘুরান, না ঘুরান তেরুয়াল ভাই।
তেরুয়াল দেখি নইজ্জা বরণ হবেগে।
ভাউজ মাগুয়ার বরটু উলুলাই মরিবেগে।

(তেরুয়াল—তরোয়াল, ডাণ্ডালে—দাঁড়ালে নইজ্জা—লজ্জা, ভাউজ মাগুয়া—ভাই বৌ মাগী, বরট—বর, উলুলাই—উভয়েই)

তখন গাঁয়ের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় কিছু উপহার বা যৌতুকাদি দিয়ে বরপক্ষ বিবাহ বাসরে বসার অনুমতি পায়। বিয়ের আয়োজন এগিয়ে চলে দ্রুত। জলপানের ব্যবস্থা হয় সকলের জন্যে। কিন্তু দু চার জন ছোক্রা বর যাত্রীদের পোষাক এবং চাল চলন ভাল লাগে না মেয়ে পক্ষের। তাই তারা আক্রমণ করে তাদের—

স্যুট পিন্ধা বুট পিন্ধা ঢের দেখিয়াছি।
হামরা খতিয়াই না মায়িটার মা হই।
ঘড়া যায় গড় গড়ি হামরা খতিয়াই না।

ধুতি পিন্ধা সৃতি পিন্ধা ঢের দেখিয়াছি।
হামরা খতিয়াই না মায়িটার মা হই।
ঘড়া যায় গড়গড়ি হামরা খতিয়াই না।

(পিন্ধা—পরা, খতিয়াই না—পাত্তা দিই না)

কিন্তু এখানেই থামে না তারা অন্য স্যুট পরা ঝাকড়া চুলো বা নাড়ু গোপালদেরো আক্রমণ করে তারা।

দুটা আসিয়া স্যুট পিন্ধা দশের মাঝত
বসে কিনা বসে।
কাল কাল ঘুঙুরা বাজে কিনা বাজে।
একটু বগদরচুষা দশের মাঝত
বসে কিনা বসে।
কাল কাল ঘুঙুরা বাজে কিনা বাজে।

এইসব বিস্তর রং তামাসার পরে এক সময় ডাক পড়ে বরের ছাদনা তলায়। বরের আসতে দেরী দেখে মেয়ে পক্ষ আবার মেতে ওঠে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে—

বহিন-মগার কমরাতেছে চেরকুটা ধুতি।
লাজে নি আসে বহিন মগা এগেনার ভিতি।
দেগে দেগে বায়ো রেশম কাট ধুতি।
পিন্ধিয়া আসুক বহিন মগা এগেনার ভিতি।

(কমরা—কোমর, বায়ো—বাবা, চেরকুটা—ছেঁড়া, দেগে—দাও, এগেনা—উঠোন, ভিতি—ভিতরে)

অবশেষে লাজুক মুখে বর এসে দাঁড়ায় ছাদনা তলায়। মেয়ের মা ডালা হাতে বরণ করে বরকে এবং সুর করে গায়—

তোর শাশুরী চুমাছেন নজর আখিস্ বুঢ়ারে
আলুয়া ধানের দুল দুল গুড়া বুঢ়ারে।
তোর শাশুরী চুমাছে নজর আখিস বুঢ়ারে।
কি দেখিস্ তুই বুঢ়ারে ডালি ডার ভিতিরে।
তোর মাও হারিয়ানি ডালি বেনায় দিছেরে।
কি দেখিস্ তুই বুঢ়ারে চেরাকটার ভিতিরে।
তোর মাও কুমারনি চেরাক বেনায় দিছেরে।

(চুমাছে—আশীর্বাদ করছে, হারিয়ানি—হাড়িওয়ালী, যারা কুমারনি—কুমারের স্ত্রী, চেরাক—চেরাগ বাতি, ডালা তৈরী করে, আলুয়া ধান—আলোচাল)

এবার পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিয়ে সম্পন্ন করে। গুরুজনরাও বরণ করে ও আশীর্বাদ করে। আসে সিঁদুর দানের পালা। বর মায়ের কাছ থেকে সিঁদুর নিয়ে আসে আগেই। এয়োস্ত্রীরা সিঁদুর দানের সময় গান শুরু করে—

'হামার মায়ির সরু সিথারে বান্দর মুহা।
এল কেটায় বেল কেটায় দিল সিন্দুর রে বান্দর মুহা।
বেংহিয়া লারিয়ে সুতি সলোরে বান্দর মুহা।
তাহাতে তোর হাতলা বেংহিয়ারে বান্দর মুহা।

(এলকেটা—বেলকেটা—এখানে সেখানে, বেংহিয়া—ব্যাঙ অর্থাৎ মেয়ের সরু সিঁথার যেখানে সেখানে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে ল্যাক ল্যেকে বাঙের হাতে।)

বিয়ে হয়ে যায়। বর কনেকে বাসর ঘরে তোলা হয়। বরযাত্রী এবং নিমন্ত্রিতরা এবার খেতে বসে। পাত্রপক্ষের গায়িকারা এতক্ষণ কোণ ঠাসা হয়েছিল। পাত্রীপক্ষের গায়িকারাই একতরফা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে যাচ্ছিল। কিন্তু ভোজ আশানুরূপ না হওয়ায় এবার পাত্রপক্ষের গায়িকাদের কাছে সুযোগ আসে আক্রমণের। তারা কোমর বেঁধে নেমে পড়ে আসরে—

নেওতিরে নেওতি পান সারি সারি।
কইন্যার বাপ সমন দিলে অজাতিয়ার বাড়ী।
অজাতিয়া ভাত খায় হের হেরা পের পেরা।
হের হেরা পের পেরাভাতে পেট নাহি ভরে।
হামার বাড়ী যাইস্ অজাতিয়া হামার বাড়ী যাইস্।
গরম গরম ভাতদিমুরে পেট পুরিয়া খাইস্।
নেওতিরে নেওতি পান সারি সারি
কইন্যার ভাইট সমন দিল অজাতিয়ার বাড়ী।
অজাতিয়া পান খায় পেচ কুটি পেচ কুটি।
পেচকুটি পেচকুটি পানে মুখ নাহি ভরে।
হামার বাড়ী যাইস্ অজাতিয়া, হামার বাড়ী যাইস্।
গালভরিয়া পান দিমুরে মুখ ভরায়ে খাইস্।

(হের হেরা পের পুরা—বাসি ও গল গলে ভাত, নেওতি—নিমন্ত্রিত, পেচকুটি—ছোট, অজাতিয়া—যার জাত নেই।)

(৭) বাসরঘরে পাশা খেলার গান :

বাসরঘরে বসে পাশার আসর। বর কদাচিৎ জেতে। হেরে গেলে তাকে পণ দিতে হয়। পণ দিতে না পারলেই বিদ্রূপের ভাগী হতে হয়। মেয়েপক্ষ চেপে ধরে নবীন বরকে—

মেয়েপক্ষ— তোর বাপ দেয়নি কিয়া পাশার কড়ি?
কি দিয়া খেলামু পাশা জনম নাড়ার বেটা?
হামার মায়ি হারিয়া গেইলে হামারা দিমু কড়ি।
বান্দর মুহা হারিয়া গেইলে কে দিবে রে কড়ি?
কে হারে কে জিতে আজিকার আতি।

হামার মায়ি হারিয়া গেইলে হামরা দিমু কড়ি।
বান্দর মুহা হারিয়া গেইলে কে দিবেরে কড়ি ?

ছেলেপক্ষের এয়োস্ত্রীরা তাদের ছেলের হেনস্থা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারে না। ছেলের অবস্থা যে বেশ ভাল একথা বুঝাতে চায় গানে গানে এবং মেয়েপক্ষই যে তাদের ছেলের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ছুটে গিয়েছিল সেকথা ও শোনাতে ছাড়েনা—

ছেলেপক্ষ— মোদের ভায়াটার বাড়ী ফলের বাঝিকা আরে।
বাঝিকার কাঠাল খাইয়া হইল মোটা গোটা আরে।
ভায়াটার বাঝিকায় কতো কতো গাছ আরে।
ফল খাইয়া ভায়াটা হইল বগদুর চোষা আরে।
তুয়ার বেটিক্ কে গেইল্ জুরিবা আরে ?
তুয়ার বেটিক আপনি আসিয়া ধরে আরে।
হামার ভায়ার দুরতে তেলিগে দুরতে তেলি।
তাই হামার ভায়ির মল্‌মল্ চুলগে মলমল চুল।
তুয়ার মায়ির আঠাতে তেলিগে আঠাতে তেলি।
তাই মায়িটার চুর চুরা চুলগে চুরচুরা চুল।

(বাঝিকা—বাগিচা, জুরিবা—জুড়তে, বগদুর চোষা—নাদুস নুদুস, দুরতে—দুয়ারে, তেলি—তেল, মলমল—মসৃণ, চুরচুরা—জটাজটা)।

মেয়েপক্ষ আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তারাও এবার তাদের মেয়ের গুণগান করতে শুরু করে দেয়।

মেয়েপক্ষ— যেমুন দেখেন গে চান্দ সূর্য্য তেমুন দেখেন গে
মোদের মায়ির মুখটা গে।
যেমুন দেখেন গে কাল কচুর দণ্ডহে
তেমুন দেখেন গে মোদের মায়িটার বয়স গে।
যেমুন দেখেন গে বেয়ুর বাঁশের শিরগে
তেমুন জানেন গে মোদের মায়িটার বয়স গে।

(চান্দ, সূর্য্য—চন্দ্র সূর্য্য, কাল কচুর দণ্ড—কালরঙের কচুর কচিদণ্ড, বেয়ুর বাঁশ—কচি বাঁশের মাথা।)

কিন্তু মেয়ের রূপ ও বয়সের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না তারা। বরের মায়ের চরিত্র নিয়েও কটাক্ষ শুরু করে দেয়—

আটাতে তুরুক পাড়া তোর মায়ের নাংরে
অজাতিয়ার বেটারে।
তুরুকে টাকা দিলে তো হইল তোর বিহারে
অজাতিয়ার বেটারে।

তোর মায়ের নাং না থাকিলে
নাই হলয় তোর বিহারে
অজাতিয়ার বেটারে।
নাং বাপের টাকায় বিহা করিলুরে
অজাতিয়ার বেটারে।

পাত্রপক্ষও আর চুপ করে থাকতে পারে না তারাও মেয়ে পক্ষের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করতে শুর করে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়ে পক্ষকে আক্রমণ করে—

পাত্রপক্ষ— আন্ধুন ঘরা চিকন মাটিরে সখী
ঝিল ঝিলাছে টাটি।
কইন্যা শালার মাউগে নাইরে সখী
গামছাতে পইল ময়লা গে।
কাইল বিহানে কাইল বিহানে
যাইস তো হামার বাড়ী
এমুন করিয়া ধুইয়া।

এইভাবে পাত্রীপক্ষ ও পাত্রপক্ষের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে বাসর জমে ওঠে। রাত বাড়তে থাকে। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। পরের দিন আসে বিদায় লগ্ন। করুণ হয়ে ওঠে পরিবেশ।

(৮) কন্যাবিদায় গান :

কন্যার মা— ছোট থনে বড় করিলামরে।
কার হাতে মুই তোক্ দিনুরে।
বেটি হামার যাছে শ্বশুর ঘরেরে
মোর কলিজা ফাটি যাছেরে।

(মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মেয়েও কাঁদতে কাঁদতে বলে—)

মেয়ে— আঙ্না কুরাতে হামাক্ মারি ছিলেন গে।
আজ আঙনা বুঝিয়ালেন গে।

মা— আতে নালিশ বেটি কেন দিছেন গে?
আজ মোর কলিজা ফাটিযাছেরে।
আজ দরিয়া উসরিয়ে যাছেরে।

মা কাঁদে, মেয়ে কাঁদে, আত্মীয় স্বজনও কাঁদতে থাকে। চোখের জলে বিদায় নিয়ে বর কনে গাড়ীতে ওঠে। আগে আগে চলে বরযাত্রীরা।

এক সময় বরপক্ষ নববধূকে নিয়ে বরের বাড়ীতে আসে। বরের মা এবং গুরুজনরা বরণ করে ঘরে তোলেন নতুন বৌকে। এখানেও পাত্র পক্ষীয় মেয়েরা ছেড়ে দেয় না। তারা মেয়ের গহনা নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকে।

(৯) বধূ বরণের গান :

পাত্রপক্ষ— টাটিরে ঝিংগাগে মাটিতে পরেরে।
মাইয়ার না বাপট কোটিনা চিপেরে।
কোটিনা চিপি চিপি সন বানালে গে।
সোনা না পায়গে পিতল জোরা দিলে গে।
টাটিরে ঝিংগা গে মাটিতে পরে গে।

(টাটি—বেড়া, ঝিংগা—ঝিঙে, কোটিনাচিপে—কৃপণ। বুড়ী ঠাকুমা বা দিদিমা নাত বৌকে দেখে নিজেদের অতীত স্মরণ করে হা হুতাশ করে—

ঠানদি— তোররে বিটার ভাউজে পোহরি ভাউজেপোহরি।
ওরে অভাগী বয়স করলে ভারী।
তোররে ভাউজের ভটরা ভটরা চোখ।
ভটরাভট্রা ঐচোখ দেখিবার মানায় না মোক।
তোররে বিটার ভাউজে পোহরি, ভাউজে পোহরি
ওরে, অভাগী বয়স করলে ভারী।

(ভাউজে—বৌ, পোহরি—দেখি, ভট্রা—বড়।)

এবার বরের বাড়ীতে বসে পাশা খেলার আসর। মেয়ের বাড়ীতে পাশা খেলার সময় ছেলেপক্ষকে অপমানিত হতে হয়েছে এবার ছেলেপক্ষ বদলা নেবার জন্য প্রস্তুত হয়। মেয়েকে আক্রমণ করে ছেলেপক্ষ এবার—

(১০) পাশা খেলার গান :

তোর বাপ কাঁহা দিলুক
পেশাসারির কড়ি ?
ঝিট্রকি নিয়ে খেলরে
দু ভাতারীর বেটি।
রয়ে গেলি হামার বাবার বাঁদী
তুই রে তিন ভাতারীর বেটি।

(পেশাসারি—পাশাখেলা, ঝিট্রকি—গুটি)

কনেবৌ এর রূপগুণ ও চরিত্র নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়ে না ছেলেপক্ষের মেয়েরা -

এঠিয়া কলার মকচট্র বুড়ী
বুকে ভাঙিল রে।
ছাড়ি আইল পাটি পারা নাং রে।
মোক দয়া নাগেরে।

ছাড়ি আইল স্যুট্ পিন্‌হা নাংরে।
মোক দয়া নাগেরে।

(এঠিয়া কলা—বীচি কলা, মকচট—মোচা, পাটি পারা—সিঁথি কাটা, দয়ালাগে—লজ্জা হয়)

এইসব গান ছাড়াও 'হাংগোরগীত' এবং 'শয্যাতোলার গীতও প্রচলিত আছে কোন কোন অঞ্চলে।

বিয়ের পরে নববধূকে নিয়ে বর যখন ঘরে ঢুকতে যায় তখন কয়েকজন মেয়ে বাধা দেয় এবং কিছু আদায় করার পরেই দ্বার ছেড়ে দেয়।

(১১) হাংগোরগীত :

মেয়েরা— নি ছাড়িম্ নি ছাড়িম্ দূয়ার
নিমু নাকের সনা।
সনা পাইলে ছাড়িম দূয়ার
নইলে ছাড়িম না।
নি ছাড়িম নি ছাড়িম দূয়ার
নিমু গলার মালা।
মালা পাইলে ছাড়িম দূয়ার
নইলে ছাড়িম না।

বর— দিমু দিমু গলার মালা
দূয়ার ছাড়ি দে।

তখন প্রতিশ্রুতি পেয়ে মেয়েরা সরে দাঁড়ায়।

(১২) শয্যা তোলার গান :

প্রথম বাসর নিশির শেষে শয্যা তোলার ভার পড়ে যাদের ওপর তারা শয্যা তোলার প্রণামী চায় কিছুটা কটাক্ষও করে।

জোল পাই তোল্‌া তুয়ার ইছানা-বিছানা।
সারা আইত পিরীত করে মা বাপ জানে না।
জানে না ঐ তসরের ধুতি খান্।
ধুইতে ধুইতে যাবেরে আইজ্ জান।
ধুইতে নাগে ধুপুনি ধুপুনি।
ধুপুন জ্বালায় মরিগে সজনি।

(জোলপাই তোলা—ওলট পালট, ধুপুনি—কষ্ট)

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিয়ের বিভিন্ন পর্য্যায়ের গানগুলো যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মজাদার। তবে যন্ত্র সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এসব সঙ্গীতের প্রচলন কমে আসছে এবং বিবাহ রীতি, আচার-অনুষ্ঠানও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। আবার যেসব অঞ্চলে এসব গানের প্রচলন আছে আজো সেই সব অঞ্চলে ঢুকে বিশষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির থেকে ঐ সব গান সংগ্রহ করা বা অনুষ্ঠানের ছবি তোলাও বেশ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিরিশ বছর আগে সত্তরের দশকে কিন্তু এসব ব্যাপারে বিশেষ বাধা ছিল না। আজ কেন জানি না একটা বাধার প্রাচীর যেন উঠেছে মাঝখানে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহনুষ্ঠান ও কম বৈচিত্র্যময় নয় এবং এদের বিবাহনুষ্ঠানের গানগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। (এ প্রসঙ্গে ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(খ) অন্নপ্রাশনের গান বা সাইটোর গীত :

সাইটোর গীত : রাজবংশী সম্প্রদায়ে শিশুর মুখে প্রথম অন্নতুলে দেবার অধিকারী হলেন মামা। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে গ্রামের মেয়েরা নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান গৃহে এসে সমবেত হয়। ডালা সাজানো হয় পান সুপারি, কলা, খৈ, মুড়ি, মিষ্টি, সিঁদুর প্রভৃতি নানা দ্রব্যাদি দিয়ে। গ্রামের মেয়েরা ঐ থালার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচে আর গায়। এই গানকেই বলা হয় সাইটোর গীত। উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই গানকে ভাওছোঁয়ানির গানও বলা হয়। যেসব গান ঐ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় তাদের একটি এখানে তুলে ধরছি—

"সোনাই জাগায় সাইটোর
কোলত্ ছুয়া নিয়া।
সাইটোর জাগায় সোনার সোনাই।
কলার ছড়া নিয়াহাতে
সদাগর পাদেয় এগেনাতে।
কুতি গেইল সোনাই সোন্দরী
হাত বাড়ায়া নাও।
খৈ এর ডালি নিয়া হাতে
সদাগর পাদেয় এগেনাতে।
কুতি গেইল সোনাই সোন্দরী
হাত বাড়ায়া নাও।
সিন্দুর পান নিয়া হাতে
সদাগর পাদেয় এগেনাতে।
কুতি গেইল সোনাই সোন্দরী
হাত বাড়ায়া নাও।
সাইটোর জাগায় সোনার সোনাই।"

(সাইটোর—ষষ্ঠী, কুতি—কোথায়, এগেনা—উঠান)

এই অনুষ্ঠানে কোন কোন বাড়ীতে মনসার গান বা রামায়ণ গানও হয়ে থাকে। মুখে ভাত অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় এবং আনন্দদায়ক করে তোলার জন্যই নানাবিধ আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে বহু বাড়ীতে।

(গ) সাইটোর : আগে 'সাইটোর' বলে একটা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায় এই অনুষ্ঠানটি হতো এবং গানও গাওয়া হতো। তবে বর্তমানে ওপারের রংপুর অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন থাকলেও এপারে ঐ অনুষ্ঠান বা ঐ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গানের প্রচলন নেই বললেই চলে।

এক সাথের চেংড়ি সউক ছাওয়ার মাওরে।

হায় রে মরি হামার মাইয়্যা জনমের বাঁজিরে।

(ঘ) ফুলফুটানি : রাজবংশী মেয়েদের প্রথম ঋতুমতী হওয়াকে বলে ফুল ফুটানি। আগে এই উপলক্ষ্যেও বিশেষ অনুষ্ঠান ও নাচগানের ব্যবস্থা হতো তবে বর্তমানে এই অনুষ্ঠানও এই সম্পর্কিত গানের বিশেষ চল নেই।

"ভাদর মাসের চান্দর তিথি এলায় যাছুরে চলিয়া।

কুথায় গেইল মোর রসিক ভ্রমরা ফুলের মধুযাছু শুকায়া।"

(ঙ) মড়া খোয়া : রাজবংশীদের মৃতদেহ সৎকার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যেও এক ধরণের গান কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। ঐ গানকে বলা হয় মড়া খোয়ার গান। তবে এগানেরও জনপ্রিয়তা কমে আসছে দ্রুত।

ব্যবহারিক বা পারিবারিক লোকগীতি গুলির রচয়িতা এবং সুরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা। গ্রামের নিরক্ষর মেয়েরাই এই সব গান যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে আসছে এবং বহুক্ষেত্রেই মুখে মুখেই তারা নতুন নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নতুন নতুন গানও তৈরী করে থাকে।

উত্তর-দক্ষিন-দিনাজপুর, মালদহ এবং কুচবিহার জলপাইগুড়ি ও নিম্ন দার্জিলিং জেলার বহুগ্রামে এমন বহু স্বভাব মহিলা গীতিকারের সন্ধান পেয়েছি আমি।

(ত) আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত : বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পূজা পার্বণ ও সামাজিক উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যে সব লোকগীতি হয়ে থাকে সেই সব গীতকেই সাধারণ ভাবে আনুষ্ঠানিক গীতি সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের পার্বণ গীতি বা সঙ্গীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনার গান, বীজবোনার গান, ফসল তোলার গান, পৌষ পার্বণ, নবান্ন ছাড়াও গাজনের গান, কার্তিক, মনসা, কালী ও শিব দুর্গার গানকেও ধরা হয়ে থাকে।

(ক) বৃষ্টি কামনার গান :

চৈত্র-বৈশাখে যখন মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়—চারিদিকে জলের জন্য ওঠে হাহাকার, চাতকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ফটিক জলের প্রার্থনা। জল শুধু একটু জলের জন্য দিকে দিকে ওঠে করুণ ক্রন্দন। তখনই কৃষকের কণ্ঠে শোনা যায়—

আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে

ছায়া দে ওরে।

আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে

ঝুপ ঝুপাইয়া ম্যাঘ নামাইয়া
ক্ষ্যাত ভাসাইয়া দেরে।
আল্লা ম্যাঘদে পানি দে
ছায়া দে ওরে।
এক ফোডা পনির লাইগ্যা
কাইন্দা কাইন্দা মরি রে।
আল্লা ম্যাঘদে পানি দে
ছায়া দে ওরে।

উত্তরবঙ্গে আবার কোথাও বা চাষের প্রয়োজনে জলের জন্য প্রার্থনা জানায় চাষী এইভাবে—

সোনারি হাল গোঁসাই
রূপারি ফাল।
বাসুয়া বলদ দিয়া মুই বহ্ হাল।
ও পানি আয়রে আয়।
এক চাষ দিনুরে মুই দুই চাষ দিনু।
তাহনি মরেরে দুবুয়ার বন।
ও পানি আয়রে আয়
মাঠ শুখায়া যায়।

এই উভয় গানের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। রাজবংশী চাষীর কণ্ঠে আল্লা বা পানি শব্দ উচ্চারিত হয় কতো না সহজ ভাবেই।

(খ) বৃষ্টি কামনায় ব্যাঙের বিয়ের গান :

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী মেয়েরা বৃষ্টি কামনায় কোথাও কোথাও ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। বাড়ীর উঠোনে বা মাঠের কোন স্থানে গর্ত করে চার কোণে চারটে ছোট ছোট কলাগাছ পুঁতে দুটো ব্যাঙকে বর-কনে সাজিয়ে ঘটা করে বিয়ে দেয় শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে এবং সমবেত ভাবে গাইতে শুরু করে—

বেঙের বিটির বিয়ারে
গলায় মালা দিয়ারে।
ও বেঙি তুই ম্যাঘ দিছনা ক্যান?
ও বেঙা তুই পানি দিছনা ক্যান্?
এক ফোডা পানির নাগি
সব্বাই কাইন্দা মরেরে।
ও বেঙা ও বেঙি, ক্যান্ দেখিস্ নারে?
ও বেঙি তুই মেঘ দিয়া যারে।
ও বেঙা তুই পানি দিয়া যারে।

বেঙের বেটির বিয়ারে
গলায় মালা দিয়ারে।

ব্যাঙ ডাকলে তবেই বৃষ্টি নামে এই সরলবিশ্বাস থেকেই উত্তরবঙ্গের মেয়েরা এই অনুষ্ঠান করে। পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গেও কোথাও কোথাও বৃষ্টির কামনায় ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার প্রথা এখনো প্রচলিত আছে।

(গ) জলোৎসব বা পানি মাংগার গান :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি কামনায় মেয়েরা জলোৎসব বলে একটা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে এবং ঐ উপলক্ষ্যে গানও গেয়ে থাকে। গ্রাম ঠাকুরের থানে বা কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ঘড়া ভর্তি জল ঢেলে নারীগণ জলের জন্য প্রার্থনা করে এবং গান গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিন করে—

আইসো হে মেঘা বইস হে মেঘা
খান বাটার পান হে।
শাল বাড়ি জঙ্গলে।
তুহেরে মেঘা শালারে।
বহিনের ভরুয়া নারে।
সারা রাতি কাটাইলি বহিনের বিছানায়রে।
আইসো মেঘা বইসো হে মেঘা
খান বাটার পানহে।

(ঘ) হুদুমাদেও উৎসবের গান :

এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বৃষ্টি কামনা, প্রকৃতিরূপী ধরিত্রীর সঙ্গে বরুণদেব মিলিত হলেই অনাবৃষ্টি দূর হবে। তাই মেয়েরা অমাবস্যার রাতে নির্জন মাঠে কলাগাছ পুঁতে সেই গাছকে বরুণ দেব কল্পনা করে পূজা করে ও নানা অনুষ্ঠান করে থাকে এবং গানও গেয়ে থাকে—

হিল্ হিলায়ছে কমরটা মোর
শির শিরাইছে গাও।
কুণ্ঠে গেইলে এলা
হুদুমাব দেখা পাও ?
পাটানি খান্ পড়্যাছে খসিয়া
আইসেক্রে মোর হুদুমা দেওয়া।
তোর লাগি মুই আছ বসিয়া।
ভীল সোল্সোল্ কমরটা।
কাছেতে নাই ভাতারটা।
কুণ্ঠে গেইলে দেখা পাই
দেখা হইলে দেহাটা জুরায়।

ওপারের রংপুর অঞ্চলে এই গানের এখনো প্রচলন থাকলেও এপারে ইদানীং আর এই গান বা অনুষ্ঠান তেমন চোখে পড়ে না।

এসব ছাড়াও নবান, পৌষ পার্বণ, গাজন এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যেও নানাধরণের পার্বণ সঙ্গীতের প্রচলন আছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও এবং লেপচাদের মধ্যেও করম, আষাড়ী, সহ্‌রাই, নবান, বাহা, জিতুয়া, ছাতাপরব, আহেরিয়া প্রভৃতি নানা পরব উপলক্ষ্যেও যেসব গান গাওয়া হয় সেগুলিও বেশ আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহীও বটে।

(ঙ) সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নবান্নের গান :

ন্যাস দল আকাল কেদায়।
কালম দএ সাঁঝাও কেদায়।
মহার বাবা চেকে তরেন বাড়ায় কেদায়।
পুখরিবে সেরালি কিন চাপিয়া কান।

অর্থাৎ (এবছরে আকাল গেল। আগামী বছরে বর্ষণ হতে পারে। একথা বড়রা জানলো কি করে না পুকুরে সোনালী পাখী ভেসে বেড়াচ্ছে তাই দেখে)।

(ঝ) সহ্‌রাই উৎসবের গান :

সড়ে মিঞ সড়ে ক্রিন্দা গড়েৎ বাবায় হইলেৎ।
গড়েৎ বাবা সহরাই ঢাইনায় সাগোড় নাগুকেৎ।
মাঝি কোরেন বায়ার কাড়া,
পাবানিক কোয়া ঠেটা যোগাড়। গড়েৎ বাবা সহরাই দাই নাই সগোড় নাগুকেৎ।

(ছ) জমি চষা বা হলাকর্ষণের গান :

জমিচষার সময় এই গানটি গাওয়া হয়
হানা ভিটা গোর কুটাস্
নোয়া ঘুটু সিয়োঃ।
লিতায় লিতায় হার ছুটি গেইল।
হামারো ঘরের ঘিরনি
দানাপানি নইহে—
মাড়ি বোকাঃ টুটি গেইল।
আস ছুড়ি গেইল।

(জ) পূষণ পরবের গান :

গোৎ হারতা খাল কাতে।
হাসা খেল দাবকাতে।
নোকো বোকা সাঁওতাল
কেদেৎ কেদেৎ।

(ঝ) আহেরিয়া পরবের গান :

মুচকো মুচকো মাকো
দুঁগুদ দুগুঁদক।
নহায় ছাপাকিয়া বাড়ে
লাতার ডার বেশে
দুগুঁদ দুগুঁদক।

(৪) কর্মসঙ্গীত :

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রমিক বা কৃষকদের মধ্যে কাজের সময় ছন্দ বদ্ধ তাল যুক্ত গানের প্রচলন আছে। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলেও শ্রমিক এবং কৃষকরা কাজ করার সময় কাজে উদ্যম এবং গতি আনার জন্য নানা ধরনের গান গেয়ে থাকে সমবেতভাবে। বলা বাহুল্য উত্তরবঙ্গেও এই ধরনের কর্মসঙ্গীতের প্রচলন আছে বহুদিন থেকেই। আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ধানকাটার একটি গানের উল্লেখ করছি এখানে—

ও হায়, ধান কাটিম্ ধান কাটিম্রে।
ও ভাই ধান কাটিতে হৈল বেলা ;
বিহান হৈতে সইন্ধা বেলা !
সোনার ধানে ভরুম গোলা।
ওরে ভাই আর কেতো দূর নবান বেলা ?
ওরে, ঐ আসে ঐ নবান্ আসে।
যত অস্ ধানের শীষে !
সামাল সামাল চালাস্ হাত !
কাটিম্ জমিন্ তবেই ভাত।

এইভাবে একজনের নেতৃত্বে ধান কাটতে কাটতে চাষীরা এগিয়ে চলে গতি পেয়ে উত্তরবঙ্গের মাঠে মাঠে।

গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েদের মতো উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মেয়েরাও ঢেঁকিতে ধান ভানার সময়ে নানাধরনের গান গায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে। একটি গান তুলে ধরছি এখানে—

'হামরা ধান ভানি আর গান করি।
তালৎ তালৎ পা ফেলি।

আলুনি তুই নজর সিধে আখ্।
হাত আখিস ঠিক্ ঠাক্।
নাগলি হাতে পরাণ যাবে।
ধানভানা কাম্ বন্ধ হবে।
আলুনি তুই নজর সিধে আখ্!
হাত আখিস্ ঠিক ঠাক্!
হামরা ধান ভানি আর গান করি।
তালৎ-তালৎ পা ফেলি।

(আলুনি—যে ধান এলে দেয়, তালৎ—তালে)

২ (ক) ওঁরাওদের বিবাহ গীতি :

ওঁরাওদের বিয়েতে সাধারণত খুবই সাদা সিধে অনুষ্ঠান হয়।

(ক) একটি গানে বোন দুঃখ করে বলছে যে দাদা তাকে বিক্রী করে ঋণের বোঝা কামচ্ছে—

আম্বারে, আম্বা শেরগো!
বহিন বেইচ্যা ঋণা শোধায়।
বাবুরে নিবা বুঝিয়া।
বহিন বেইচ্যা ঋণা শোধায়
যেইছা মুকুল যায় ঝরিয়া।
তেইছা বহিন বেইচ্যা-ট্যাকা যায় উরিয়া।

অন্য একটি গানে মেয়ে বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে সাজানো মণ্ডপ করে বিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'বাবা মোরা মাড়ওয়া ছান্দায়।
ঝিলিমিলিরে মাড়ওয়া।
আয়ো মোর পেষালায়
হাঁসা জুড়িরে প্রে।

(বাবা কতো সুদর ছায়ামণ্ডপ সাজিয়েছে। মণ্ডপটি ঝলমল করছে। আর মা হাঁসের ছানার মতো করে তাকে মানুষ করেছে।

২ (ক) সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিয়ের গান :

এদের খুবই সাদা সিধে বিয়ে। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ হলে বরযাত্রীরা বরকে নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে যায়। সিঁদুর দান হলেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। চলে খানা পিনা। পরের দিন বৌ নিয়ে বর চলে যায় নিজের গাঁয়ে।

(ক) একটি গানে বলা হচ্ছে—

মারাং নড়া তালারে চেন্দা
জুরিয়েম রারাক কাণা।
সাতী সাও রীরে সাপকাতে রারার্ক
তেঞ লায়য়াম কাম্‌।
সারিগে করিনিঞ বারেঞ্চ কেডা।

(খ) কন্যা বিদায়ের দৃশ্যটিও করুণ। গানের মাধ্যমে ফুটে ওঠে সেই কারুণ্যের সুর—

রাসি আতেরেন কুড়ি কানাম।
রে রনি আতোরে পাড়াওনা।
রনি আতো নালম দিঁশে গাঁতি দিয়া—
ছাড়াও সে।
হড়ম আলম চিলে দায়াম এঁড়ে—অ।

(বড় গাঁয়ের মেয়ে ছিলি এখন পড়লি ছোট গাঁয়ে। সব মেলা মেশা ছেড়ে দিয়ে নিজের শরীরটা ঠিক রাখিস্‌।)

২ (ক) মুসলমান বিবাহ গীতি :

গায়ে হলুদ, থুবড়ো খাওয়া, মেহেদি মাখানো, বিয়ের অনুষ্ঠান, বাসর এবং কন্যা বিদায়ের মধ্য দিয়ে বিয়ে শেষ হয় মেয়ের বাড়ীতে। মেহেদী মাখানোর গান—

১। মেহেনদি তুলতে গেনু
পায়ের তোড়া হারাইনু।
বেগম মেহেদার তলেরে,
চিকু মেহদার তলে।

২। রাইতকায় বিহারে বেলা দশটা বাজিল রে!
বিহা আসিবে কি আসিবেনারে কিই-ই।
কাঁহা গেইল ব্যাটারা ?
বিহা পড়াই বা কি পড়াই ঘানারে কিইই।

(৫) পূজাশ্রয়ী লোকসঙ্গীত :

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানাধরনের লোক সঙ্গীতের প্রচলন আছে। মনসার পূজার সময়ে বা রামনবমী ও কার্তিক পূজার সময়ে, তিস্তাবুড়ী, গ্রাম দেবতা বা মহারাজার পূজা উপলক্ষ্যে ও নানাধরণের গান গাওয়া হয়ে থাকে। তবে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে যে মনসার পালা গান গীত হয় বা রামনবমীতে যে আবায়ন বা কুষাণ গান হয় তা অবশ্য পালাটিয়া গান।

তবে রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়া আদিবাসী সাঁওতাল বা ওঁরাওদের মধ্যেও নানা ধরণের পূজাশ্রয়ী লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে উত্তরবঙ্গে।

যেমন—(১) করম পূজার গান—(সাঁওতালী)

"দাইনা দাই দেনা সে দাইনা ওডোং দেদ্দাম।
হাতিলেকান পরব দাইনা, দাবা কান্দ।
দাইনা দাই দাবাং দাই, দেনা সে দাইনা
ও ডোং লোনম্।
হাতি লেকান্ পরব দাইনা, আডাং আদের মে।

অর্থাৎ হাতির মতো বড় পরব এসে গেল। সকলে আনন্দে মেতে ওঠ। সকলে মিলেমিশে ঐ পরবকে অভ্যর্থনা কর।

ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'করম' পরবে যথেষ্ট উল্লাস ও উন্মাদনা দেখা যায়। গানও গায় ওঁরাও ছেলেমেয়েরা।

২। "বারো মাইনাসে আইলারে কারাম।
নোহারি কারাম, দোহারি কারাম্, তে হারি কারাম।
সাওয়া রোকে, বাড়ী দাগা দোলরে কারাম্।
নোহারি কারাম, দোহারি কারাম, তেহারি কারাম্।"

অর্থাৎ—বারো মাসের পরে তুমি এসেছো কারাম। একবার দুবার, তিনবার হয় কারাম উৎসব। হে কারাম তুমি বৎসর পরে এসেছো, এসো আমরা এক সাথে মিলিত হই।

এরপর কারাম গাছের নির্দিষ্ট ডালটি কে শুদ্ধ চিত্তে পূজো করে সিঁদুর, ফুল, ফল, দুধ, বাতাসা, ধূপ প্রভৃতি দিয়ে। তারপরে দলবদ্ধ ভাবে শুরু করে নাচ ও গান।

৩। আখেড়া খোলালেন কৃষ্ণ, জাগাওয়া হে,
জোড়ারে মান্দেরা সরস্বতী।
বাবা যে পূজায় লালা মুরগা সরস্বতী।
মালিনী হে, আয়ো পূজায় ধূপ সিন্দুর।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ খেলার আখড়া বা জায়গা করে দিয়েছেন। হে আখড়া তুমি জাগো। বাবা লাল মুরগা দিয়ে পূজা দেবেন এবং জোড়া মাদলের বাজনা বাজাবেন সরস্বতী। মা ধূপ সিন্দুর দিয়ে পূজা দেবেন।

নাচ গান এবং পূজানুষ্ঠানের শেষে বিদায় নেবার কালেও যুবক যুবতীরা গান গায়—

৪। আখেড়া বন্দনা খুড়ি মালিনী
তবে রে বান্ধালায় গণপতি।
দয়াকর দেবী সরস্বতী।
যে ছাড়ে আগে আখেড়া
তাকে ধরে লাকেড়া।

আখেড়ে বন্দনা বজ্র নারী।
দয়াকর দেবী সরস্বতী!

আমরা আখড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি গণপতি সরস্বতী দয়া কর। যে আগে ছেড়ে যায় তাকে অপদেবতায় ধরে। আখেড়ার বন্ধন বজ্রকঠিন। হে দেবী সরস্বতী দয়া কর।

পূজানুষ্ঠানের সময় বা বিসর্জনের সময় এই গানটি গায় ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে—

৫। ছাম্ ছাম্ পায়েল বাজেরে।
এগরিয়া আলেতো নাদী কিনারে
ঝম্ ঝম্ নূপুর বাজেরে।
একজন পরী আসে নাদী কিনারে।

আবার এই গানটিও গায় অনেকে—

৬। "আজিতো আলে কারাম নাচাতে হাসাতে।
কালি যাবে কারাম গাং নিপারে গঙ্গার পারে।"

(৬) বন্ধু পাঁচালী :

উত্তরবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন অংশে একধরণের হাল্কা সুরের পল্লী গীতি প্রচলিত আছে এগুলিকে বলা হয় বন্ধু পাঁচালী। প্রিয়তম বন্ধু বান্ধবদের উদ্দেশ্য করেই এই গানগুলো গাওয়া হয় বলে এইসব গানকে বলা হয় বন্ধু পাঁচালী। এই বন্ধু পাঁচালীর মধ্যে বিরহ-মিলন গাথা যেমন থাকে তেমনই সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও স্থান পেয়ে থাকে।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ও 'কুমার গঞ্জ' অঞ্চলের একটি বিরহ মূলক বন্ধুর পাঁচালীতে বিরহিনী নারী প্রিয়জনকে আহ্বান করে বলছে—

১। ও, ভাবের বন্ধুরে, বারেক আসিয়া মোক্
দেখা দিয়া যান!
তোর জন্য মুই দৈ পাতা সুরে।
জলপান করিয়া যান্ রে
মুই নারীটা মুন্টেজ চূড়া
মুই মুড়ি বাতাসা রে।
মুই নারীটার পুরাও আশারে।
ও, ভাবের বন্ধুরে, বারেক আসিয়া মোক
দেখাদিয়া যান।
তুই হলিরে নয়া কবিরাজ
মুই নারীটার ছারিলরে আশ।
নয়া পীরিতি মোর করিল সব্বনাশ!

ও, ভাবের বন্ধুরে বারেক আসিয়া মোক্
দেখা দিয়া যান।

ঐ অঞ্চলের অন্য একটি গানে পূর্ণিমার রাত্রে প্রিয়তমার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুকের মধ্যে হু হু করে উঠছে তাই বন্ধু বলছে—

২। ধাই ধাই পূর্ণিমার দিন্‌কা
মুই না যাছু পাঞ্জি কাটিবা।
পাঞ্জি কাটিছু আর মনডারে বুঝাছুরে
মন্‌ডা তবু বাধা মানে না রে।
রসিয়া বন্ধু মোক্ মোহানি করিছেরে।
বুকের মাঝত্ অঙ্গার জ্বলে চক্ষুতে নাই নিদ্!
এমুনি চাঁদের আলোয় মন আওলায় রে।
পাপিয়া মন্‌ডা মোর হিয়ল হয় নারে।
হায়রে হায় মনডারে মোর বাধা মানে না।
রসিয়া বন্ধু মোক্ মোহানি করিছে রে।

অন্য একটি গানে দেওরের জন্য বৌদির ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে যেহেতু সে দূরে চলে যাচ্ছে—

৩। ওমোর ভাবের দেওরা রে।
আজি হতে যাছে মোক্ ছারিয়া।
ওমোর ভাবের দেওরারে।
কায় ডাকিবে মোক্ ভাউজি বলিয়া?
ও দেওরারে তোর ওপর মোর বরই আশা।
ওতোর কইন্যা জুরিবা।
মনের আশা রহিল মনে।
ও তোর মুখত কুড়া দিবা।

৪। আজি ফুল ফুটিছে ফুলের বাগানে
ভমর বিনা ফুলের মধু যাছে বিফলে
আজমুই হছু দাদা গোলাপের ফুল গো
তুই হলিগে কাজল ভমরা।
ভমরা হয়ে গোলাপ মধু খানা বসিয়া।

(৭) ব্যাঙ্গাত্মক সঙ্গীত :

বন্ধুর পাঁচালীর পাশাপাশি ব্যঙ্গাত্মক গানের ও প্রচলন আছে উত্তরবঙ্গে। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুই ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়ে থাকে। যেমন এই গানটিতে আধুনিক ছেলে মেয়দের আচার আচরণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে চটুলসুরে—

১। 'বাঁইচা যদি থাকি ভাইরে
দেখুম কলির কতুই ব্যবহার।
বাইকে কইর‍্যা গোবর ফ্যালান্
বাপকে করেন চৌকিদার।
দেখুম কলির কতুই ব্যবহার!
দেখছি যতো মাইয়্যার ধারা
নাল ফিতাতে চুল বাঁধিয়া তারা
আইতের বেলায় বেড়ায় ঢুরে
ও ভাই সারা শহর ঘুরে।
বাঁইচা যদি থাকি ভাইরে
দেখুম কলির কতুই ব্যবহার!"

অপর একটি গানে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে এইভাবে—

২। ও ভাইরে ভাই, সাধের বাংলা মোদের গেল অসাতল।
সরিষার ত্যালের বাতি জ্বালি কাটাই সারা আতি।
গ্যাসের ভারে বাংলা মা আজ হছুরে দুর্বল।
ও ভাইরে ভাই, কুথায় যাছে আইজ বাঙালী জাতি।
বড় নোকেরা পায়ে হাঁটেনা চড়ে ইস্কাগারি।
মাস্টার মশাই স্যুট পিইন্ধ্যা ছোটে সাইকেলে।
ইস্কুলেতে পড়ান ওরে জামার বোতাম খুলে।
ও ভাইরে ভাই, সাধের বাংলা গেল অসাতল।
শিক্ষার নামে অশিক্ষা সব পাচ্ছে ছেলের দল।
আইন কানুন নেই কো দেশে।
সব জিনষের দাম আকাশে।
গুরুজনদের মানে না কেউ
সবাই মোড়ল সাজে।
সাধের বাংলায় একিরে ঢেউ।
হায় হায়, বাংলা যে যায় মজে!

অসহায় নিরাপরাধীদের জেলে পোরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এই গানটি—

৩। ওই দারোগা বাবুগে
ওমোক না দেনগে জেহেলে?
কায় আছেতে বাবু নোক জামিন করিবে?
মুইযে বড় গরীব বাবু গে
দোষ না করি ও মুই বাবু দোষী গোহনু।

বিনাদোষে চোর সাজিনু।
ও দারোগা বাবুগে পায়ে ধরি তোর।
নাদেন গো জেহেলে।

দারোগা—চল্ চল্ চল্ চোর ব্যাটা তুই নেতার হুকুম আগে। চল্ চল্।

অপর একটি গানে বিড়ির মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে এবং কিভাবে ছেলে বুড়ো বিড়ির মহাভক্ত হয়েছে তা নিয়েও কটাক্ষ করা হয়েছে এই গানটিতে—

৪। 'বাংলা দ্যাশের বিরি ও ভাই চলছে বলি হারি।
মনের সুখে টানছে ও ভাই কতুই নরনারী।
আগের দিনে খাইত হুকা খাইত নাকো বিরি।
এহন দ্যাকো বিরিছারা বেজার নরনারী।
বাবা-মায়ের ধার ধারে না টানছে বিরি সুখে।
চলছে কেমুন বিরির দুকান কালিয়াগঞ্জের বুকে।
মাইক দিয়া হাট বাজারে করছে দুকান দারী।
মাইক শুইন্যা কিনছে বিরি কতই বুরা বুরী।
বিরির তরে বাপের তবিল করছে ছেলে চুরি।
মাইয়া ছেলে হাট বাজারে টানছে দ্যাকো বিরি।
পান মুখে সব রাঙা ঠোঁটে দিচ্ছে বলি হারি!
মনের সুখে টানছে বিরি কতুই নর নারী।

অন্য একটি গানে কিছুটা অশ্লীলতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

৫। মোহ সারকেল চলাম্ গে।
বন্ধুরে তোর সীটের উপর চরিয়া।
আগা-পাছা দুডা সারকেল চাকা
তিন ফেরেঙ্গা মধ্যি ফাঁকা।
মোহ্ সারকেল চলাম গে।
বন্ধুরে তোর সীটের উপর চরিয়া।
মোহ সারকেল চলাম গে!

বেশ নাটকীয় ভাবে চার পাঁচজনে বারমাসীর আকারে কোন কোন গান গায়। ঐ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ঐ ধরনের একটি গানে দেখা যায় মূল্য বৃদ্ধির ওপরে কটাক্ষ করা হয়েছে—

৬। প্রথমজন গায়— বাপরে এবার মাংগা গেলরে—বৈশাখ জৈষ্ঠ মাস।
হায় হায় রব উপোস গেল ভাইরে চারিপাশ।
চেলটু বেচায় হারি-ডোকা, লেল্টু বেচায় ছাগল-ভেরা।

খুটা খুটি বেচায়রে সর্ব বেচায় বাঁশের বেরা।
হায়, হায়রে কাইল হৈল দারুন জৈষ্ঠ মাস।

দ্বিতীয়জন গায় অঙ্গভঙ্গী সহকারে—

আলির কচু খুরিয়া খাইলাম হায়,
খাইলাম কলার লগারে ভাই।
হায়, হায় ইবার মরণ দশা।
প্যাটের ভোগে ছাওয়া কান্দেরে
ছারিয়া নিঃশ্বাস।
হায়, হায় কাইল হৈল আষার শ্রাবণ মাস।

এবার তৃতীয় জন অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাইতে শুরু করে—

তিন ট্যাকা চাউলের কেজী, আড়াই ট্যাকা আটা,
ত্যাল-চিরা-গুর সবই আগুন মাথাত্ দিনু হাতা।
মাঠ-ঘাট ডুবিল ওরে, ডুবিল চাষ বাস।
হায়, হায়, কাইল হৈলরে ভাদর-আশিন মাস।

এবার এগিয়ে আসে চতুর্থ জন, শুরু করে—

আটা খাইলাম, মাইলো খাইলাম,
খাইলাম কতো পচা চাউলের ভাত।
সেসব খাইয়া দিনে আতে প্যাট করে ভুটভাট্!
চেরকা সারা হাগা হৈলরে খাইয়া রেশানের ভাত!
হায় হায়রে কার্তিক মাস।

এবার আসে পঞ্চম জন। শুরু করে নাটকীয় ভঙ্গীতে—

মাইয়া কান্দে, ছাওয়া কান্দে,
কান্দে আরশী-পরশী!
হায়, হায়, হায়, ইবার উপায় কি?
বাপ্রে, ইবার মাংগা গেল হায় সর্ব্বনাশ!
হায়, হায়রে, কাইল হৈল দারুন অঘান মাস!

এই পর্য্যন্ত করুণ রসের প্রাধান্য। তার পরেই দল বেঁধে মাছ হাতে ঝুলিয়ে সমবেত ভাবে গাইতে শুরু করে—

ওরে, ও ভাইরে ভাই,
আর তোরে ভয় নাই।
এবার সবার জুরায় পরাণ
ঐ দ্যাকোরে এলো যে নবান।

এই পর্য্যায়ের গীত গুলির সবই উত্তর দিনাজ পুরের কালিয়াগঞ্জ থানার ভেউড়, তরঙ্গপুর, মোস্তাফানগর, ও আখানগর থেকে সংগৃহীত।

উত্তরদিনাজ পুরের চোপরা থানার জালালগছ থেকে সংগৃহীত একটি গানে আধুনিক ঘড়ি পরা মেয়েকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এইভাবে—

৭। এইডা হইল ভাই বঙ্গের দুনিয়া। দেখুম কতুই দুচোখ খুলিয়া।
ওরে, গাভুর, গাভুর, চেংরিলা। হাতত ঘরি চোখত চশমা।
ওরে গাভুর গাভুর চেংরিলা। কপালত দিছে টিকলির ফটা।
ঘারত একটা ঝুলায়লেছে বেগ! চেংরা থাকিতে চেংরির বড়ই সুখ।
ওভাই আজি কালি চেংরী গিলা নইজ্জা শরম কিছু করে না।
কাপড়ার নামে চুরিদার পরি চালাছে সারকেল।
চেংরার গোরত যাইয়া চেংরী জোরে বাজায় বেল।

অন্য একটি গানে আধা বয়সী বুড়োর আচরণে বিরক্ত হয়ে মাকে বলছে মেয়ে—

৮। ওমোর মাইয়োগে বাগান যাবার মানায়না। মোক দেখিয়া ঠাট্টা করে চেংরা।
চেংরা বুড়া আধা বয়সা মোকেগে দেখে। ইরিং বিরিং ভাবের কতা কয়া।
সেই না শুনে মনের ভিতির আগুন গে জ্বলে। মুই আর একা বাগান যামু না।

(৮) বিলাপ গীতি :

যে সকল লোকগীতির মধ্য দিয়ে স্ত্রী বা পুরুষের হৃদয় বেদনা বিলাপের আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে সেই সব লোকগীতিকেই বলা হয় বিলাপগীতি। সাধারণত বারমাস্যা জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই ধরণের বিলাপ প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাংলা লোকগীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো বিলাপগীতি বা বারমাস্যা। বারমাসের হৃদয় বেদনা প্রকাশ পেয়ে থাকে এই ধরণের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।

সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে মাস গণনার রীতি থাকলেও বারমাস্যাতে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। জৈষ্ঠ্য বা যেকোন মাস থেকেই বারমাস্যা শুরু হতে পারে বা হয়ে থাকে।

প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিনী নারীর মানসিক অবস্থার করুণ ছবি প্রাকৃতিক ও সাংসারিক পটভূমিতে করুণ সুরে বর্ণিত হয়ে থাকে এই সব গানের মধ্য দিয়ে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও বারমাস্যা জাতীয় বিলাপ গীতির প্রচলন আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নিম্নের এই বারমাস্যাটিতে এক প্রোষিতভর্তৃকার হৃদয় বেদনার ছবি তুলে ধরা হয়েছে—। এখানে বৈশাখ নয় জৈষ্ঠ্য মাস থেকেই নায়িকা তার কাহিনী শুরু করেছে দেখা যায়।

১। "ওরে, কতো পাষাণ বান্ধিছে মোর পতিধন মনেতে।
সুখের সময় পতি মোর রৈলেন বৈদেশে।
জৈষ্ঠ্য মাসের মিষ্টফল আযারের বারি।

শাওন মাসের ঘন ম্যাঘে রইতে ঘরত নারি।
শয়নে সপনে পতি পাষাণ ভারে মনে।
ভাদরেতে বইন্যার শ্যাষ মরি যে আশ্বিনে।
ওরে কার্তিক মাস যায় যে বিথা ভাবিতে ভাবিতে!
সুখের সময় পতিধন মোর রৈলেন বৈদেশে।
ওরে, অঘান মাসের নয়া ধানরে,
পৌষে জুরায় নারীর পরাণ রে!
মাঘ মাসটা গেলরে মোর রন্ধনে-বন্ধনে।
সুখের সময় পতিধন মোর রৈলেন কুনখানে?
ফাগুন মাসের দ্বিগুন জ্বালারে।
চৈতেতে মোর বদন কালারে!
বৈশাখ মাস গেলরে মোর শুধুই দীর্ঘশ্বাসে।
সুখের সময় পতিধন মোর রৈলেন বৈদেশে!

চা বাগানে সুপার ভাইজাররা কিভাবে মেয়েদের প্রলুব্ধ করে তার একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে চোপড়া থেকে সংগৃহীত এই গানটিতে—"

২। "ও, মালিক বাবুগে, চা বাগান ডাত, আগুন নাগিছে।
সুপার ভাইজার মনশ্বরী মাই ডাক জাপকেটায় ধরিছে।
আজি যদি মনশ্বরী মোর কথা আখিবা।
গন্ধতেল, সাবান মাখিয়া বেড়াবা।
মাইগে কাণত দিম তোর কাণ-মাকরী
গলায় মালা হাতত চুরি।
আরো দিমু হিমানী বটুয়া।
ও মালিক বাবুগে চা বাগান ডাত আগুন নাগিছে।

উত্তরবঙ্গের ইটাহার থানার মনসাপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি বিলাপ গীতিতে স্ত্রীহারা স্বামীর বেদনার্ত হৃদয়ের ছবি ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত ভাবে। এটি বারমাস্যা নয় নিছক বিলাপ গীতিই।

৩। "ও, মুই বেড়াও যে কান্দিয়া।
ও, মুই বেড়াও যে ভাবিয়া।
গুণমান নদারী মোর গেলেন ছাড়িয়া।
মোর নদারীর এমনি যেগুণ
গরম ভাতে না নাগে নুন।
ডাল তরকারী আন্ধিলে হায় নুনতো নাগেনা!

ও মুই বেড়াও যে কান্দিয়া!
মোর নদারী ছাড়িয়া গেইল বুকেতে শেল হানি!
একলা ঘরে শুইয়া থাকি চক্ষে ঝরে পানি!
ও কি, টাপ্‌পাস্, কি টুপ্‌পাস্ কি টুপুস্ করিয়া।
নদারী টা মরিয়া হায় মোক্ দিলরে দুখ।
নদীরপার যেমনু ভাঙে তেমুন ভাঙে বুক্।
ও কি, চাওলাত, কি চুওলাত্ কি চাভাউ করিয়া।
শাওন মাসে মনডা যে মোর যায় বাহিরিয়া।
ও কি মোচৎ কি মাচাৎ কি মাচাও করিয়া।
ও, মুই বেড়াও যে কান্দিয়া।
ও, মুই বেড়াও যে ভাবিয়া।
গুণ মণি নদারী মোর গেলেন মরিযা।

(নদারী—স্ত্রী)

তবে এই ধরণের গান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে বহু সংখ্যায়। এই সংগীতটির রচয়িতা মনসাপুরের সুবোধ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি সুরও দিয়েছেন এই গানটির। নিজে গেয়েও শুনিয়েছিলেন এই গীতটি তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে। এমন বহু গানই রচনা করেছেন সুবোধ বাবু এবং সুরও দিয়েছেন। লোক গীতির সংগ্রহে তিনি যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন তার জন্য তাঁর প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

চাকুলিয়া অঞ্চলের একটি বিলাপগীতিতে নায়িকা বিলাপ করছে এইভাবে—

৪। ওমোর চিকন কালারে। সাদা কাপরে দিলি কালিরে।
ধুইলে পরে নাযায় কালি। সাদা দিলে দিলেন কাদারে।
আগে যদি জানতাম কালারে। তোর সনে মুই ভাব না করিরে।
অল্প বয়সে পিরীত কইর‍্যা এখন মরিরে!
কুথায় গেলেন ওমোর প্রাণের বন্ধুরে!
আগে যদি জানতাম তুমার মনের কথা রে
না করিতাম ভাব মুই তুমার সনেরে।
ও মোর চিকন কালারে। একলা থুইয়া কুথায় গেলেন রে।

(৯) ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি :

উত্তরবঙ্গের ওঁরাও সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীরা নানাধরনের গান গেয়ে থাকে। এদের গানের সুর সহজেই হৃদয়ে রেখাপাত করে। একটি ছড়াধর্মী লোকগীতিতে এক যুবতী তার বান্ধবীকে বর্ণনা দিচ্ছে একটা ঘটনার—

১। দাদা কূয়া খোড়েলা
ভাউজি পাণি ভরায়লা।

হারিও কে মোক্ লেবদায়লা।
এক পাকালা ডুম্বুরি গিরেলা।

যখন দাদা কুয়ো খুঁড়ছিল এবং বৌদি জল ভরছিল তখন সে আমার দিকে ঢিল ছুড়ছিল এবং ঐ ঢিল আমার গায়ে না লেগে ডুমুর গাছে লেগে একটা পাকা ডুমুর পড়েছিল।

অন্য একটি গানে এক যুবতী অন্য এক যুবতীকে পুকুর পাড়ের গাছের লাল লাল ফুল তুলে মাথায় গোজার জন্য আহ্বান করছে—

২। পোখরার পিড়িয়ায
একো গাছে চাম্পায়
কেতো ফুল লালে লাল!
চালু চালু সাওরো তরা তব সাঁঝি খান্।
কেহ নাহি দেখ্ ভাল।
মুঠা মুঠা তরাব্।
খোপা ভরি পইরাব!
কেতো ফুল লালে লাল
চালু চালু সাওরো—তরাতব সাঁঝি খান্।

অপর একটি গানে মমতাময়ী বৌদির সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে দেখা যায়—জলে হারিয়ে যাওয়া ননদের গহনা সে গড়িয়ে দেবে বলছে—

৩। ধওয়ায়াতে নানাদো।
মাঞ জায়াতে নানাদো।
ডুবিরে গেলা, ডুবি গেলা।
হাথাকা বাজুয়া ভালা।
ডুবিরে গেলা, ডুবি গেলা।
গোড়াটা ঝুটিয়া।
মাতি কান্দু নানাদো।
মাতি রুহু নানাদো।
হাথেরে দিব হামে দিব।
গড়াকা ঝুটিয়া ভালা!
হামেরে দিব, হামে দিব।
হাথাকা বাজুয়া দিব!

অন্য একটি লোকগীতিতে পল্লীবধূদের জল আনতে যাবার মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিদিন তারা মাথায় করে দূরের পুকুর থেকে জল আনে আজ একটা স্বচ্ছ জলের দীঘিতে তারা জল আনতে যাচ্ছে এবং সুর করে গাইছে—

৪। দারা বারি খোড়ালা।
আউরা পুখুরিয়া ভালা।
চালাগে চালাগে গাং যমুনা পানি ভরায়লা!
ঠিঁউনা বারি খড়ালা।
আউরা পুখুরিয়া ভালা।
চালাগে চালাগে গাং যমুনা পানি ভরায়লা।
ঘচা বারি ঘোড়ালা।
আউরা পুকুরিয়া ভালা।
ঘুড়ি বারি ঘোড়ালা।
আউরা পুকুরিয়া ভালা।
গাং যমুনা পানি ভরায়লা।
চালাগে চলাগে গাং যমুনা পানি ভরায়লা!

একটি গানে মামা ভাগ্নের বৃন্দাবনে যাবার কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে দেখা যায় এইভাবে—

৫। মামা হু বলে ভাগিনাহু বলে
গই বিন্দাবনে।
মামা ভাগিনার এসানা পিরীত
দোজনাই গই বিন্দাবনে।
মামাকে দিব লাটা পাটা পাগড় গই।
ভাগিনাক্ দিব লেলা ঘোড়া।

একটি গানে কলকাতা আর দার্জিলিঙে গিয়ে যে রেলগড়ী আর উড়োজাহাজ দেখে এসেছে তারই বর্ণনা দিচ্ছে দেখা যায় জনৈক যুবক—

৬। কালকাতা কাল বারি। কালকাতা কাল বারি।
মাইয়া উড়াজাহাজ কালা লাগি!
দারজিলিং কালাবারি।
কিয়া মজার রেল গাড়ী।
মাইয়া উড়াজাহাজ কালা লাগি!

অপর একটি গানে একটি সম্মেলন বা-সভায় যাবার জন্য সবাইকে আহ্বান করা হচ্ছে এইভাবে—

৭। "আজিকা দিনে সোনে কামাল ফুটে।
মধুমাছি উড়ে।
কেকার শাবাদ সুন্দার বাজে।
গাই মাঙ্গাল রাধে।

জ্ঞানীমান পুছা যায় পণ্ডিত মান কাহা যায়।
ওরেই সভামে কেকার শাবাদ সুন্দার বাজে।
গাই মাঙ্গাল রাধে।
চালা ভাই শুনালাতো সভা।
কেকার শাবাদ সুন্দার বাজে।
গাই মাঙ্গাল রাধে।

(সোনে কামাল—সোনার পদ্ম), আজ মনে হচ্চে সোনার পদ্ম ফুটেছে। ফুলের মধু খেতে এলে মৌমাছি যেমন গুণগুণ শব্দ করে তেমনই শব্দ উঠছে সভাতে কেননা এই সভাতে জ্ঞানীরা প্রশ্ন করছে পণ্ডিতরা উত্তর দিচ্ছে। যে সুন্দর প্রশ্নোত্তর চলছে তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাধে মঙ্গল চলো ঐ সভাতে যাই।)

উত্তর ও দক্ষিন দিনাজ পুরের চোপড়া ও কুশমণ্ডী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোক গীতিগুলির মধ্যে যেমন ভাষার সারল্য দেখা যায় তেমনি উপমাগুলোও পরিচিত জগৎ থেকেই নেওয়া। সুরের মাদকতা মনকে আচ্ছন্ন করে। বাংলা ভাষার প্রভাবের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় এদের সঙ্গীতে।

এগুলি সংগ্রহে চোপড়ার সন্ধ্যা ওঁরাও এবং কুশমণ্ডীর মালতী কুজুরের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

(১০) সাঁওতালী লোকগীতি :

উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল সমাজেও নানা ধরণের লোকগীতির প্রচলন আছে। একটি গানে সিধু কানুর জয়গান করা হয়েছে—

সিধু কানু খুর খুড়ি উপরে।
চাঁদা ভায়রো ঘোড়া উপরে।
দেখ সেরে চাঁদা ভায়রো।
ঘোড়া ভাইরো মুলিনে মুলিন।

বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবলম্বন করে রচিত সুন্দর একটি গান সেই সময়কার পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—গানটা হলো—

পূরব পূরব দিশম্ শেখ রাজা।
পছিম পছিম দিশম্ খান্ রাজা।
ঢাই ঢুই ঢাই ঢুই কিন্ লড়াই হাইয়েন।
দিশাম্ দিশাম্ কিম্ ডামা ডোল কেৎ'?
হড়কো হড়কো কোঞ্রির কান্।

ভারত ভারত তেকো বল চাপায়েন।
বীরকো বীরকো কো লাড়াই হাইয়েন।
দিশাম্ দিশাম কো স্বাধীন রূয়াড় কেৎ।

(পূর্বে শেখ মুজিবর পশ্চিমে খানরা। মাঝে ভারত। খুব লড়াই হলো। ভারতের ওপর চাপ পড়লো দেশ স্বাধীন হলো।)

একটি গানে কর্মচঞ্চল মৌমাছিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—

এ দুমুর ইঞরেন গাতে।
থকাতে চ-এসকার সেতাঃ রে।
হাপে ইঞ হোঁ তাং গিঞ মে।
বাগোয়ানরে বাহা সাড়াকান।
রাসা আগুঞ চালাং কান ;
চাক আমদঞ তাং গিসেয়া

অর্থাৎ 'ওরে মৌমাছি বন্ধু আমার এত সকালে একা একা চলেছো কোথায়'? থামো ভাই আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। মৌমাছি বলে ; 'আমি ফুলের বাগানে মধু নিতে যাচ্ছি তুমি কি করবে আমার সঙ্গে গিয়ে ?

অন্য একটি গানে যুবকদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—

'আইবল সমাজ, ধীরি সমাজ।
বাগিয়াঃ তাবোন পে নওয়া সমাজ।
জাতি ধরম বোন্ হেয় কান্।
অলঃ পাড়হাঃ মেন লাহাঃ পে।
হান্ডি পাউরা বাগিয়া পে!
নাওয়া সমাজ বেনাও তাকিয়া পে!

অর্থাৎ নির্জীব গতিহীন এই সমাজ ছেড়ে লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো। মাদকদ্রব্য ত্যাগ করো। নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী হও।

অন্য একটি গানে আলোক লতার সঙ্গে যীশুর ওপরে নির্ভর করার তুলনা করা হয়েছে—

"হো দিদি দ্যাখহে আলোক লতা!
কেমুন সোন্দর লতারে দিদি।
গাছের ওপর আছে পড়ে।
হামগে দিদি হে দিদি!
এনকা লেখা হোম্‌ক
যতো ভাগুি যীশু এমাই সে!

একটি গানে দুটি মেয়েকে পায়রার সঙ্গে তুলনা করে বলা হচ্ছে—তারা পায়ে ঝুমুর বেঁধে সরষে খাচ্ছে—

মাঝিকো ছাট্কারে ডান্ডা।
জোখারাই ফুরিদারে আকাবা।
বাবা জগমাঝি ঢোকেই কোরেন বাউরা।
ঝুমুর তুরি কিন্ কাটিচেট ?
আলেরেন গেচো বাবা সানজিলি সান্জিলি।
হোলা রেকিন্ আগেনা কানা।

অন্য একটি গানে একজন অন্যজনের সঙ্গে আলাপ করছে এইভাবে—

"তোঁহ গুইয়া আনাড়ি।
মোহ গুইয়া আনাড়ি।
হামার দেশ বাড়িয়ে সোন্দার।
ঘোরা চালেলা।
লাগাম দিলা আচ্চা কুদেলা।

(তুমি আমি দুজনাই অচেনা। আমার দেশ বড় সুন্দর। ঘোড়া চলে। ঘোড়াকে লাগাম দিলে আচ্ছা ছোটে।)

অন্য একটি গানে আজকালকার ছেলেদের ব্যঙ্গ করা হচ্ছে—

আইজ কাইলকার ছুয়া-পুতা
শয়তান ডারায় না।
লিখা-পড়া বাদ দেইকে
মস্তান দেখায় না।

(১১) দেহতত্ত্বমূলক সঙ্গীত ও ধর্মীয় সঙ্গীত :

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের ইতিহাসে দেহতত্ত্বমূলক ধর্মীয় সঙ্গীতগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজেই ধর্মীয় সঙ্গীতের গুরুত্ব আছে। প্রাচীন মিশর-গ্রীস ব্যবিলন ও ভারতে দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের ভক্তিগীতির প্রচলন ছিল। ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এই ধর্মমূলক বা তত্ত্বমূলক সঙ্গীত সমূহকে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীত থেকে সহজেই আলাদা করে বিচার করা যায়। এই প্রসঙ্গে Fundamental of Folk Literature এ যে কথা বলা হয়েছে তা স্মরণ করা যেতে পারে— Spirituals are a valuable and beautiful kind of folk song readily distinguishable from other song. They differ on the one hand from secular song in that their purpose and subject matter are moral and religious and on the other hand from conventional hymns in that they are of the folk, having been handed down chiefly by word

of mouth. Their origin is probably as early as that of any other folk songs." (Page-163)

সবদেশেই ধর্মীয় বা তত্ত্বমূলক সঙ্গীত গুলো কখনো এককভাবে কখনো বা যৌথভাবে ভক্তি বিনম্রচিত্তে গাওয়া হয়ে থাকে। ঐসব গানে যেমন থাকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনের প্রয়াস তেমনি আবার দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেও গান গাওয়া হয়। ভজন গানে, বাউলে, কীর্তনে, বা দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দেবদেবীর কাছে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়ে থাকে। কখনো বা বাউল-দরবেশ বা সাধু সন্তর বেশে রহস্যের আড়ালেও গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় বা তত্ত্বমূলক গানে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আজো গ্রামের পূজা মণ্ডপে বা চালাঘরে পূজানুষ্ঠান বা বিশেষ শুভদিনে ভক্তিমূলক গানের আসর বসে। বাউল দরবেশরাও সেখানে গায়। ধর্মীয় গুরুগণ দেহতত্ত্ব বা গূঢ়তত্ত্ব মূলক গানের ব্যাখ্যা দেন। কীর্তনের আসরে ভাবের আবেগে বিহ্বল হয় ভক্তজনগণ, উদ্বেল হয় নরনারী ভজন ও দেহতত্ত্বের গানে।

এখানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ধর্মীয় ও দেহতত্ত্বমূলক সঙ্গীতের উল্লেখ করবো।

পল্টুদাসের একটি গানে মানুষকে করাতির সঙ্গে তুলনা দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যাতে সে ভুল না করে—

১। ও করাতি, তোর হবে কি গতি?
করাত ধরিয়া কেন ভাব তুমি অতি?
কুড়ালে করিয়া শিলিতিনজনাতে সূতার রেখা দিচ্ছে ধরি।
ঠিকনা হইলে তোর তক্তা যাবে বাঁকি রে।
ও করাতি তোর হবে কি গতি?
করাতি তুমি পচা দড়ির দিও নাটান।
ও হায় শিলি পড়িলে হারাবে পরাণ। (পল্টুদাস)

সংসার রূপ তক্তাতে ঠিক মতো করাত না চালালে অনর্থ ঘটতে পারে তাই করাতি যেন সতর্ক হয়। কুশমণ্ডীর পল্টু দাস কতো সহজ সরল ভাষায় গূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ করেছেন এখানে। এগানের তিনজনা হচ্ছে—দারাসুত কন্যা।

অন্য একটি গানে গভীর তত্ত্ব কথা বলেছেন কুশমণ্ডী থানার মণি কোরের গোঁসাই চাঁদ। রূপকের আড়ালে মূল সত্যকে চিনে নেবার জন্য আহ্বান করেছেন তিনি—

২। কি জেনে তুই হলিরে বাতুল, মূলেতে ভুল দেখ না বুঝে।
এমন কোটি জন্ম করলে কর্ম সহজে কি মর্ম পাবি খুঁজে?
ফুল তুলসী লয়ে করে মনের ভ্রমে পাথর পূজে।
আত্মত্যাগী করে পূজা, মূল নাচিনে যায় সে দূরে।
গুরুছেড়ে গোবিন্দ ভজে সেই পাপী নরকে মজে।

আসল সে জন অন্ধকারে ঠিক মূলকে চিনতে পারে।
গোঁসাই গুরু চাঁদে ভণে মূল্য চিনে নাও বর্তমানে।
নইলে রাধে শ্যামেরে পাবি কেমনে ব্রজেন্দ্র কাননে'?

অন্য একটি গানে রায়া নগরের বিনোদ দাস সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য গুরুর নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

৩। গুরুর ভাব-না জেনে গাছ কাটলে কি গাছি হওয়া যায়?
যুতের ঘরে বেযুত হলে রস পড়ে যায় গাছতলায়।
ওরে ভাবের গাছে উঠা বিষম দায়।
হঠাৎ যদি পাও ভেঙ্গে যায় আরতো রক্ষা নাই।
ও তুই নিজে মরবি কি পরকে মারবি বিষম লেঠা বেধে যায়।
ভাবের গাছ যেজন কাটে অনুরাগের মন দড়িতে গিরাদাও এঁটে।
ওরে, ভাবের গাছে উঠা বিষম দায়।
ভলারসে বীজ ওঠে না রাগ করে দাও ঢেলে ফেলে।
যেদিন রসের সংসার হয় শুক্না গাছি হইলে জানে
রসিক বিনোদ কয়।
তারা সুধারে রস বাহির করে, জল দিয়া মিসরি বানায়।

অপর একটি দেহতত্ত্ব মূলক গানে ভগবৎ প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়াস পেয়েছেন কুশমণ্ডীর রাধেশ্যাম দাস মহাশয়—

৪। দ্যাখ্লাম ভবের হাটে প্রেম বাজারে বিষম গণ্ডগোল।
কার বা কথা কেবা শোনে, আপন আপন বলছে বোল্।
প্রেম বাজারে যত ধনী তাদের কাছে প্রেমের খনি।
করে তারা স্বার্থলয়ে টানাটুনি মুখে কেবল মধুর বাণী।
যতো সব প্রেমের খরিদ্দার বাজারময় বেড়ায় ঘুরে।
কেউবা করে লাভ, কেউ বা হারে আসলে।
চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি, জয়দেব ও রামানন্দ,
পেয়েছিল প্রেমানন্দ আর পেল সে বিল্বমঙ্গলে।
দাস রাধেশ্যাম কয় গুরুচাঁদ গোঁসাই তব প্রেমের অন্ত নাই।
হয়ে প্রেমেরই কাঙাল ঘুরি আমি প্রেমেরই আশায়।

অপর একটি তত্ত্বমূলক গানে রামানন্দ গোঁসাই 'ময়না পাখী' না পুষে পেঁচা পোষার জন্য আপসোস করছেন।

৫। পুষতাম যদি ময়না পাখী, শুনতাম মধুর হরিনাম।
গুটুর কাণির বাচ্চা পুষে কেঁচ কেঁচিতে গেল যে পরাণ।
ময়না পাখী মনে করে পেঁচা পাখী আনলাম ধরে।
সেতো কৃষ্ণ নাম নাহি ধরে, কে শোনাবে হরি নামরে।

বহু আশা ছিল মনে, নাম শুনিব রাত্রি দিনে।
হইল না মোর হবার কালে বিধি হইল বাম বুঝি মনে।
গোঁসাই রামানন্দ বলে প্রাণে প্রাণে না মিলিলে।
পশ্চিমা বাঙালী হইলে মিলবে না প্রেম কোন কালে।

একটি ধর্মবিষয়ক গানে বিষ্ণু দাস গৌরাঙ্গকে হৃদয় কমলে অধিষ্ঠানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন—

৬। একবার এসো হে গৌর গুণমণি!
আমি মনের সাধে পূজবো রাঙা চরণ দুখানি।
এসো নিত্যানন্দ সনে গদাধরকে লয়ে বামে গৌরহে!
সমুখে অদ্বৈত প্রভু, দাঁড়াও হে আপনি।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হইয়ে পরমানন্দ—গৌর হে!
আমি পড়বো তোমার চরণতলে লুটায়ে ধরণী।
আসিয়ে মহীতলে কতো পাপী তরাইলে
দীন বিষ্ণু বলে থাকবো তোমার চরণতলে
একবার এসো হে গৌর গুণমণি!
আমি মনের সাধে পূজবো রাঙা চরণ দুখানি॥

অন্য একটি আধ্যাত্মিক গানে মোস্তাফা নগরের পল্টু দাশ শর্মা ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের পদে আত্মসমর্পণ করেছেন দেখা যায়—

৭। একবার এসোহে করুণা সিন্ধু, কাতরে ডাকি তোমারে!
তোমা বিনে পতিত পাবন, পাপীর গতি নাই সংসারে।
অগতির গতি তুমি, হৃদয় বিহারী।
সুধা সিন্ধু—ক্ষুধায় অন্ন—পিপাসায় বারি।
যে ডেকেছে কাতর প্রাণে সে পেয়েছে তোমার দেখা।
তবে অধম কেন বঞ্চিত নাথ রবে একা?
কৃপা করো মোরে কল্পতরু ছেড়োনা মোরে।
তুমি অধম জনের গুরু হয়ে পাপ হৃদয়ে ভক্তিদাও ভরে।
তোমার প্রেমকণাতে পার হয়ে যায় অবহেলে এই ধরণীর জীবকূলে জীব সময় হলে!
পাপানলে দগ্ধ হৃদয় দাও হে পদে দাও আশ্রয়!
এ হৃদয় শীতল করি—তোমারই কৃপায়!
অধম বলে করলে ঘৃণা—ঐ পদ তবু ছাড়বোনা আর!
চরণ দিয়ে নিস্তারো নাথ—অকূল পারাবার!

আরেকটি 'দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানে পল্টু দাশশর্মা গূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ করেছেন কতোই না সহজ ভাবে—

৮। আমায় নিয়ে চলো গুরু তোমার ঐ দেশে।
যে দেশেতে শুদ্ধ মানুষ আকাশে বাতাসে।

সেই দেশেতে একখানা হয় ঘর।
আট কুঠুরি নয় দরজা জানালা বিস্তর।
ঘরের খোপে খোপে আছে বেড়।
দুশো ছয়খানা হয় খাম
ওরে মন, ঘরের মাঝখানে তুই থাম!
চারি অঙ্গের একটি বাতি জ্বলছে অবিরাম।
বাতি জ্বলছে ধীরে নিভছে নারে।
রসিক সুজন সেই বাতিটি দেখতে পেয়েছে!
আমায় নিয়ে চলো গুরু তোমার ঐ দেশে।

ওরে, সেই দেশেতে একটি হয় বাজার।
তিনজন করে দোকানদারী দুজন খরিদ্দার!
সেথায় কৃষ্ণপ্রেম হয় বেচা কেনা।
রসিক সুজন কেনে বটে অন্যে জানে না!
বেচা কেনার ধরন দেখে অভক্ত পাষণ্ড হাসে!
আমায় নিয়ে চলো গুরু তোমার ঐ দেশে!

(ঘর—দেহ, আটকুঠুরি—অষ্টঅঙ্গ, ২০৬ খানা হাড়—দুশো ছয় খাম, তিনবিক্রেতা—সত্ত্ব রজঃ তমঃ, দুই ক্রেতা প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি।)

ইটাহার থানার মনসাপুরের সুবোধ চক্রবর্তী মহাশয় কলকাতা শহরের ট্রামগাড়ীকে কেন্দ্র করে যে আশ্চর্য্য গানটি বেঁধে বাউল সুরে আমাকে শুনিয়েছিলেন তরঙ্গপুরের সরকারী কোয়ার্টারে তা জীবনে ভুলবোনা। ট্রামগাড়ীকে কেন্দ্র করে কী অদ্ভুত তত্ত্ব কথাই না শুনিয়েছিলেন তিনি।—গানটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না—

৯। "দেখলাম কলকাতা শহরে
ট্রাম চলে যায় একতারে।
শিকের ওপর চলে গাড়ী।
তার টানা আছে ওপরে।
তিন ধারে তিন তারের টানা—
ইড়া পিঙ্গলা আর মধ্যে সুষুম্না!
কোন্ তারেতে গাড়ী চলে
তার গিয়েছে সহস্রারে।
কোন্ তারে টেলিগ্রাম ধরে।
কুণ্ডুলিনী ট্রাম চলে যায় কোন্ তারের বলে?
কোন্ তারে তার আগুন জ্বলে
বায়ু চলে কোন্ তারে!

ভেবে দ্যাখ্ মন তারের পরে এই দুনিয়া রয় খাড়া।
আঠারো মোকামের মাঝে আছে যে থাম গাড়া।
টিকিট চেকার হয় যারা।
তারের যোগে খবর করে তারা।
দেখলাম কলকাতা শহরে
ও ভাই ট্রাম চলে যায় একতারে।

বাউলরা মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায় দেশে দেশে। দেহাতীত প্রেমের পূজারী তারা। স্থূল মানব দেহের অভিমান বৃথা। সেই পরমাত্মার সন্ধানে ফেরে তারা। দেহের মধ্যেই দেহাতীতকে খোঁজে তারা।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে আজো যে সব স্বভাব কবি ও গীতিকার সহজ সরল ভাষায় গান রচনা করে-ও গেয়ে শ্রোতাদের মনে ভাবের জোয়ার আনেন তাদের মধ্যে আট জনের দশটি গীত এখানে তুলে ধরা হলো মাত্র। এমন গায়ক ও গীতিকার এখনো বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন বহু সংখ্যায়।

উল্লিখিত আটজনের মধ্যে কুশমণ্ডী থানার রুয়ানগরের রাধেশ্যাম বৈরাগীর নিজস্ব আশ্রম আছে। তিনি বাউলের বেশে একাতারা বাজিয়ে গানও গেয়ে থাকেন গ্রামে গঞ্জে। এখানে উল্লিখিত তাঁর গানটিও বাউল ধর্মী (৪নং)। বিনোদ দাস, বিষ্ণু দাস, গোঁসাই চাঁদ, পল্টু দাস, পল্টু দাশশর্মা, রামানন্দ গোঁসাই ও সুবোধ চক্রবর্তী মশায়ের তেমন বিশেষ পরিচিতি না থাকলেও এঁদের স্বভাব কবিত্ব এবং ভাবের গভীরতা ও কণ্ঠস্বরের নৈপুণ্য উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বহু মানুষের হৃদয়েই গভীর প্রভাব ফেলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। যেসব গান এরা রচনা করেছেন সেগুলি সত্যিই সুধী মহলের প্রশংসার দাবী রাখে।

এখানে আমার সংগৃহীত ৩১টি অধ্যাত্ম বিষয়ক গানের মধ্যে মাত্র ১০টি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকলাম গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কথা ভেবে।

উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত রাধেশ্যাম দাসের একটি গান দিয়ে এই অধ্যায়টির সমাপ্তি টানি—

১০। আছে মনের মানুষ নির্জনেতে সামান্যতে যায় না ধরা।
সেযে রসিক শেখর মন অগোচর কেমনে চিনবি তোরা?
ধরে গুরুর চরণ খানা নাও তার ঠিকানা জেনে।
নইলে তোরা পারবিনে কেউ পারবিনেরে
সেই অধরা সরবে দূরে—মনের অগোচরে।
অসারে মজলে পরে ভাগ্যে জোটে শুধুই যে তুষ।
টলাটল ছাড়া সে মানুষ, যায় না ধরা থাকতে যেভাই হুঁস্!
মন যদি বাসনা ছেড়ে মানুষ চাঁদের আশায় ফেরে,
সেইতো মানুষ ধরতে পারে, হতে হয় জীয়ন্তে মরা!
গোঁসাই গুরুচাঁদের বচন, রাধেশ্যাম, তোরে বলি শোনরে
মানুষ ধরা এই তিনলক্ষণ, সাধনা হলো তলা পারা।

উনবিংশতি অধ্যায়

লোকনাট্য

উৎস ও অভিপ্রায় :

লোকনাট্য বলতে সাধারণত লোক জীবনের কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত লোক নাটককেই বুঝানো হয়ে থাকে। বিশ্বের নানা দেশেই যুগ যুগ ধরে এই ধরণের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়ে আসছে। এইসব নাটকের মাধ্যমে একদিকে যেমন চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হয় তেমনই আবার লোকশিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। এই সব লোকনাট্যের জন্য আবার প্রয়োজনীয় পোষাক মুখোস ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম তৈরীর সূত্রে বিকশিত হয় লোকশিল্পও।

আমাদের দেশেও যুগ যুগ ধরে বহু লোক নাটক রচিত এবং অভিনীত হয়ে মানুষকে আনন্দ এবং শিক্ষা দুইই দিয়ে এসেছে। বাংলার অন্যান্য অংশের মতোই উত্তরবঙ্গেও বহুকাল ধরেই এই ধরনের বহুলোক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়ে একই সঙ্গে মানুষকে আনন্দ ও শিক্ষাও দিয়ে আসছে।

তবে উত্তরবঙ্গের লোকনাটক গুলো সবই যে লোক জীবনের কাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এমন নয়। এই অংশে প্রচলিত ভাসান গান, আবায়ন, বিষহরাপালা, কুশান গান প্রভৃতির মধ্যে আছে যেমন পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ তেমনই আবার খনগান, পালাটিয়া, রংপাঁচালী, গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে লোকজীবনের কাহিনীও বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশ।

এখন আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লোক নাটকের কিছু পরিচয় দেব—

(১) খন গান :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত বিভিন্ন লোকনাটকের মধ্যে 'খনগান' বা খ্যেনের গান নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

'খনগান' অর্থে ক্ষণের গান বা তাৎক্ষনিক রচিত নাটক বা গানকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সাধারণত পারিবারিক বা সামাজিক কোন রোমান্টিক কাহিনী, সংঘর্ষ বা কেচ্ছাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়ে থাকে এই ধরনের নাটক। গুপ্তপ্রণয়, কুলত্যাগ, অসবর্ণ বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মামলা মোকর্দমা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই জমে ওঠে নাটক।

সাধারণত মুক্তমঞ্চেই অভিনীত হয় এসব নাটক।

এই ধরনের নাটকে যেমন সংলাপ থাকে তেমনই থাকে গানও। প্রতি বছরই নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয় বলেই এই ধরনের নাটকের ওপরে মানুষের আগ্রহ থাকে

অসীম। এই সবপালা গানে নারী চরিত্রে সাধারণত পুরুষরাই অভিনয় করে থাকে তবে ইদানীং মেয়েরাও অংশ নিয়ে থাকে কোন কোন পালা গানে।

উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুরে এই গানের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডী, বংশীহারী, তপন, বালুর ঘাট, করণদীঘি, ইটাহার প্রভৃতি অঞ্চলের আশেপাশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে এই খনগানের। পুরনো দিনের খম গানের মধ্যে 'লালু সোহাগীর গান' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এই পালাটি। এছাড়াও স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কালে রচিত 'মোজামপর শানি,' তুফানশরী, ঢাকেশরী, দই ফেলা সেহারী, খিদু গোঁসাই ও জিরো প্রভৃতি খনগানগুলো বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে যেসব খনগান জনপ্রিয় হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—ভাসুর ভাউসান, বুধাশরী, দইফেলা সেহারী, সাইকেল সেহারী, হ্যাজাক সেহারী, ডিপটিউকল, সতী-হেবলা, পরেশ হালদার, দবীর মিঞা, শঙ্কর ওঝা প্রভৃতি।

এইসব খন গানগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের নানা শ্রেণীর নরনারীর আচার আচরণ, রীতিনীতি সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, মানুষের রুচি এমন কি ভাষার ক্রমবিবর্তনের রূপটিও প্রকাশিত হয়ে থাকে বলে এইসব লোক নাটক গুলোকে সমাজ জীবনের বিবর্তনের মূল্যবান দলিল হিসাবেও বিচার করে দেখা দরকার।

এইসব পালাগানে যেমন ঐসব অঞ্চলের বহুবিবাহ প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ, অসবর্ণ বিবাহ, নারীর কর্মপটুত্ব ও অসহায়তা, সামাজিক রীতির প্রতি বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও অপ্রীতি, শহরের প্রতি আকর্ষণ, ব্যভিচার, দুর্নীতি, প্রেম ও ভালোবাসার ছবি পাওয়া যায় তেমনই প্রাচীন পালা থেকে আধুনিক পালাগানের সংলাপ, গান এবং ভাষার বিবর্তনের রূপটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি লোক নাট্যক আলোচনা করলেই একথার সত্যতা বোঝা যাবে—

(ক) লালু—সোহাগী : লালু আর সোহাগী ছিল দুই বোন। বড়ই গরীব ছিল তারা। পাড়ার অনেকেই তাদের পিছনে লাগে। কিন্তু পাত্তা না পেয়ে হতাশ হয়। সোহাগীর বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু কপাল দোষে বিধবা হয়ে সে বাপের বাড়ী চলে আসে এবং হাটে বাজারে আনাজ বিক্রী করে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে। দুষ্টু লোকেরা পিছনে লাগে। যুবতী নারী সে। শয়তানদের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে সে থানার জমাদারের 'ধরম বেটি' হয় এবং শেষ পর্যন্ত্য দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রণয়। সোহাগীর সতীত্বপনাকে ব্যঙ্গ করেই রচিত হয়েছিল জনপ্রিয় পালা 'লালু-সোহাগী'।

এ নাটকে দেখা যায় সোহাগী সুন্দরী এবং কর্মঠ কিন্তু অসহায়া। উত্তরবঙ্গের গ্রামীন সমাজের অল্পবয়সী বিধবাদেরই করুণ প্রতিনিধি এই সোহাগী যারা আজো অসহায়া।

প্রসঙ্গতে বলা দরকার উত্তরবঙ্গে 'ধরম বেটি' করার প্রথা এখনো চালু আছে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

(খ) দবীর মিঞা : এ নাটকে দেখা যায় অবস্থাপন্ন দবীরের বাড়ী কালিয়াগঞ্জের কাছে কুনোরে। তাঁর বড় ছেলে জব্বারের সঙ্গে মালগাঁয়ের পাথর মুন্সীর বড় মেয়ে সখীনার বিয়ে হয়েছে। এদিকে সখীনার বোন আমিনাকে বিয়ে করতে চায় দবীর মিঞার চতুর্থ পুত্র। পাথর মুন্সী রাজী হয় না। অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দেবার তোড়জোড় করে। এই সময়ে এক গানের আসরে যাওয়ার নাম করে কৌশলে আমিনাকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে আসে দবীরের চতুর্থ ছেলে তার বৌদির মাধ্যমে। পাথর মুন্সী মেয়েকে নিতে এলে দবীর বলেন কয়েক দিন পরে পাঠিয়ে দেবেন। পাথর চলে যান।

দিন কয়েকের মধ্যেই ঝালুয়ার সঙ্গে আমিনার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায় দবীর মিঞার বাড়ীতেই। বিয়ের কথা কাণে যেতেই আমিনা কাতর কণ্ঠে দিদিকে বলে—

"এলা দিদি কেমুন কথা?
আজ না শুনি হামার বিহার কথা।
গেলেন তুমি জল্‌সা শুনিবার।
আনিলেন হামাক হেথা।
ডেন্‌কা বহিনা শুনিলে তোমাক্ রাখিবেন না।

সখীনাও ডেন্‌কার নামে ভয় পেয়ে যায় কেননা সে যে ভয়ঙ্কর ডাকাত। তাই সে তার স্বামীকে বলে—

'এলা কেমুন করেন কাম?
নাহি তুমার ধরম করম্?
নাহি তুমার ইমান?
তুম্‌রা হৈলে প্রবল জাতি
নারীর মনের কিছুই বোঝেন নি।
ডেন্‌কা বহিনা শুনিলে পরে
হামার বাড়ী করিবেন ডাকাতি।

সখীনার কথা দবীর মিঞার কাণেও যায়। আত্মসম্মানে আঘাত লাগে তাঁর। সখীনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

'বেটি আজ কহ এ কেমুন কথা?
ডেনকাকে মুই ডরাই নাকো।
ডেনকাক্ দিমু জব্বর নড়াই।
ছয় ছয় জুয়ান হামার পাশে
ডেন্‌কার দল কিবা করবার পারে?

অতএব বিয়ে হয়ে যায়। পাথর মুন্সী খবর পেয়ে মেয়েকে নিতে এলে দবীর মিঞা পাঠাতে চান না। পাথর রাগে 'তোমাক্ হাম দেখিয়া নিমু' বলে চলে যান এবং ডেনকাকে

সব জানান। ডেনকার পরামর্শে পাথর প্রথমে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টকে সব জানান। প্রেসিডেন্ট অনাদি বাবু দবীর মিঞাকে দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানা করেন এবং মেয়েকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু দবীর মিঞা আমিনাকে ফিরিয়ে তো দিলেনই না উপরন্তু জরিমানা দিতেও অস্বীকার করলেন। তখন অনাদি বাবু থানায় যাবার পরামর্শ দিলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে দবীর ঝালুয়ার সঙ্গে আমিনাকে ভগ্নীপতি সাতানুর বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

হাঁটা পথে ঝালুয়া নিয়ে চলেছে আমিনাকে। আমিনার কষ্ট হয় হাঁটতে। করুণ স্বরে সে বলে—

'আর কেত দূর কহছি যাবার ?
হাঁটিতে না পারি মুই পায়ে নাগে বেথা।
মোর গাডায় আসিলেক্ স্বর।
মাথার বিষেতে মুই করি টল্‌মল্।
আর কেত দূর যাবার হবে
ঐ না কহ সাতানু নাটুর ঘর ?

তখন আমিনাকে ভরসা দিয়ে ঝালুয়া বলে—

আর দেরী নাই চল্ আমিনা
ঐ তো দূরে উষাহরণ ওড়্!
ঐঠান যাইয়া মোরা চরিমু ইস্কায়।
ইস্কায় উইঠা যামু ফতেপুর।
মোটরে চরিয়া মোরা যামু আমিনপুর।
উঠিমু সত্বরে মোরা ঐ সাতানুর ঘর।

যাইহোক শেষ পর্য্যন্ত দুজনে সাতানুর বাড়ী পৌঁছালো। ওদিকে ডেন্‌কা তার বাহিনী নিয়ে দবীর মিঞার বাড়ী আক্রমণ করলো এবং লুটপাট করে আমিনাকে না পেয়ে সখিনাকে নিয়েই চলে গেল।

পাথর মুন্সী থানায় ডাইরী করলেন। দারোগাবাবু তদন্তে গেলেন কিন্তু আমিনাকে পেলেন না।

এদিকে ডেন্‌কা জানতে পারলো সাতানুর বাড়ীতে লুকিয়ে আছে আমিনারা। সাতানুও দুর্ধর্ষ ডাকাত। ডেনকা খবর পেল একদিন সাতানু ডাকাতি করতে গেছে অন্যত্র এইই সুযোগ। রেরে করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেল ঝালুয়া আমিনাকে নিয়ে। বহু পথ ঘুরে আমিনাকে ছদ্মবেশ পরিয়ে কালিয়াগঞ্জ হয়ে সিনেমা দেখে শেষে তারা দুজনে পৌঁছালো ফিরোজপুরে গুফার চাচার বাড়ী।

ডেন্‌কা বার বার হানা দেয় দবীর মিঞার বাড়ী। কিন্তু আমিনাকে পায় না। সে রাগে গর্জন করতে থাকে—

হামার নাম ডেন্‌কা ডাকাত জানে সব্বজন।
হামার মতোন ডাকু নি আছে মালগাঁর ভিতর।
যদি মুই মনে করি দবীর সহ ছয় ব্যাটারে ধরতি পারি।
দারোগা-পুলিশ মোর কিছু না করতি পারে।
এই না কথা জানে সব্বজনে!

শেষ পর্য্যন্ত ডেন্‌কা খবর পেল গুফার বাড়ীতে ওরা আছে। একরাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে দলবল নিয়ে গুফার বাড়ীতে। সেখানে দবীর মিঞা ও তাঁর ছয় ছেলেও ছিল। দারুন লড়াই হলেও শেষ পর্য্যন্ত ডেনকারই জয় হলো। সবাইকে ধরে থানায় নিয়ে গেল ডেন্‌কা। রায়গঞ্জ কোর্টে বিচার হলো এবং দবীর মিঞা ও তাঁর ছেলেদের জেল হয়ে গেল। পাথর মিঞা পরে আমিনাকে অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল।

এই পালাটির কাহিনী ও চরিত্রগুলি সবই বাস্তব। অনেকেই জীবিত আছে আজো। কালু মাষ্টার রচনা করেছেন এই পালা গানটি।

এই নাটকে মুসলমান সমাজের জাতি বৈরিতা যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তা দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে উত্তরদিনাজপুরের বিভিন্ন অংশে আইন শৃংখলার অবনতির চিত্রও ফুটে উঠেছে এখানে ডেনকার মতো ডাকাতদের আস্ফালনে।

সংলাপের ভাষাতেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

এই নাটকটিও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল একদা পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে।

(গ) সতী হেবলা : এই পালা গানটিও একদা অখণ্ড দিনাজপুর জেলায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। এ নাটকে দেখা যায় হাতিসাহার মেয়ে সতীকে হেবলা স্কুলে নিয়ে যায় প্রতিদিন আবার স্কুল থেকে বাড়ীতেও দিয়ে যায়। স্কুলের বীরেন মাস্টার সতীকে ভালবাসে। একদিন সবাইকে ছুটি দিয়ে সতীকে আটকে রেখে গদগদভাবে বীরেন মাস্টার জানায়—

তুই যেমুন সুন্দরী সতী
যেন ঐ সূরয কিরণ।
তোর উপে মুই হইছুরে পাগল।
ও সতী তুই যেন ঐ আশমানেরই চান্দর।
তোর নাগি মুই হইছুরে পাগল।

আড়াল থেকে হেবলা শোনে মাস্টারের কথা। শোনে সতীর প্রতিবাদও। সতী রাগতস্বরে বলে—

মাস্টার সাজিছেন বটে
পড়িছেন শাস্তর বিস্তর।

এলা ছিক্ ছিক্ একি চোরের নজর ?
তোমরা না করেনগে মাস্টার পনা
কইতে ইসব কথা নাজ নি নাগে ?

সতী রাগ করে চলে যায়। হেবলা কি হয়েছে জানতে চাইলেও সতী কিছুই বলে না। হেবলা মনে দুঃখ পায়।

বীরেন মাস্টারের রাগ গিয়ে পড়ে হেবলার ওপরে। হেবলাকে খুব মারে বীরেন মাস্টার। হাতিসাহাকে সব জানায় হেবলা। কিন্তু হাতিসাহা নীরব থাকেন। রাগে অপমানে হেবলা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু সতীকে দেখার জন্য ছট্‌ফট্ করে তার মন। দিন দিন শুখিয়ে যেতে থাকে সে। অবশেষে হেবলার মা যায় তার ভাইয়ের কাছে যদি সতীর সঙ্গে হেবলার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে সে। তাই প্রথমটা রাজী না হলেও শেষে ভাগ্নের অবস্থা ভেবে ঘটকালিতে যায় এবং পাত্র বি.এ পাশ বলে চালিয়ে বিয়ের কথা বার্তা পাকা করে আসে। হেবলার মুখে হাসি ফোটে।

হেবলাকে নিয়ে বরযাত্রীরা গান গাইতে গাইতে হাতি সাহার বাড়ীতে হাজির হয়। হেবলাকে পাত্র হিসাবে দেখতে পেয়ে হাতি সাহা রেগে যান। হৈ হৈ রৈ রৈ লেগে যায়। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের মোড়লদের মধ্যস্থতায় বিয়ে হয়ে যায় সতীর সঙ্গে হেবলার।

ওদিকে বীরেন মাস্টার কিন্তু সুযোগ খোঁজে। হাতি সাহাকে সে কুমন্ত্রণা দেয় হেবলাকে মেরে সুন্দরী সতীর অন্য ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। হাতি সাহা প্রথমে রাজী নাহলেও শেষে মেয়ের সুখের কথা ভেবে রাজী হয়ে যান। হেবলাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে। চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলেন। সতীর ভাইও ছিল সেখানে। সে নিজের চা তো খেলই উপরন্তু হেবলার চায়েরও বেশীর ভাগটাই পান করে ফেললো।

সতী স্নানের ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল তার ভাই ঢুলে পড়েছে এবং হেবলাও ছট্‌ফট্ করছে। পাড়ার লোকজন ডেকে ডাক্তার আনালো সে। ওষুধ দিয়ে হেবলাকে বাঁচালেন ডাক্তার কিন্তু সতীর ভাই মারা গেল। হাতি সাহা মনের দুঃখে পাথর হয়ে গেলেন।

সতীকে বাপের বাড়ী রেখে ফিরে এলো হেবলা। বীরেন মাস্টার ওৎপেতে থাকে। একদিন পথের মাঝে হেবলাকে একা পেয়ে ছোরা মারতে গেল সে। হেবলা প্রাণ ভিক্ষা চাইলো—

নামারেন, নামারেন বাবু,
দয়া করি করেন গো মারজনা!
মুই যে অতি নিজাঙ্গাল
মোক্ করিবেন দয়া।

কিন্তু তবু বীরেন মাস্টার আঘাত করে। হেবলার আর্তনাদে লোকজন ছুটে আসে ধরা পড়ে যায় বীরেন মাস্টার। সতীও ছুটে আসে। থানায় খবর যায়। হেবলা বেঁচে

যায় এবারও। কিন্তু হেবলাকে হত্যার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের জন্য বীরেন মাস্টার ও হাতিসাহার জেল হয়ে যায়।

জনপ্রিয় এই পালা গানটির রচনায় কালু বর্মন বা কালু মাস্টার যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই।

গ্রাম জীবনের সাধারণ প্রণয়ভিত্তিক কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে এই লোক নাটকে। অখণ্ড দিনাজপুর জেলার সৈয়দ পুরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল এই পালাগানটি। ঐ অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতি, সমাজ পতিদের মতামদের গুরত্ব, হীনষড়যন্ত্র, সমানে সমানে বিয়ে থা নাহলে যে বিপর্যয় ঘটে, প্রেম যে কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পরে এ সবই ফুটে উঠেছে এই পালাগানে।

এই নাটকে এছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠান, তত্বপাঠানো, ঘটকালি, ডাক্তারের সেবামূলক কাজ, বিয়ের গান, সতীর পতিগতাপ্রাণ, প্রভৃতিও সুন্দরভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

(ঘ) খিদু গোঁসাই ও জিরো : অখণ্ড দিনাজ পুরে এই পালাগানটিও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল একদা। গুরু এবং তার শিষ্যার প্রেম কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে এই পালাগানে। গুরুরূপী খিদু গোঁসাইকে কটাক্ষ করা হয়েছে এই নাটকে—

“নিশুম ঘরে শুইয়া থাকে একলা জিরোরে।
আইতের বেলা খিদু গোঁসাই আইসেন সেথা
হরিনাম দিবার রে!
হরিনাম দিবার কালে কি দিলেন গোঁসাই ?
আইন্ধার আইতে জিরোদাসীর
শির শিরাইছে গায়।

জিরোর নারী হৃদয়ের কামনা বাসনার চিত্রের পাশাপাশি খিদু গোঁসাই এর চরিত্র এবং তার পদস্খলনের চিত্রও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে। ধর্মের নামে যেসব গুরু ভণ্ডামি করে তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এই পালাগানে।

(ঙ) বুধশরী : এই পালাগানে রাজবংশী সমাজে ঘরজামাই বা ঘরজিয়া রাখার প্রথাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। বৃদ্ধা ক্ষীরো দাসী তার বোনঝি বুধশ্বরীর সঙ্গে ক্ষীরোদ নামে একটি ছেলের বিয়ে দিল এই সর্তে যে সে ঘরজামাই থেকে জমি চাষ করবেও বাড়ীর অন্যান্য কাজ সারবে। ক্ষিরোদ থাকতে লাগলো তাদের বাড়ী।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষীরোদের অবস্থা হয়ে উঠলো করুণ। সে হায় হায় করতে লাগলো খাবার দাবার ঠিকমতো না পেয়ে—

‘হাল বাহিতে পাও চলে না
দেহাতে নিবল।
মাথার পরে সূরয কিরণ
নি আসে পন্তাও।

শেষ পর্বে দেখা যায় বুধশ্বরী ধীরে ধীরে ক্ষীরোদের দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে শুরু করে এবং কালক্রমে সে ক্ষীরোদকে ভালবেসে ফেলে ও তারা সুখী হয়।

এই পালাগানের রচয়িতা ক্ষীরোদ নিজেই। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ক্ষীরোদ ব্যক্ত করেছে এই নাটকে। নিরক্ষর লোকনাট্যকার ক্ষীরোদ যেভাবে মুখে মুখে এই নাটক রচনা করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। ঘরজিয়া জীবনের এক প্রামাণ্য দলিল বিশেষ এই পালা গানটি।

(চ) ভাসুর ভাউসান : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে দাদার মৃত্যু হলে বিধবা বৌদিকে ঠাকুরপো বিয়ে করতে পারে কিন্তু ভাসুর কখনো মৃত ভাইএর বৌ বা ভাউসানকে বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ কোথাও এমন ঘটনা ঘটে গেলে হৈচৈ পড়ে যায়। 'ভাসুর-ভাউসান' পালায় এমনই একটি সাড়া জাগানো ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

বিধবা ভাইবৌকে ভাসুর তার অনুরাগ জানালে 'ভাউসান' আপত্তি জানায়—

কি কথা কহেন গো ভাসুরা ?
পীরিতির কথা আর না নাগে ভাল।
মুই অভাগী কাঁচা চুলে হারানু সোয়ামী।
পীরিতির কথা মোক আর কহেন না।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ভাউসানের মত বদলায়। স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করতে থাকে তারা। কিছুদিন সমাজে হৈচৈ হলেও পরে সব শান্ত হয়ে আসে।

(ছ) দইফেলা সেহারী : অখণ্ড দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে একদা খুব পচা দৈ বিক্রী হতো হাটে হাটে। এসব দেখার দায়িত্ব ছিল স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টারের। তিনি ঐ সব পচা দৈ ফেলে দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করতেন মানুষের। তাই নাম হয়েছিল সেহার। জনৈক সেহারী শেষপর্য্যন্ত নারীর মোহে পড়ে এবং অর্থের লোভে পচা দৈ ফেলা বন্ধ করে দেন। সেই চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে এই পালাগানে। সেই সময়ে এই ঘটনাটা বেশ সোরগোল তুলেছিল এবং জনগণও বেশমজা পেয়েছিল এই বিশেষ পালা গানটিতে। সেই সময়কার এক সামাজিক চিত্রতুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে।

(জ) মোজামপরশানি : লালু সোহাগীর মতোই একদা এই পালাগানটিও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে। এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে এক হাড়ির মেয়ের প্রণয়কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল এই খন গানটি। হিন্দু সমাজে তুমুল হৈচৈ হয়েছিল ব্যাপারটি নিয়ে। কিন্তু প্রেমতো ধর্মের বাঁধন মানে না তাই নাট্যকার প্রচ্ছন্ন কৌতুকের মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন এই প্রণয় কাহিনীটি তাঁর পালাগানে।

(২) পালাটিয়া :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে আরেক শ্রেণীর লোকনাট্য প্রচলিত আছে, এগুলো সাধারণতভাবে 'পালাটিয়া' নামে পরিচিত। খন গানের মতো এগুলো তাৎক্ষণিক নয়।

এই ধরণের নাটকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং নিয়ম মেনে রচিত বা অভিনীত হয়ে থাকে। বহুদিন ধরে চালু থাকে এই নাটকগুলো এদের প্রাণ শক্তির গুণে।

এই ধরণের নাটকে গান, সংলাপ, দৃশ্য আগে থেকেই তৈরী থাকে। নায়ক-নায়িকা রূপকথা, পুরাণ, মধ্যযুগের মুসলিম প্রণয় কাহিনী বা কল্পনার জগৎ থেকেই নেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত, তবে বাস্তব চরিত্র এবং কাহিনীরও অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে কখনো কখনো। মূলত, নায়ক-নায়িকার মিলনেই সমাপ্তি ঘটে এসব নাটকের। তবে নীতি কথাও থাকে লোকশিক্ষার জন্য।

খন গানের মতোই এইসব পালাটিয়া গানও মুক্তমঞ্চেই অভিনীত হয়ে থাকে। দর্শক ঘিরে থাকে চারপাশে। দর্শকের মনোরঞ্জন করাই মূল উদ্দেশ্য।

অখণ্ড দিনাজপুর জেলায় একদা গুণাই যাত্রা, রূপবান, লায়লা মজনু, আসমান তারা প্রভৃতি পালাগান গুলো বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল!

(ক) আসমান তারাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে যাত্রাজগতের সাড়া জাগানো পালা 'বেগম আসমান তারা' রচিত হয়েছে। আসমানের সঙ্গে গনেশ পুত্র যদু তথা জালালুদ্দীনের প্রেমকাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য বিষয়।

(খ) গুণাই যাত্রায় গুণাই এর সঙ্গে এক যুবকের প্রেমবর্ণনা করা হয়েছে। অসামান্য রূপসী এই গুণাই।

(গ) লায়লা মজনুর প্রেম কাহিনীই লায়লা মজনু নাটকের উপজীব্য বিষয়।

(ঘ) রূপবানও এই ধরণের একটি পালাগান। তবে বাংলার বিভিন্ন অংশেই এই নাটকগুলো একদা জনপ্রিয় হয়েছিল।

(৩) দেব মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পালাগান :

খনগান এবং পালাটিয়ার মাঝামাঝি একশ্রেণীর দেবমাহাত্ম্য প্রচার মূলক পালাগানও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঐসব পালার মধ্যে 'শঙ্কর ওঝা' পালাটি বর্তমান উত্তরদিনাজ পুরের বিভিন্ন অংশে একদা বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

(ক) শঙ্কর ওঝা : দেবতার কৃপা না হলে যে মানুষ অসহায় এই পালাগানে সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন উত্তরদিনাজপুরের কোন এক অখ্যাত লোকনাট্যকার। শিবভক্ত শঙ্কর ওঝার যমদূতের হাতে নিগ্রহ এবং শিব কর্তৃক শঙ্করের উদ্ধারই এই লোকনাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইটাহার অঞ্চলের এক ওঝা এই শিবভক্ত শঙ্কর ওঝা। কিন্তু প্রথমে শঙ্কর মনসারই পূজারী ছিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী শিব একদিন তাঁকে দেখা দিয়ে একটা মালা হাতে দিয়ে জপ করতে বললেন। এবং আরো বললেন—

শিব ভজ শিব ভজ
ছাড়ি মনসার নাম।

ছার ছার যত সব
গুণীনের কাম।

শঙ্কর ওঝা শিবের নির্দেশ মতো মালা জপতে থাকেন এবং শিবই তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে যায়। শিবভক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ঝিল্লিপুরের লোকজন এই পরিবর্তন দেখে অবাকই হলেন।

একদিন তাঁর গাঁয়ের ঝিল্লা মহম্মদ আধিয়ারের বাড়ী যাবার পথে হেলুয়া রুটি আর মাংসের লোভে ছুট লাগায় শ্বশুর বাড়ীর দিকে। পথে দেখতে পেল অশুভ চামচিকা। তবু সে গেল। শ্বশুর বাড়ীতে পেটপুরে রুটি মাংস খেয়ে বাড়ীর পথ ধরলো কিছু দূর যাবার পরেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো তার।

বাড়ী এসে ঝিল্লা তার বৌ জামিনাকে পাঠালো ভূটা পাণ্ডারের বাড়ী যদি সে গণনা করে ভাল করে দিতে পারে এই আশায়। জামিনা তখনই তার ভাইকে নিয়ে ছুটলো ভূটার বাড়ীতে। ভূটা বহুক্ষণ ধরে গণনা করে দেখলো যে ঝিল্লার আয়ু ফুরিয়েছে এখন শঙ্কর ওঝাই বাঁচাতে পারে। জামিনা তখন ঝিল্লার বন্ধুকে ধরে হাজির হলো শঙ্করের বাড়ী কিন্তু শঙ্কর জানালেন তিনি গুণীনের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। জামিনা অনেক কান্নাকাটি করে শেষে 'বাপদায়' দিয়ে শঙ্করের ধর্মবেটি হলো। তখন শঙ্কর কিছুটা তেল আর ঘি মন্ত্রপূত করে জামিনার হাতে দিয়ে বললেন ঝিল্লার গায়ে মাথায় মালিশ করে দিতে। পরের দিন যাবেন তিনি দেখতে। সেই তেল ঘি নিয়ে জামিনারা চলে যায়।

পরের দিন শঙ্কর ওঝা ধম্মবেটির বাড়ীর দিকে যাত্রা করেন ঝিল্লাকে সুস্থ করে তোলার বাসনায়। পথে যমদূত এসে গতিরোধ করে নিষেধ করে সেখানে যেতে। শঙ্কর তখন বলেন—

ছার পথ যাই মুই ঝিল্লার বারী।
ধম্ম বাপ করিছেন মোক্ ঝিল্লার নারী।

যমদূত তখন বলে—

'না যাও না যাও ওঝা ঝিল্লার বারী
ঝিল্লার বারী গেইলে খাবে নোয়ার বারি।

অগত্যা শঙ্কর বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু ধম্ম বেটি আর ঝিল্লার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। ওষুধ পত্র নিয়ে গোপনে তাই শঙ্কর গেলেন ঝিল্লার বাড়ী। কিন্তু ফেরার পথে যমদূতের চোখে পড়ে গেলেন। যমদূতের তাড়া খেয়ে শঙ্কর এবার বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন গঙ্গার জলে এবং সেখানেই গোপনে ঝিল্লার প্রাণ রক্ষার জন্য মন্ত্রাদি পাঠ ও প্রার্থনা করতে লাগলেন।

ওদিকে যমদূতরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলো শঙ্করকে কঠিন শাস্তি দেবে বলে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে তারা এলো শঙ্করের বাড়ী। কিন্তু শঙ্করের দুই স্ত্রীও মন্ত্রতন্ত্র জানে। তারা মন্ত্র বলে বন্দী করে ফেললো যমদূতদের। তখন যমরাজ এসে বহু কৌশলে তাদের

মুক্ত করে নিয়ে গেলেন। এরপরে শঙ্করের শাশুড়ীদের ছদ্মবেশে এলো দুই যমদূত। এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা শঙ্করের অবস্থানের জায়গা জেনে নিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল যমরাজার কাছে। চললো অকথ্য অত্যাচার। তখন বাধ্য হয়ে শঙ্কর শিবের শরণ নিলেন। শিব এসে যমরাজকে বললেন শঙ্করকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু যমরাজ সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং তাঁর নিষেধ না শোনার জন্য শাস্তি দেবেনই তাঁকে এও জানালেন। শিব তখন রুদ্র মূর্তি ধারণ করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগলেন। যমরাজ ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—

সমবর সমবর শিবুহে আগ তুমার।
ছাড়ি দিম্ নিচ্চয় ভক্ত তুমার!

শিব ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যমকে বললেন— 'শঙ্করের দাও বর সোনার ছুয়ার।

বাধ্য হয়ে যমরাজকে সেই বরও দিতে হলো। খুশি মনে শঙ্করকে উদ্ধার করে শিব হাসতে হাসতে চলে এলেন শঙ্করের বাড়ী। বাড়ীতে বইতে লাগলো আনন্দের ঢেউ। শিবকে প্রণাম করলো সবাই। সাধনভজনের পরামর্শ দিয়ে শিব চলে গেলেন কৈলাসে।

বছর না ঘুরতেই সুন্দর একটি ছেলে হলো শঙ্করের। মনের ব্যথা দূর হলো সকলের। শিব পূজা আর জপ তপে মহানন্দে দিন কাটতে লাগলো শঙ্করের। এখানেই শেষ হয় নাটক শিবের জয়ধ্বনি দিয়ে।

এই পালাগানটি যদিও বিষহরা-চণ্ডী বা রামযাত্রার কাহিনীর মতো রসগ্রাহী নয় বা আগাগোড়া দৃঢ় ভাবে গ্রথিত কিংবা চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবলীর বিন্যাসেও ত্রুটি মুক্ত নয় তথাপি একে খন গান বা পালাটিয়ার পর্য্যায়ে না ফেলে দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক পালা হিসাবেই বিচার করে দেখতে হবে। বিপদের সময় শিব ভক্তকে উদ্ধার করেছেন এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিব মাহাত্ম্য।

শঙ্করের গঙ্গানদীর জলে আত্মগোপন করে থাকার ঘটনাটা দুর্য্যোধনের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদের জলে আত্মগোপন করার ঘটনাকে স্মরণ করায়। আবার যমদূতদের চামচিকার ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারটা গোপীচন্দ্রের গানের বাদুড় হবার ঘটনাকে মনে করায়। এগুলো সবই অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ।

তবে এই নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরা। সামাজিক রীতি নীতি, ধম্ম বাপদায়, ভোজের খাওয়া দাওয়া, ওঝা বা গুণীনের প্রতি আস্থা, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি, মুসলমান মেয়ের হিন্দু ওঝাকে 'বাপদায়' দেওয়া, আধিয়ার প্রথা, মেয়েদের স্বামীভক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও সরলতা, যাত্রাকালে চামচিকা দর্শন অমঙ্গলের—প্রভৃতি অনেক তথ্যই পাওয়া যায়।

আবার এ নাটকের নিদান, হালুয়া, ক্যাচাল, নদারী, পাঞ্জার, ধূধূনী, হেলুয়া, বকরী, চাম, ড্যাং, ছুয়া প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিবমাহাত্ম্য প্রচার করা ছাড়াও আনন্দদান এবং নীতি শিক্ষার কাজও করেছে এই নাটকটি।

এককালে ইটাহার থানা এবং কালিয়াগঞ্জ থানার বিভিন্ন অংশে ব্যাপক সাড়া জাগানো এই পালাগানটি নাকি কয়েকটি দুর্ঘটনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় বলে আমাকে জানায় মোস্তফানগরের লক্ষীরায় ও অলকান্ত বর্মণ। যারা শিব, যম, যমদূত ও ঝিল্লার অভিনয় করেছিল মোস্তফানগরও ভেউড় গ্রামে তারা নাকি সবাই বছর না ঘুরতেই মারা যায়। ফলে এই পালাগানের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় ক্রমে।

বিভিন্ন খনগান, পালাটিয়া এবং শঙ্কর ওঝার কাহিনী, সংলাপ ও গান শুনিয়ে যারা আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে লক্ষী রায়, অলকান্ত ছাড়াও দেহাবন্ধ গ্রামের মধুসূদন দাস এবং তরঙ্গপুরের চিত্তবাবু, তরণী বাবু ও নাড়ু ঘোষের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এমনি অসংখ্য পালাগান ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চলে যেগুলো ঐ অংশের গ্রামীন সমাজ জীবনের রীতি নীতি, আচার, সংস্কার ও প্রথা ইত্যাদির পরিচয় বাহী যেমন তেমনই সংলাপ ও সঙ্গীতের ভাষাতাত্বিক মূল্যায়নেও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

এইসব লোকনাটকগুলো সাধারণত মুখে মুখেই রচিত হয়েছে। লিখিত রূপ নেই। যারা অভিনয় করেছে বা শুনেছে এখনো হয় তো-তাদের কাছ থেকে এগুলোর কিছু কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে কিন্তু এরা গতহলেই হারিয়ে যাবে এইসব মূল্যবান লোক সাহিত্যের উপাদান গুলো তাই এখনই এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া দরকার।

(খ) বিষহরা পালাগান বা ভাসানগান : মনসা-চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের জীবনকেন্দ্রিক যে করুণ রসাত্মক মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে তার আবেদন বাঙালীর কাছে ছিল সুদূর প্রসারী। এই কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অংশে রচিত হয়েছিল বহু পালাগান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এই পালাগান কোথাও বা বিষহরার পালাগান, কোথাও বা ভাসান গান, কোথাও বা মনসার গান আবার কোথাও বা পদ্মাবতীর পালা বা বেহুলা লখীন্দরে গান বলেও পরিচিত।

এই পালাগানের সংলাপ প্রায়শই তাৎক্ষণিক এবং মুখে মুখেই রচিত হয়ে থাকে। বেহুলা এবং মনসার ভূমিকায় আগে ছেলেরাই অভিনয় করতো বর্তমানে অবশ্য মেয়েরাই অভিনয় করে। সাধারণত মুক্তাঙ্গনেই অভিনয় হয়ে থাকে। মনসা পূজার দিন ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেও এই পালাগান অভিনীত হয়ে থাকে। বরোয়ারীতলায় পূজামণ্ডপের সামনে বা কোন গৃহস্থের বাড়ীতেও এই পালা অভিনীত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে।

প্রথমে অভিনয়ের নির্দিষ্ট জায়গাটি দড়ি দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়। মনসার পূজা সেরে বা প্রশস্তি গেয়ে শুরু হয় পালাগান। মূল গায়েনের হাতে থাকে একটা চামর এবং মাথায় থাকে টুপি। আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঐ গায়েন গল্পাকারে বা গানের মাধ্যমে পালা শুরু করেন। গায়নের পাশেই থাকেন ঝলমলে পোষাকে তাঁর দোসর। ঐ দোসর প্রশ্ন করেন এবং গায়েন উত্তর দেন। দোসরটি আবার কোন চরিত্রে অভিনয়ও করেন। মূলকাহিনীর মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আনার জন্য এবং হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কোন লৌকিক কাহিনী বা লৌকিক চরিত্রের আমদানি করা হয়ে থাকে। এতে মূল কাহিনীর গাম্ভীর্য কিছুটা নষ্ট হয় বটে তবে গ্রামীন মানুষদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই এসব করা হয়ে থাকে।

আসরে ঐ দুজন ছাড়াও আরো চার পাঁচজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সেজে গুজে বসে থাকেন। প্রয়োজন মতো তারা আসরে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ সংলাপ বলেন বা নাচ গান করেন। ভিতরে বাজনদার এবং অন্যান্য গায়ক গায়িকাও থাকেন।

দৃশ্য পরিবর্তনের সময় নাচগান চলে। বাইরে থেকেও দেব-দেবী বা অন্যান্য চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করেন অনেকক্ষেত্রে।

এই পালাগানে পদ্মার জন্ম থেকে লখীন্দরের জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু, চাঁদ সদাগরের সমুদ্রযাত্রা এবং ভেলা যাত্রাও লখীন্দরের পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত অভিনয় চলে। কোথাও কোথাও টানা সাতদিন ধরে চলে এই পালাগান। কালিয়াগঞ্জ থানার বহুগ্রামে দেখেছি এই পালা গান চলার সময়ে লখীন্দরের মৃত্যুতে বহু বাড়ীতে অশৌচও পালন করা হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের পুরাণ নির্ভর লোক নাটকগুলির মধ্যে ভাসান গান বা বিষহরার পালাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পালাগান। এর প্রধান কারণ হলো এই পালার করুণ রসাত্মক আবেদন এবং দেবরোষের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার দৃঢ়তা। পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ চাঁদসদাগর মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা সাহস ও আদর্শ ভক্তের প্রতীক। উত্তরবঙ্গের নরনারীর কাছে তাইতো চাঁদ সদাগর আদর্শ পুরুষ।

আবার উত্তরবঙ্গের নারীদের কাছে সীতা নয়, সতী নয়, সাবিত্রী নয়—বেহুলাই একান্ত কাছের এবং বেহুলাই তাদের আদর্শ। তাইতো বাসর ঘরে বেহুলার স্বামী হারানোর বেদনায় হাহাকার করে ওঠে তাদের বুক। অশ্রুসজল হয় তাদের চোখ। বেহুলার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাইতো তারাও যেন বেদনার ভারে মূহ্যমান হয়ে বেহুলার সঙ্গে করুণস্বরে বলে ওঠে—

হাত ধরিয়া বলং আই মুই শ্বশুর সদাগর।
পঞ্চগাচি কলা মাগং ভুরা বান্ধিবার।
পতির সনে যাই মুই জলে।
ও মোর পতি জিয়াই বার।

বেহুলা মৃত পতিকে নিয়ে ভেলায় ভেসে চলেন শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। হৃদয় ফেটে যায় আবাল বৃদ্ধ-বনিতার। বেহুলার সঙ্গে তারাও যেন আর্তস্বরে গেয়ে ওঠে—

'ও মোর বিধিরে, হায় ও বিধিরে,
এতো দুখ কেনে বা দিলেন রে!
যদি পতি নাহি পামু ফিরিয়া চম্পকে যামু।
ঝম্প দিমু সাগরের জলে, ও মোর বিধিরে।
বন্ধ দিমু তোমার উপরে ওমোর বিধিরে!
এতো দুখ কেনে বা দিলেন রে। ......

লোক জীবনের আন্তরিক স্নেহ মমতা এবং সহানুভূতির উপাদানেই ভাস্বর হয়ে উঠেছেন বেহুলা শাশ্বত সতী নারীর মর্য্যাদায় উত্তরবঙ্গের নারী হৃদয়ে!

(গ) আবায়ণ গান : ভারতীয় জনমানসে রামায়ণের প্রভাব সুদূর প্রসারী। যুগ যুগ ধরে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের সমাজে জীবনেও রামায়ণের এই সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বন করে উত্তরবঙ্গে রচিত হয়েছে বিভিন্ন নাটক, যাত্রা, গল্প ও কথকতা। উত্তরবঙ্গ বাসী পেয়েছে একদিকে যেমন চিত্ত বিনোদনের খোরাক তেমনই পেয়েছে আদর্শ চরিত্র, পরিবার এবং সমাজ গঠনের নির্দেশ ঐসব নাটক, গল্প ও কথকতা থেকে।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে যেসব নাটক বা পালাগান রচিত ও অভিনীত বা গীত হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে আবায়ণ গান, কুশান গান, রাভাণ পালা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই আবায়ণ গানের প্রচলন বেশী।

সাধারণত 'রামনবমী' উপলক্ষ্যে বা বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠান যথা অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধাদি উলক্ষ্যেও গীত হয়ে থাকে আবায়ণ গান। আবার সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যেও গীত হয়ে থাকে এই গান।

আসরের চারপাশে দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকে। একটি বেদীর ওপরে প্রদীপ জ্বলে। ঐ বেদীতে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা দিয়ে মূল গায়েন শুরু করেন পালা গান। পাঁচালীর ঢঙে পায়ে নূপুর এবং হাতের চামর দুলিয়ে নেচে নেচে হেলে দুলে গায়েন কখনো বর্ণনা করে কখনো বা গান গেয়ে যথা সম্ভব আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করেন নির্দিষ্ট পালাটি। দোহার ও বাদকবৃন্দ সাহায্য করে যথাযথ ভাবে। দোহাররা মাঝে মাঝেই 'জয় জয় রাম' বলো। জয় সীতারাম বলো—বলে দোহার দেয়। দোতারা এবং করতালই মূল বাদ্যযন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত, একদিনে একটিমাত্র কাণ্ডেরই গান হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ রামায়ণের গান হলে পরপর অনেক কটি রাত্রি ধরেই চলে ঐ গান।

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বেদীর সম্মুখে নত হয়ে প্রণামী পাত্রে সাধ্যমতো প্রণামী দেয়। পালা শেষে মূলগায়েনের পদধূলিও নেয়। চামর বুলিয়ে দেন সবার মাথায় মূল গায়েন।

যদিও আঞ্চলিক ভাষাতেই গীত হয় এই গান তবু মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে বর্ণনার সময়। হনুমান, রাবণ, শূর্পনখা, সীতা, লব-কুশ প্রভৃতির চরিত্রে অন্যরাও অভিনয় করে থাকে। একান্তই অনাড়ম্বর ভাবে এই পালা গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

(ঘ) কুশান গান : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের বিভিন্ন অংশে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী বেণা যন্ত্র সহকারে বিশেষ ভাবে গীত হয়ে থাকে। ঝুমুর, করতালও ব্যবহৃত হয় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে। মূল গায়েন সারাক্ষণই ঐ বেনাযন্ত্রটি বাজিয়ে চলেন তবে নিজে বিশেষ কোন চরিত্রে অভিনয়ের সময় ঐ যন্ত্রটি আসরে নামিয়ে রাখেন। পালার বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেন তাঁরা সেজে গুজে আসরের মধ্যেই বসে থাকেন এই পালাগান 'কুশান' নামেই খ্যাত। এখানে গানই প্রধান তবে মাঝে মধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। নাচিয়ের দল নেচে চলে সারাক্ষণই সম্ভবত পালার আকর্ষণ বাড়াবার জন্যই।

রামের বনবাস, সীতাহরণ, বন্দিনী সীতা, সীতার নির্বাসন, লবকুশের সঙ্গে রামলক্ষ্মণদের যুদ্ধ, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন করুণ অংশগুলিই সাধারণত গীত হয় এই

পালায় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। গান এবং অভিনয়ের কৌশলে দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয় ভরে ওঠে কাণায় কাণায়।

প্রকৃতপক্ষে কুশান গানের পরিবেশনের ঢঙে রামায়ণের প্রাচীন ধারার ঐতিহ্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ঙ) রাভাণ পালা : দার্জিলিং, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণেরই কাহিনী অবলম্বন করে 'রাভাণ পালা' নামে আরেক ধরণের পালাগান গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে। বিশেষ মানত উলক্ষ্যে সাধারণত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই এই পালাগানের অনুষ্ঠান হয়। দুরাত ও একদিন ধরে চলে এই গান। রামের জন্ম থেকে রাবণ বধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলীই এই পালার মূল বিষয়।

নির্দিষ্ট আসরের মাঝেই বসে থাকেন অন্যান্য কুশীলবগণ। নিজ নিজ পালা এলে অভিনয় সেরে বসে থাকেন অন্যান্যদের সঙ্গে।

এই পালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মুখা বা মুখোসের ব্যবহার। রাবণের মুখোসই সব থেকে আকর্ষণীয়। রাবণের শৌর্যবীর্য ফুটিয়ে তোলা হয় এই পালায় বিশেষ ভাবে।

গানের মাঝ মাঝেই থাকে সংলাপ। আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত হয় ঐসব সংলাপ।

এই পালার অভিনয় রীতি, আঙ্গিক ও সাজ সজ্জায় প্রাচীন দিনের যাত্রা রীতির ছায়া দেখা যায়। দর্শকবৃন্দ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত, শিহরিত ও আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে এই গানে।

(৪) (ক) গম্ভীরা :

মালদহ জেলার গম্ভীরার খ্যাতি আজ সারা দেশ জোড়া। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপরে গম্ভীরার পালাগান রচিত হয়ে থাকে। পূজা পার্বণ বা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট আসরে গম্ভীরার পালাগান গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে। খনগানের সঙ্গে এই পালাগানের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উত্তর এবং দক্ষিন দিনাজপুরে ও গম্ভীরার খ্যাতি আছে। বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটে গম্ভীরায়।

(খ) আলকাপ : আলকাপে ও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ওপরেই পালাগান রচিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন আসরে গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে। এ নাটকেও নাচ-গান এবং বহু চরিত্র থাকে। খনগানের সঙ্গে আলকাপেরও মিল আছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত অধ্যায়ে এই দুই লোক নাটকের কথা আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

(৫) পীরের গান :

বাংলার বৃহত্তর লোকজীবনে লৌকিক ধর্মের অনুশীলন এবং আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়নি কোনকালেই। উত্তরবঙ্গের মানুষরাও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যোগ দিয়েছে একে অন্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে একে অন্যের সাথে। লোক জীবনের এই অসাম্প্রদায়িক ভাবই উভয় সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করেছে সুদৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধনে।

বৃহত্তর বাংলার অন্যান্য অংশের মতোই হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো পীরের গান ও পূজায় উভয় সম্প্রদায়েরই অংশগ্রহণ। পীর হলেন প্রাচীন আধ্যাত্মিক গুরু।

বাংলায় তুর্কী আক্রমণের সময় থেকেই পীর দরবেশদের আগমন ঘটতে থাকে। এঁদেরই মাধ্যমে তৈরী হয় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক ঐক্য। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পীরের দরগায় সিন্নি দেন ও নানাবিধ অর্ঘ্য প্রদান করে থাকেন। হরির লুট দেওয়া হয়, মানত করা হয়, ইটও বাঁধা হয় দরগায়। উরস উৎসবেও যোগ দেন উভয় সম্প্রদায়েরই অগণিত নরনারী।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে সত্যপীর, মাণিকপীর ছাড়াও তোর্সাপীর, খন্দকারপীর, ল্যাংড়াপীর, জেঠা পীর, পীর মখদুম, বালাপীর, বদরপীর প্রভৃতি পীরগণ বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকেন।

(ক) সত্যপীরের গান : বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও পীর মাহাত্ম্যসূচক বহু পাঁচালী এবং গীত প্রচলিত আছে। মধ্যযুগে হোসেনশাহের আমল থেকেই পীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য ও পাঁচালী রচনার যে জোয়ার এসেছিল সেই ধারাটা তার পরেও অব্যাহত ছিল বেশ কিছুকাল। সত্যপীরের মাহাত্ম্যসূচক নানা কাহিনী এখনো বিশেষ পরব উপলক্ষ্যে গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে বাংলার নানাপ্রান্তে। 'সত্যপীরের' অসীম ক্ষমতা। তাঁকে বন্দী করে রাখা যায় না। কোন লৌকিক অস্ত্রে তাকে আঘাত করা যায় না। তিনি দুর্বলের সহায়, দুষ্টের যম। তাঁর দয়ায় নির্ধনের ধন হয়। মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়।

উত্তরবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যপীর বা 'সইত্যপীরের গান' এখনো জনপ্রিয় পালাগান হিসাবে বিবেচ্য। কোন বিশেষ পরব বা সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যেই সাধারণত এই গানের আসর বসে থাকে।

নির্দিষ্ট স্থানে ঘেরা জায়গায় বসে এই পালাগানের আসর। মূল গায়েন ছাড়াও আরো কয়েকজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীও থাকেন। খোল করতাল, দোতরা এবং খঞ্জনীই প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমে সত্যপীরের থানের দিকে মুখ করে মূল গায়েন দেববন্দনা ও গুরুবন্দনা করেন—

'প্রথমে বন্দিনু মুই দেব পঞ্চাননে।
বন্দিনু মুই আধাকৃষ্ণ-গৌর নিতাই।
বন্দিনু মুই এ জাহানে সব্বপীর জনে।
সবশেষে বন্দিনু মুই সইত্যপীর-চরণে।
তুমি শিব, তুমি ব্রহ্মা, তুমি নারায়ণ।
এ আসরে আইজ গাজী-দাও দরশন।

এরপরে হাতের চামর দুলিয়ে মূল গায়েন পালা শুরু করেন বেশ ভক্তি সহকারে।

এই পালা কোন কোন ক্ষেত্রে দুতিন দিন ধরেও চলে, সত্যপীরের পালাগানে নানাকাহিনী এবং উপকাহিনী থাকার জন্যই সময় বেশী লেগে যায় এই পালাগানে।

সত্যপীরের যেসব পালা আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সদাগর পালা, সাধুর পালা, মুচীর পালা, রাজার পালা, মালঞ্চার পালা প্রভৃতি। সবপালারই শেষে সত্যপীরের জয় ঘোষণা করা হয়। মূল গায়েনের সঙ্গে একজন ভাঁড়ও থাকে। থাকে নাচিয়ের দল এবং অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। প্রয়োজন মতো উঠে এসে অভিনয় করে থাকেন তারা।

উত্তর দিনজাপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুরে এমন একটা পালাগানে উপস্থিত থেকে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজো অক্ষয় হয়ে আছে স্মৃতিপটে। সেই পালার কাহিনীটা ছিল এই রকম—একবার সত্যপীর এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ ব্রাহ্মণ ছিলেন স্কুলে শিক্ষক। দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলেন সত্যপীর। একদিন ঐ ব্রাহ্মণের খুব জ্বর হওয়ায় সত্যপীরকেই তিনি স্কুলে পাঠালেন। সত্যপীর বেশ ভালভাবেই দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু ঐ স্কুল যে দুই রাজকুমার পড়তেন তাঁরা অল্পবয়স্ক গুরুকে অমান্য করে গণ্ডগোল পাকাতে লাগলেন। সত্যপীর তাদের কঠিন সাজা দিলে দুইজনই মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো রাজ সেনারা। বন্দী হলেন সত্যপীর। বন্দী অবস্থাতেই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন সত্যপীর—

"সইত্য ছারা মিথ্যা মুই না করি আচার।
হামাক্ সাজা দিবেন আজা করিয়া বিচার।
হিঁদুর দেওতা মুই মোমিনের পীর।
সকলেই জানে মোকে নাম সইত্য পীর।"

কিন্তু সেনাপতি কোন কথাই শুনতে চান না। জোর করে টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন সত্যপীরকে রাজার কাছে। তখন সত্যপীর আবার কাতর স্বরে প্রার্থনা জানান—

'ছারো ছারো সেনাপতি ছারি দাও মোরে।
সইত্য পথে থাকি মুই বাইন্ধন যাক্ দূরে।'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধন খুলে যায় সত্যপীরের। খবর যায় রাজার কাছে। ছুটে আসেন স্বয়ং রাজা। মুক্ত অবস্থা দেখে রাজা তাঁকে প্রশ্ন করেন—

'কহ কহ সইত্যপীর বাইন্ধন কেন খুলে ?
কি উপায়ে হস্ত বাইন্ধন করা যায় হেলে ?'

তখন সত্যপীর জানান রাজার কাছে যে লক্ষ টাকা দামের রুমাল আছে একমাত্র সেই রুমাল দিয়েই তাঁকে বন্ধন করা সম্ভব। তখনি রাজা সেই রত্নখচিত বহুমূল্য রুমাল দিয়ে সত্যপীরের হাত বাঁধলেন। এবার রাজসৈন্যরা মহা উল্লাসে সত্যপীরকে নিয়ে চললো রাজার কারাগারের দিকে। সত্যপীর তখন দর্শক শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে গান ধরেন—

'হস্ত বাইন্ধন, মস্তক বাইন্ধন,
বাইন্ধন সারা দেহা।
বাইন্ধনের বিষেতে মোর

সব্ব অঙ্গে জ্বালা!
কুন্ দোষেতে বিধিরে মোর
হই ছুরে নিদয়া?
বাইন্ধন মোর এ জাঞ্জালে
কে দিবে খুলিয়া?

বাদ্যযন্ত্রের করুণ সুরে ঐ গান আরো করুণতর হয়ে ওঠে। হায়, হায়, করে ওঠে দর্শক শ্রোতার হৃদয়। ছুটে যায় তারা। খুলে দেয় সত্যপীরের বন্ধন। সকলের মাথায় চামর বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন সত্যপীর।

কিন্তু রাজসেনারা আবার বন্ধন করে সত্যপীরকে এবং টানতে টানতে নিয়ে যায় কারাগারে। হায় হায় করতে থাকে দর্শক শ্রোতারা।

অন্ধকার কারাগারেও সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় অচিরেই। সেই কারাগারে বন্দী ছিলেন যাঁরা তাঁরা সব একে একে এসে হাজির হন সত্যপীরের কাছে। তখন সত্যপীর তাঁদের প্রশ্ন করেন—

—'তুম্‌রা হৈলে কেত জন?
—মোরা হই একশো হাজার।
—কুন্ দোষে তুম্‌রা আছেন এইখেনে'?
—মোরা ছেকেত্তনের দোষে।
মোরাছে আজানের দোষে।

সত্যপীর হেসে ওঠেন। তার পরে বলেন—

'শুন শুন সব্বাই
আজান-কেত্তন নয়!
হরি আর আল্লারে
একসনে পাওয়া চাই।
আল্লা হরি-হরিবোল
এই ধ্বনি তোল ভাই।'

দুহাত ওপরে তুলে সত্যপীরের সঙ্গে বন্দীরা মেতে ওঠে আল্লা-হরির নাম সংকীর্তনে! কারাগারের বন্ধ দ্বার খুলে যায় সেই নামগানের জোয়ারে। সমবেত দর্শক শ্রোতারাও দুহাত ওপরে তুলে মেতে ওঠে নাম গানে। মহামিলনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় পালাগান।

পরম পুলকে উৎফুল্ল জনতা ফিরে যায় ঘরে। মুছে যায় অন্তরের আবিলতা। ঘুচে যায় অন্ধকার। দূর হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প। দৃঢ় হয় হিন্দু এবং মুসলিম ঐক্য। সাম্প্রদায়িক মেল বন্ধনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে এই সত্যপীরের গান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে!

এই পালাগানটি সাধারণভাবে 'সইত্য পীরের গান বলেই পরিচিত ঐ অঞ্চলে। কোন লিখিত পুঁথির সন্ধান পাইনি আমি। গায়েন এবং অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন

তাঁরা সব মুখে মুখেই সংলাপ তৈরী করে বলে যান। ঐসব সংলাপে আঞ্চলিক কামতাপুরী এবং বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটে থাকে প্রায়ই।

এই পালাগানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো দর্শক-শ্রোতার নাটকে অংশ গ্রহণ। প্রথমবার তারা ছুটে এসে সত্যপীরের হাতের বাঁধন খুলে দেয় এবং দ্বিতীয়বার সকলে সত্যপীর ও অন্যান্য বন্দীদের সাথে একযোগে মেতে ওঠে আল্লাহরির নাম সংকীর্তনে। দর্শক শ্রোতার অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েইতো নাটক যথার্থ লোক নাটক হয়ে ওঠে। 'সইত্যপীরের গান' যথার্থ্যই লোক নাটক। শত শত বৎসর ধরে এই পালা যথার্থ্য লোক নাটকের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়িয়ে দেয় এই লোকনাট্যগুলো।

প্রসঙ্গত বলা দরকার কৃষ্ণ হরিদাসের 'বড় সত্যপীর' ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথির সঙ্গে 'সইত্যপীরের গানের কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ঐ গ্রন্থের মালঞ্চার পালা অংশের নির্দয় রাজার সঙ্গে এই পালার রাজার সাদৃশ্য দেখা যায়। মালঞ্চায় সত্যপীর ব্রাহ্মণের পোষ্য পুত্র এবং স্কুলে পড়াতে গিয়ে তিনিও মেরে ফেলেন রাজপুত্রকে। তবে এখানে দুই রাজপুত্রের কথা বলা হয়েছে। অন্য মিল দেখা যায় না। এমন হতে পারে কৃষ্ণ হরিদাসের পাঁচালী হয়তো লোকমুখে উত্তরবঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল কোনভাবে এবং পরে ঐ পালার সঙ্গে হয়তো অন্যান্য ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে কৃষ্ণ হরিদাস তাঁর পুঁথির উপাদান হয়তো উত্তর দিনাজপুরের ঐ অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। কে জানে কোনটা সত্য ?

(৬) রংপাঁচালী :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ধরণের রঙ্গ-রসাত্মক নাটকের প্রচলন আছে যা সাধারণভাবে রংপাঁচালী বা 'অং পাঁচালী' নামে খ্যাত। এইসব নাটকের শুরু ও সমাপ্তি দুইই হাস্য রসে রসায়িত। দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে হাস্যরসের সঞ্চার করাই রংপাঁচালীর মূল উদ্দেশ্য।

মূল গায়েনকে বলে 'বাতেয়া' অর্থাৎ যিনি বর্ণনা করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অন্যান্য কুশীলবরা থাকেন। স্ত্রী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করে থাকেন। কতকগুলো বাঁধা ধরা চরিত্র থাকে যেমন ঘটক বা কারুয়া, কাজী, পঞ্চায়েত প্রধান, জোতদার, মোড়ল, কৃপণ ধনী ইত্যাদি। এঁদের কাজ কর্মের বিশ্লেষণ করা হয় নাটকীয়ভাবে ব্যঙ্গাত্মক দিক দিয়ে। আবার পারিবারিক ও সামাজিক কোন মজাদার ঘটনাকেও তুলে ধরা হয় হাস্য রসের মাধ্যমে। আদিরসাত্মক ঘটনাও পরিবেশিত হয় কোন কোন রংপাঁচালীতে। বাঁশী, ঝুমুর, করতাল, দোতারা, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে এসব নাটকে।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার ভেঁউড়, তরঙ্গপুর, মোস্তফানগর, রাতুন, হাটকালিয়াগঞ্জ, আখানগর, আনাউন ও তার আশে পাশে এই রংপাঁচালীর বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে। ঐ অঞ্চলে ক্ষেত্র গবেষণার কালে এর পরিচয় পেয়েছি। এখানে আমার দেখা ও শোনা দুটি রংপাঁচালীর বর্ণনা দেব এবার। আসর বসেছিল ভেঁউড়ে।

(ক) বিনু মিঞা : মোস্তফানগরের রাজবংশী মেয়ে সুবলাকে ফুঁসলে নিয়ে চলে যায় পূর্ব তরঙ্গপুরের বিনুমিঞার ছেলে হাসিম। শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে যায় দুজনেই।

তখন ঘটক বা কারুয়া চেষ্টা করতে থাকে যাতে তাদের বিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সুবলার বাবা গরীব হলেও ধর্ম যাবার ভয়ে রাজী হয় না কিছুতেই। বরং মেয়ের বাবা ক্ষতি পূরণ দাবী করে বিনুমিঞার কাছে। তর্কাতর্কি চলে। আসর গরম হয়ে ওঠে। গায়েন তখন্ বিষয়টিকে লঘু করার জন্যে গান ধরেন—ঘুরে ঘুরে।

'ও দাদারে, বাপ্‌রে বাপ্ কলির কেমুন ঘটনা।
মোছলমানী ছুয়া চায় হিঁদুর কইন্যা বিহা করিবার।
কোর্টে গেইলে হাকিম সাহেব দিবেন ডিক্রী জারি।
খাইট্‌বেনা আর জারি জুরি টাইনতে হবে ঘানি।
ও দাদারে, বাপ্‌রে বাপ্—কলির কেমুন ঘটনা!
কলিকালের ঘটনা দেইখ্যা রঞ্জিত বাবু প্রাণে বাঁচে না।

(গায়েন সুযোগ বুঝে আমাকেও জুড়ে দিলেন গানে। আসলে মুখে মুখেই যে রচিত হয় এসব লোকগান ও লোক পালা)।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় বিচার সভা বসেছে। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান, গাঁয়ের মোড়ল, বিনু মিঞা, সুবলা ও তার বাবা এবং হাসিম উপস্থিত। বিচার শুরু হলো। উভয়পক্ষের অভিভাবক এবং ছেলে ও মেয়ের বক্তব্য শোনার পরে মোড়ল ও প্রধান বিনুমিঞার ছেলে হাসিমকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০০ টাকা জরিমানা করলেন। কিন্তু বিনু মিঞা ঐ জরিমানা দিতে রাজী হলো না কিছুতেই। ছেলে দোষ করেছে বাপ কেন জরিমানা দেবেন? এই তাঁর বক্তব্য। জমে উঠলো বাক বিতন্ডার আসর।

এবার আসরে উঠলেন গায়েন এবং সঙ্গে তাঁর ভাঁড়। ঘুরে ঘুরে হাসাতে লাগলেন তারা দুজনে নানা মজার মজার কথা বলে—

'কইন্যা-ছুয়ায় কৈলে দোষ
বাপের পরাণ যায়রে যায়!
ও, হায় রে কলি কাল,
কেতই আজব ঘটনা!
দেকেন-বুঝেন-দেকেন সব্বজনা!
ও, হায়, হায়, হায়—হায়রে কলি কাল!
—বাপ মায়েরা শোনেন দিয়া কাণ।

কপাল চাপড়াতে থাকেন গায়েন, ভাঁড় ও অন্যান্যরা। হাসির রোল পড়ে যায় দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে।

শেষ পর্য্যন্ত বিনু মিঞা ৩০০ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই পেলেন। হাসিমের কাণ ধরে টানতে টানতে বাড়ী নিয়ে চললেন বিনু মিঞা। সেই সঙ্গে চললো বেদম প্রহার। মারের চোটে হাসিম কাঁদতে কাঁদতে লাফাতে লাগলো। দর্শকরা ফেটে পড়লো উল্লাসে হাসতে লাগলো সুবলাও! হাসি পেল আমারও! ভাঁড়কে নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘরে গায়েন গাইতে লাগলেন—

ঘরের ছুয়া ঘরত চল্!
পীর পুকুরে ডুবাই গল্।

পীরিত বাঁশী গলায় ফাঁসি
হায় হালুয়ার কল্।
সেই কলেতে জবাই হাসিম
করিম্ কিহায় বল ?
ও দাদারে, হায়, হায়, হায়,
কলির কেমুন ঘটনা !

(খ) মলুয়া মোড়ল : এই রংপাঁচালীতে এক জোতদার ও ঝাড়ুদারনীর প্রেমকাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। গ্রামের এক জোতদারের সঙ্গে বাজারের এক যুবতী ঝাড়ুদারনীর দীর্ঘদিন ধরে প্রণয় চলছিল। যুবতীর নাম মলুয়া। মলুয়ার স্বামী আবার কালিয়াগঞ্জের হাসপাতালের ঝাড়ুদার। নাম কালুয়া। মাঝে মাঝে সে তরঙ্গপুরে আসে। রাত্রি কাটিয়ে আবার ফিরে যায় সকালে।

সেদিন কালুয়ার আসার সম্ভাবনা নেই ভেবে রাত্রির অন্ধকারে মোড়ল এসে ঢুকেছে মলুয়ার ঘরে। এর কিছুপরেই হঠাৎ এসে হাজির কালুয়া। বাইরে থেকে সে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকে—

'খুল্ খুল্ খুলরে দূয়ার
হাই মোর নারীরে !
পরাণ জুরাই চাঁদমুখ
ঐ একবার দেখিয়া রে।

মলুয়া পড়ে যায় বিপদে। একদিকে মোড়ল অন্যদিকে কালুয়া। কি আর করে মোড়লকে খাটের নীচে ঢুকিয়ে সে বলে ওঠে—এত্ত আইতে কোন্ বা চিল্লায় রে ?

কালুয়া— মুই হনু তোর ভাতার কালু
খুল্রে দূয়ার খুল্ !
মলুয়া— নাই পারিম্ মুই নিদ চোখেতে।
যা চলিয়া তুই !
কালুয়া— নাই যাম্ মুই ঘর ছ্যরিয়া
খুলরে দূয়ার খুল্ !
মলুয়া— ক্যাচাল কেনে করিস রে তুই
অকামা তুই হাসপাতালে যা।
কালুয়া— নাই যাম্ মুই হাসপাতালে
এই বসিম্ দূয়ার-আগত !

কালু বসে পড়ে দরজার মুখে। রাগে গজ গজ করতে থাকে সে। এবার গায়েন দর্শক শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হেলে দুলে গাইতে থাকেন—

দ্যাকেন দ্যাকেন বাবু মশাই
দ্যাকেন বিবিরা।
হায় মলুয়ার ছুতা দেকেন

ঢাউসা নারী কিবা ?
আজার দোষে আজা নষ্ট
ধত্তি কাঁপে ভরে।
তিরির পাপে নষ্ট পুরুষ
ভাত নাই তার ঘরে।

এবার ভাঁড় শুরু করে—

কুষ্ঠি গেলেন মোড়ল মশাই
নুকটা নেবেন কি ?
খাটের তলত্ হ্যাংলা মোড়ল
হিল্ হিলা হিল্ হি !

দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন ওঠে। ছিকো ছিকো বলে টিট্কারিও দিতে থাকে অনেকে। রাত বেড়ে চলে কালুয়া ঘুমে ঢুলতে থাকে দরজার বাইরে বসে। এইই সুযোগ। মোড়ল মশাই সন্তর্পনে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেই 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে কালুয়া! জাপটে ধরে মোড়লকে। তার পরে মোড়লকে চিনতে পেরেই জিভ্ কাটে কালুয়া। বলে ওঠে—

'বাবু তুই ? কাজিয়ায় কাম নাই।

দে, দে, বিড়ি দে। মাউগ্ টাগ দেখ্ বা হবে।'

মোড়ল বিড়ি দেয় কালুয়াকে। ওদিকে কালুয়ার চিৎকার শুনে জেগে উঠেছে অনেকেই। 'কি হৈল কি হৈল ? বলে তেড়ে আসে তারা। সেদিকে তাকিয়েই ছুট লাগায় মোড়ল। কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় মোড়ল। আবার উঠে দৌড়। খুলে যায় কাপড়ের কোছা! হো-হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই।

সকালে দেখা যায় মোড়ল এসে কালুয়ার হাতে গুঁজে দিচ্ছে একটা দশ টাকার নোট! কালুয়া খুশী হয়ে বলে ওঠে—

'—বোতলের দাম পাই। কাজিয়ায় কাম নাই'!

শ্রোতা দর্শকরা মুখটিপে হাসে কালুয়ার আচরণে। পঞ্চায়েতে ওঠেনা এমন রসাত্মক মামলাটা। ওখানেই শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনাটা তরঙ্গপুরে খুবই আলোড়ন তুলেছিল এক সময়!

এই রংপাঁচালীটি একটু আদির রসাত্মক। তবে এমন বহু মজাদার ঘটনাকে অবলম্বন করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আজো রচিত এবং অভিনীত হয়ে আসছে বহু রংপাঁচালী।

রংপাঁচালীর মূল উদ্দেশ্য হাস্যরস পরিবেশন করা হলেও সমাজ গঠন এবং নীতি শিক্ষার দিক দিয়ে এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া এগুলো অন্যান্য লোক নাটকের মতোই সমসাময়িক সমাজের আঞ্চলিক সমাজ দর্পণও বটে।

বিংশতি অধ্যায়

লোক কথা—উৎস ও অভিপ্রায়

লোক সাহিত্যের অন্যতম বিশেষ অঙ্গ হলো লোককথা। লোক সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মতোই লোক কথাও মুখে মুখেই প্রচারিত হয়ে থাকে বংশপরম্পরায়। অসাধারণ প্রাণ শক্তির জোরেই লোক কথা যুগ যুগ ধরে টিঁকে থাকে সমাজের বুকে। লোককথার আবেদন সুদূর প্রসারী। একই লোককথা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আবার অন্য দেশেও প্রচলিত থাকতে পারে।

প্রথমত, লোক কথার মধ্যে নানাবিষয়ে গল্প থাকতে পারে। রূপকথা, পশুপাখী, ভূতপেত্নী, ধাঁধাঁ, ম্যাজিক, গাছ পালা, ব্রত, নদী, সাগর-পুকুর প্রভৃতি কতো বিচিত্র বিষয়কে নিয়েই না কার বার এই লোককথার।

দ্বিতীয়, এই লোককথা কোন বিশেষ জাতি দেশ বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে না। এখানেই লোককথার সার্বজনীনতা।

তৃতীয়, লোক কথার মধ্য দিয়ে যে নীতি উপদেশ দেওয়া হয় তা সর্বকালে সর্বদেশেই সত্য।

চতুর্থ, লোককথার মধ্যে যে রস সৃষ্টি হয়ে থাকে তা যুগ যুগ ধরে রসপিপাসুদের আনন্দ দান করে থাকে।

পঞ্চম, লোক কথার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পুনরাবৃত্তি। একই কথা ফিরে ফিরে চলে আসে।

ষষ্ঠ, লোককথা যেমন ধীর লয়ে শুরু হয় তেমনি শেষও হয় ধীর লয়ে। কোন তাড়া নেই গল্প শেষ করার।

সপ্তম, লোক কথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজ সারল্য ও সাবলীল গতি। কাহিনী বা চরিত্রের বর্ণনায় কোন জটিলতা থাকে না।

অষ্টম, লোক কথায় দুষ্টের সাজা এবং শিষ্টের মঙ্গলই যেন মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে বহুক্ষেত্রেই।

নবম, লোক কথার রূপ কথা অংশে ইন্দ্রজালের প্রভাব দেখা যায়। বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশও লক্ষ্য করা যায় এই সব গল্পে।

দশম, ব্রত কথা আশ্রিত গল্পগুলোর মধ্যে ধর্ম ভাব জাগানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় বহুক্ষেত্রেই।

একাদশ, হাস্যোদ্দীপক গল্পগুলির মাধ্যমে নির্মল হাস্যরস প্রচার করার চেষ্টাই হয়ে থাকে।

দ্বাদশ, লোক কথা অনেক সময় উচ্চতর সাহিত্যের উপাদানও সরবরাহ করে থাকে দেখা যায়।

ত্রয়োদশ, লোক কথার সব থেকে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হলো এইসব গল্প বা কথার মধ্যে নৃতত্ব, জাতিতত্ব এবং মানব ইতিহাসের বহু বিলুপ্ত অধ্যায়েরও সন্ধান পাওয়া যায় অনেক সময়।

(১) উত্তরবঙ্গের লোক কথা :

যুগ যুগ ধরে বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য লোককথা। রান্নাঘরে, চণ্ডীমণ্ডপে, গাছের ছায়ায়, কৃষিক্ষেতে, ঠাকুর্দা, ঠাকুমার বিছানায়, মা মাসীদের মুখে মুখে কতো গল্পই না তৈরী হয়েছে যুগ যুগ ধরে। ঐসব লোককথা যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনিই দিয়েছে নীতি শিক্ষাও।

আজো উত্তরবাংলার মায়েরা মধু মালা, মদন কুমারের গল্প বলতে বলতে চোখের জলে ভাসেন। দিদিমা-ঠাকুমারা রূপধন, বৃষকেতু, হরিশচন্দ্রর মতো কতো করুণ কাহিনীই না শোনান নাতি-নাতনীদের।

আবার বিভিন্ন ব্রত কথার গল্পগুলো কতো আন্তরিকতার সঙ্গেই না বলা হয় অন্যদের কাছে।

উত্তরবঙ্গের লোককথার মধ্যে পৌরাণিক গল্প যেমন আছে তেমনি আছে রূপকথা, লৌকিকও অলৌকিক কাহিনী, ভূত, প্রেত, পশুপাখী, গাছপালা, নদীনালা, দীঘি, পাহাড় পর্বত, ব্রতকথা, আবার এইসব লোককথার মধ্যে ইসলামী গল্প কাহিনীও স্থান করে নিয়েছে দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত একটি রাজবংশী লোক কথা হলো (১) **'বচা ও শিয়ালের কথা**। বাংলার অন্যান্য অংশে প্রচলিত শিয়াল পণ্ডিত ও কুমীরের গল্পই আসলে বচা ও শিয়ালের গল্প। তবে অন্যত্র সাতটি কুমীর ছানার কথা আছে কিন্তু উত্তরবঙ্গের গল্পে দশটি ছানার কথা আছে। তাছাড়া এখানে শেয়ালের গর্তে ঢুকে কুমীর শেয়ালকে আক্রমণ করেছে দেখা যায় কিন্তু অন্যত্র প্রচলিত গল্পে তা নেই। অন্যত্র প্রচলিত গল্পে শেয়াল গিন্নির কথা আছে কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গল্পে আছে কুমীর গিন্নির কথা। তবে মোটিফ ইন্‌ডেক্স অনুযায়ী প্রতারণা অভিপ্রায়টি কিন্তু ঠিকই আছে দেখা যায়।

(২) তিস্তা ও রঙ্গিতের কাহিনী (লেপচা) :

দার্জিলিং জেলার লেপচা সম্প্রদায়ের মধ্যে তিস্তা ও রঙ্গিতের প্রেমকাহিনী নিয়ে যে লোক কথাটি আছে তা যেমন মজার তেমনই চিত্তাকর্ষকও বটে। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

রঙ্গিত বলে একটি ছেলে তিস্তা বলে একটি মেয়েকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু দুজনেরই বাবা মা তাদের মেলা মেশায় আপত্তি করতো। কিছুতেই বিয়েতে মত দেয় না দুপক্ষের অভিভাবকরা। দুজনে ঠিক করলো অবশেষে সমতলে নেমে গিয়ে বিয়ে করবে তারা।

তাদের বন্ধু হলো তিতির পাখী আর এক গোখুরা সাপ। 'পেশকে' নোম বিয়ে করবে তারা ঠিক হলো। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তিস্তা হাজির হলেও রঙ্গিত দেরী করে ফেললো পৌঁছাতে। তিস্তার রাগ হলো। কথা বলে না সে অভিমানে। রঙ্গিত তখন আবার ফিরে যেতে চায় হিমালয়ের দিকে। তিস্তার মন নরম হলো, সে বললো, যদি তুমি আমার ওপর দিয়ে যাও তবে লোকে তোমার দেরী করে আসাটা ক্ষমা করে দেবে। বেশ তবে তাই হোক বলেই রঙ্গিত দিল লাফ। চিরদিনের মতো মিলে মিশে এক হয়ে গেল তারা।

এ কাহিনীর মূল অভিপ্রায়টি হলো প্রেম বা ভালোবাসা। ভালোবাসার টানে ঘর ছাড়ার ঘটনা বহুলোক কথা এবং নানা কাহিনীতেই পাওয়া যায়। সাপ এবং পাখীর বন্ধু রূপে পাশে আসাটাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সাপ সাধারণত খল্ প্রকৃতির। কিন্তু এখানে বন্ধু। সাপ যে মঙ্গলকারীও হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত এই লোক কথাটি।

পেশকের কাছে তিস্তা ও রঙ্গিতের মিলন ঐতিহাসিক ঘটনা। বর্ষাকালে এখনো দেখা যায় রঙ্গিত ঘোলা কাদা জল নিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তার ওপর দিয়ে। সম্ভবত লেপচাদের কোন পূর্বপুরুষ তিস্তা ও রঙ্গিতের মিলনকে উপলক্ষ্য করেই এই লোককথাটি তৈরী করে থাকবেন তারপর থেকে লোকমুখে চলে আসছে এই গল্পটি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার লেপচা ভাষায় এই গল্পটির নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে ঐ নাটকটি।

লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য লোককথাগুলো হলো দুইভাই, ভালুক ও বাঘ, সম্বর ও বানর, অনাথ ছেলে প্রভৃতি।

(৩) কচ্ছপের কথা (রাভা) :

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির এবং কুচবিহার-জেলার রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে বহু লোককথা। ঐসব গল্পের মধ্যে 'কচ্ছপের কথা' গল্পটি বিশেষ অর্থবহ।

বহুযুগ আগে কোন এক গৃহস্ত বাড়ীর লোকেরা একদিন মাংস না পেয়ে মনের দুঃখে নিরামিষই আহার করতে বসেছে এমন সময় গুটি গুটি সেখানে এসে হাজির হলো এক কচ্ছপ। সকলে ভাবলো বুঝি ভগবানই দয়া করে পাঠিয়েছে ঐ কচ্ছপকে তাই সেটিকে রান্না করে খেয়ে নিল মনের সুখে।

কিন্তু তারপরেই ঘটতে শুরু করলো মজার ঘটনা। মাংস খাবার পরে সকলেই কচ্ছপ হয়ে একে একে ঢুকে গেল মাটির গর্তে। ওদিকে বাড়ীর কর্তা মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখেন কেউ ঘরে নেই। রান্নাঘরে দেখতে পেলেন তখনো বাটিতে কিছুটা কচ্ছপের মাংস রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাকী মাংসটা বাইরে ফেলে দিলেন কর্তা। আর তখনই মানুষ মূর্তি নিয়ে একে একে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। কর্তা বুঝতে পারলেন তারা আসলে ঐ কচ্ছপেরই বংশধর। সেই থেকেই রাভা সম্প্রদায়ের 'পমরেই হুসুক' গোত্রের লোকরা কচ্ছপ খায় না কখনো।

এই লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় নজরে পড়ে। প্রথমত, ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বা কোন কিছু খেয়ে দৈহিক রূপ পরিবর্তন, দ্বিতীয়ত, 'টাবু' ভঙ্গের জন্য শাস্তি বা রূপান্তর, তৃতীয়ত, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সকলের উদ্ধার।

আদিবাসী সমাজে বিভিন্ন জীবজন্তুই যে তাদের আদি পুরুষ এই ধারণা প্রচলিত আছে আজো। রাভাদের হাসুক গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে তারা কচ্ছপেরই বংশধর।

এই গল্প থেকে আরো জানা যায় যে অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতই রাভাদের মধ্যেও 'টোটেম বিশ্বাস' থেকেই বিভিন্ন লোককথা বা উপকথার উৎপত্তি হয়েছে এবং 'টোটেমই' তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্মদাতা কেন না—"The totem is not exactly a god, but a cognate being and one to be respected."

(—'The philosophy of Religion'—D. Miall.)

কচ্ছপ হুসুকদের পূর্ব পুরুষ তার মাংস খেয়ে টাবু ভেঙেছে অতএব শাস্তি হয়েছে এবং গৃহকর্তার স্থির বুদ্ধিতে উদ্ধার পেয়েছে সকলে।

রাভাদের বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রের মধ্যে এই ধরণের টোটেম আশ্রিত বহু লোককথা প্রচলিত আছে।

(৪) সাঁওতালী লোককথা :

উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শেয়াল, কুমীর, হাতি, সাপ, কচ্ছপ, পাখী, বাঘ প্রভৃতি নিয়ে প্রচলিত আছে বহু লোককথা। এখানে হাতি ও পিঁপড়ে নিয়ে যে মজার গল্পটি প্রচলিত আছে সেটিরই উল্লেখ করবো এখন।

(৫) হাতি ও পিঁপড়ের কথা :

হাতি সবচেয়ে বড় জন্তু বলে বনের অন্যান্য প্রাণীদের সে গ্রাহ্যই করে না। একদিন দুই পিঁপড়ে হাতির শুঁড়বেয়ে ওপরের দিকে উঠতেই হাতি রেগে লাল। তোদের সাহস তো কম নয়? নেমে যা এক্ষুণি, নইলে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলবো তোদের।' হাতির হুমকিতে ভয় না পেয়ে পিঁপড়েরা বললো, 'বেশ তো, পিষেই মারো না দেখি।' হাতি রেগে গিয়ে শুঁড় দোলাতে লাগলো। কিন্তু শুঁড় কামড়ে পড়ে রইল পিঁপড়েরা হাতি ফেলতে পারলোনা তাদের কিছুতেই।

এবার পিঁপড়েরা বললো, 'দৌড়েও পারবেনা তুমি আমাদের সঙ্গে। চেষ্টা করেই দ্যাখো।' হাতি হো-হো করে বন কাঁপিয়ে হাসলো অনেকক্ষণ। তারপরে কি ভেবে রাজীও হয়ে গেল দৌড়াতে। পিঁপড়েরা দৌড়ের স্থান ঠিক করে বাড়ী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দৌড় শুরু করতে বললো হাতিকে। সামান্য পিঁপড়ের সঙ্গে দৌড় এত তাড়া কিসের? এইভেবে হেলতে দুলতে চলতে লাগলো গর্বিত হাতি। বেশ কিছুটা যাবার পর তাকিয়ে দেখে পিঁপড়ে দুটো তার আগে আগে চলছে। গতি বাড়ালো হাতি। বেশ কিছুটা দৌড়াবার পরে থামলো হাতি। নীচে তাকিয়ে দেখে আগে আগে চলছে দুই পিঁপড়ে। হাতি রেগে গেল। 'বটে? এবার আয় দেখি? বলে প্রচণ্ড বেগে দৌড় লাগালো হাতি। মাইল কয়েক যাবার পরে এবার ক্লান্ত দেহে থামলো একটা গাছের ছায়ায়। তাকিয়ে দেখে সামনেই চলেছে পিঁপড়ে দুটো। 'ওরা উড়ছে নাকি? এই ভাবে আবার দৌড়াতে লাগলো সেই ক্লান্ত হাতি বনভূমি কাঁপিয়ে। কিন্তু যতবারই থামে ততবারই দেখে পিঁপড়েরা আগে।

কিছুতেই আগে যেতে পারছেনা হাতি। রেগে গিয়ে দ্বিগুণ জোরে ছুটতে লাগলো হাতি। ঘাম ঝরছে। মাথা ঘুরছে। পা টলছে। তবু ছুটছে সে। ছুটছে আর ছুটছে। কিন্তু মাইলের পর মাইল চলে গেছে যে পিঁপড়ের সারি তাদের হারাবে কি করে সে?

ছুটতে ছুটতে অবশেষে ক্লান্ত দেহে ধপাস্ করে বন কাঁপিয়ে পড়ে গেল একসময়ে। আর উঠলোনা। ভবলীলা সাঙ্গ হলো তার।

গল্পটি বিশ্লেষণ করলে প্রতারণা করে জয় লাভ করার অভিপ্রায়টিই মনে জাগে। ক্ষুদ্রের কাছে বড়র পরাজয় বহু গল্পেই দেখা যায়।

বাস্তবে সবলকে পরাজিত করতে না পেরে গল্পের জগতে তাদের নির্বোধ সাজিয়ে এভাবেই বুঝি মানুষেরা দেশে দেশে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছে। এই গল্পেও হাতির উৎপাতে সদা সন্ত্রস্ত সাঁওতাল সম্প্রদায় হাতিকে নির্বোধ ও হাস্যাস্পদ করে মানসিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে দেখা যায়। এই ধরণের গল্পের পিছনে হয়তো তাদের অতীত দিনের আরণ্যক জীবনের অভিজ্ঞতাও ক্রিয়া করে থাকতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে রচিত হয়েছে এমনই কতো সব বিচিত্র গল্পকাহিনী। হারিয়ে গেছে কতো সব কথা ও কাহিনী। বয়স্ক ও বয়স্কাদের কাছে যদি এখনো সন্ধান করা যায় তবে হয়তো এখনো মিলতে পারে এমন সব কতো বিচিত্র স্বাদেরই না গল্প! রূপকথা থেকে শুরু করে পশুপাখী-ভূত-প্রেত, গাছ-পালা কেন্দ্রিক কতো গল্পই না ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের গাঁয়ে গঞ্জে। আগ্রহী গবেষকরা যদি চেষ্টা করেন তবে পেতে পারেন প্রচুর এই সব উপাদান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে।

একবিংশতি অধ্যায়

লোকপুরাণ—উৎস ও অভিপ্রায়

আদিমযুগে অসহায় মানুষ বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে সৃষ্টির অন্তহীন রহস্যের দিকে। উপলব্ধি করতে চেয়েছে সৃষ্টির অনন্ত ব্যাপ্তিকে। জানতে চেয়েছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ ও তার স্রষ্টাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে—ঝড় ঝঞ্ঝা, বন্যা, মড়ক, দাবানল ও ভূমিকম্পে থর্ থর্ কেঁপেছে অসহায় মানুষ। পরিত্রানের আশায় একাধিক দেবদেবীর কল্পনা করে শরণ নিয়েছে তাঁদের। শুরু হয়েছে দেবদেবীর পূজা। অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা যাগযজ্ঞ পার্বণ ও ব্রতাচার। সাধারণ নরনারীর ভয় বিহ্বলতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেকে সর্বজ্ঞ হিসাবে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য গোষ্ঠীপতি বা পুরোহিতরা সৃষ্টির নানাবিধ রহস্য সম্বন্ধে সৃটি করেছেন নানা কাহিনীর। এভাবেই দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে একাধিক কাহিনীর। প্রাচীন মানুষেরা বিশ্বাসও করে নিয়েছিল সেইসব কাহিনী। পুরাকালের ঐ সব কাহিনীর মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টির রহস্য যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি জীবের উদ্ভব, দেবদেবী ও ধর্মকথাও স্থান পেয়েছে দেখা যায়। কালক্রমে, পুরাকালে ঐসব ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল বলে মানুষের মনে জন্মে গেছে দৃঢ় বিশ্বাসও। পুরাকালের ঐসব পুরাকথা বা কাহিনীই আজকের লোক পুরাণ।

লোকপুরাণ আসলে আদিমযুগের মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসেরই ফসল। মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হলেও প্রাচীনকালের বহুবিধ চিন্তা বিশ্বাস, সংস্কার ও ধ্যান ধারণাকে ছাড়তে পারেনি আজো। যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে চলে এসেছে বহু গল্প, বহু কাহিনী—যা সৃষ্টি হয়েছে সুদূর অতীতে।

পৃথিবীর দেশে দেশে লোকপুরাণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে ভয়, বিস্ময় এবং অজ্ঞতা। আমাদের দেশেও রয়েছে নানাধরনের লোকপুরাণের ঐতিহ্য। ঐসব লোকপুরাণে বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে দেবদেবী, রামায়ণ মহাভারতের বহু ঘটনাও। পশুপাখী, লৌকিক দেবদেবী, চাঁদ, তারা, সূর্য্য প্রভৃতি নানাবিষয়ই স্থান পেয়েছে এই সব লোকপুরাণে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে নানাবিধ লোক পুরাণ। সৃষ্টিতত্ব থেকে দেবদেবী, মানুষ ও পশুর সৃষ্টি প্রভৃতি বহুবিষয়ই বর্ণিত হয়েছে ঐসব পুরাণে।

(১) লেপচা লোকপুরাণ :

(ক) পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব : লেপচা লোকপুরাণ অনুসারে জানা যায় যে আদিতে এই বিশ্ব ছিল জলময়। কোন জীব ছিল না তখন। সেই সময় পরম ঈশ্বর বা 'ইট-মো' একটি মাটির পাত্র নির্মাণ করে ভাসিয়ে দিলেন সেই জলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি সাপ তার ফণার ওপরে ঐ পাত্রটি ধারণ করে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। কালক্রমে ঐ পাত্রের ওপরে পড়লো একটা সবুজ সর। ঐ সবুজ সর থেকেই ধীরে ধীরে জন্মালো ঘাস,

লতা, পাতা এবং সবুজ গাছ পালারা। ক্রমে ঐ পাত্রটি হলো স্থলভাগ। ঈশ্বর পাখী ও অন্যান্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন।

ঈশ্বর দেখলেন গাছপালা এবং পাখীরা পরিচর্যার অভাবে শুখিয়ে মরে যাচ্ছে তখন তিনি মাখন থেকে মানুষের দেহ সৃষ্টি করে তাকে শক্ত করার জন্য ভিতরে পাথর ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু দেহে রক্ত না হলে বাঁচবে কি করে মানুষ? অতএব দেহে জল ঢুকিয়ে দিলেন। ঐ জলই হলো রক্ত। স্বর্গের জল লাল বলে রক্তের রঙও হলো লাল। আরো অন্যান্য উপাদান দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে দেহকে কর্মক্ষম করে তুললেন। তারপরে সৃষ্টি করলেন একই কায়দায় এক মানবী। দুজনে একই সঙ্গে বসবাস করতে লাগলো পৃথিবীতে এবং তাদের সন্তান সন্ততিতে ভরে গেল পৃথিবী।

এদিকে সেই সাপটি হিংসায় জ্বলে পুড়ে একদিন পাত্রটিকে ফেলে দিল জলে। সারা বিশ্ব জলে ডুবে গেল। জেগে রইল শুধ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াটি। সেখানেই আশ্রয় নিলেন আদি পিতা ফোরং থিং এবং আদিমাতা 'নাজোং নু'। ঈশ্বর রেগে গিয়ে মেরে ফেললেন সেই সাপটিকে। হিমালয় থেকে দুটো নদী সৃষ্টি করে তারপরে শুখিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে পাঠালেন। ধীরে ধীরে আবার মানুষ ফল ফুল ও শস্যে পূর্ণ হয়ে উঠলো সুন্দর পৃথিবী।

ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর সবদেশের লোক পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বেই দেখা যায় পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল তারপরে ঈশ্বর কালক্রমে স্থল ভাগ, গাছ পালা, পশুপাখী সৃষ্টি করে সব শেষে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। লেপচা পুরাণে যে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে বাইবেল থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাব্যে-মহাকাব্যেও সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাতে সেই প্লাবনের উল্লেখ দেখা যায়। বলা যায় লেপচাদের এই কাহিনী প্রাচীন বিশ্বাসেরই ক্রম অগ্রসর ধারা।

(খ) লেপচা জাতির উদ্ভব কাহিনী : লেপচা সৃষ্টিতত্ত্বের মতো লেপচা জাতির উদ্ভবের কাহিনীও বেশ চিত্তাকর্ষক।

মহাপ্লাবনের পরে আদি পিতা ও মাতা কাঞ্চনজংঘার চূড়াতেই বাস করতে লাগলেন। তাদের এবার যেসব সন্তান সন্ততি হলো সবই হলো শয়তান তুল্য। তারা পশু হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে।

ঈশ্বর বুঝতে পারলেন না ওরা কাদের সন্তান। শেষে তিনি একটি কুকুর দেখতে পেলেন। ঐ কুকুরটি ছিল 'না জোং নুর।' কুকুরটিই জানালো তাদের বাবা মার নাম। খুশী হয়ে ঈশ্বর আদেশ দিলেন যে মানুষকে সর্বদা কুকুর পুষতেই হবে এবং নাজোংনুকে ফোরংথিং এর সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করলেন। ওরা নিষেধ মানলো না। পর পর আটটি ছেলে হলো তাদের। সাতটিই হলো কদাকার। অষ্টমটি সুন্দর হলো, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে কদাকার ছেলেরা মেরে ফেললো সুন্দরটিকে। বাপ মা রেগে গিয়ে তাড়িয়ে দিলেন তাদের। অনুতপ্ত হয়ে নাজোং এবং ফোরং ক্ষমা চাইলে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করলেন এবং একে একে দশটি সুন্দর ছেলে হলো তাদের। মর্তে নেমে গিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলো তারা।

ঐ দশ ছেলেই লেপচাদের পূর্ব পুরুষ বলে বিশ্বাস করে লেপচারা। লেপচাদের বিশ্বাস তাদের আদিমাতা ও পিতা এখনো ঐ কাঞ্চনজংঘার চূড়ায় বসবাস করেন। কাঞ্জনজঙ্ঘা লেপচাদের কাছে তাই দেবস্থান হিসাবেই পূজিত আজো।

(গ) লেপচা পুরোহিত বনথিং এর কাহিনী : পৃথিবী যখন শয়তানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো তখন ঈশ্বর প্রয়োজনীয় ওষধি গাছপালা সঙ্গে দিয়ে 'বনথিং' কে পাঠালেন পুরোহিত করে। বনথিং ইন্দ্রজালের সাহায্য নিয়ে শয়তানদের জব্দ করেলেন এবং পশুবলির মাধ্যমে রোগ ব্যধি দূর করলেন।

টিক্কুমটেক হলো লেপচাদের আদি পুরোহিত এবং আদি স্ত্রী পুরোহিত হলেন 'নিকুং নায়াল'।

(ঘ) অন্যান্য পুরা কাহিনী : সূর্য্য, চন্দ্র, টেনডং পর্বত, স্বর্গযাত্রা প্রভৃতি বহু পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে লেপচা সমাজে। এইসব পুরাকাহিনীগুলির মধ্যে যেমন বহু নৃতাত্বিক ও পুরাতাত্বিক সূত্রের সন্ধান মেলে তেমনি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রাচীন প্রথা ও বিশ্বাসের ক্রমাগ্রসরমান ধারাটিও লক্ষ্য করা যায়। পূজা বা ব্রতাচারের সময়ে এইসব পুরাকাহিনীগুলি আবৃত্তি করা হয় বা গীত হয়ে থাকে।

(২) মালপাহাড়ী লোকপুরাণ :

বিহার থেকে উত্তরবঙ্গে আগত মালপাহাড়ীদের মধ্যেও নানা লোক পুরাণ প্রচলিত আছে। সৃষ্টিতত্ব ও মালপাহাড়ী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে।

(ক) সৃষ্টিতত্ব : মালপাহাড়ীদের সৃষ্টিতত্বের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তা ছিল নরম কাদার মতো তুলতুলে। শুধু পাহাড়গুলোই ছিল শক্ত। কালক্রমে পৃথিবীতে গাছপালা এবং পশুপাখী জন্মালো। ঈশ্বর পৃথিবীতে চার জোড়া স্ত্রীপুরুষ পাঠালেন। তারা আশ্রয় নিল পাহাড়ে। কিন্তু তারা আবার চার জোড়া স্ত্রী পুরুষ পাঠাতে অনুরোধ করলো ঈশ্বরের কাছে একাকীত্ব দূর করার জন্য।

ঈশ্বর তখন কুশগাছ থেকে চারজোড়া স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করে আবার পাঠালেন পৃথিবীতে। ঐ আটজোড়া স্ত্রী পুরুষ থেকেই পাহাড়ীদের আটটি বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে বনে মালপাহাড়ীদের বিশ্বাস। তবে কুশ থেকে যারা সৃষ্টি হয়েছে তাদের একটু ছোট জাত হিসাবেই দেখা হয়।

মালপাহাড়ীরা বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষরা 'ভূঁইদেও' বা পৃথিবী মাতাকে পূজার্চনার দ্বারা তুষ্ট করেই তুলতুলে নরম পৃথিবীকে ফুল-ফল-শস্যে রমণীয় করে তুলে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

অন্যান্য সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মালপাহাড়ী সৃষ্টিতত্ত্বের মূল পার্থক্য হলো অন্যত্র দেখা যায় পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল তারপরে ধীরে ধীরে স্থলভাগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্দমাক্ত পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে এবং শুধু পাহাড়গুলোই শক্ত ছিল বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অন্যত্র দেখা যায় প্রথমে ঈশ্বর আদি পিতা মাতাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের সন্তানরাই পৃথিবীকে নরনারীতে পূর্ণ করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মোট আটজোড়া

দম্পতিকে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর। ঐ আট জোড়া দম্পতি থেকে আটটি পাহাড়ী গোষ্ঠীর উদ্ভবের কথাই শুধু বলা হয়েছে অন্যান্য নরনারীর উদ্ভবের কোন কথা বলা হয়নি। মালপাহাড়ী পুরাণ কর্তরা কি শুধু পাহাড়ী গোষ্ঠীর উদ্ভবের কথাই ভেবেছিলেন ?

তৃতীয়ত, কুশ থেকে চারজোড়া দম্পতি সৃষ্টির মধ্যে ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টির ব্যাপারটাই লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রাদির দ্বারা কোন বস্তু বা প্রাণীকে অন্য বস্তু বা প্রাণীতে রূপান্তর করার বহু কাহিনী প্রচলিত আছে পৃথিবীর দেশে দেশে। রামায়ণে কুশের জন্মতো কুশ থেকেই হয়েছিল মন্ত্র দ্বারা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে। ঐ কাহিনী দ্বারা কি মালপাহড়ী পুরাণ কর্তারা প্রভাবিত হয়েছেন ?

চতুর্থত, দেখা যায় মালপাহাড়ীরা পৃথিবী মাতার কাছে প্রার্থনা করেছে পৃথিবীকে ফলে ফুলে শস্যে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেনি। তারা সেই ধরিত্রী বা পৃথিবী মাতাকেই পূজাচর্নার দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে যিনি কালক্রমে নারীর সঙ্গে সমার্থক হয়ে উৎপাদন ও সৃজন ক্ষমতার অধিশ্বরী রূপে দেশে দেশে পূজিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ধরিত্রীমাই মালপাহাড়ীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবী রূপে পূজিতা হন—'ভূঁই দেবতা' নামে।

(খ) মালপাহাড়ীদের উদ্ভবের দ্বিতীয় কাহিনী : মালপাহাড়ীদের মধ্যে তাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় কাহিনী থেকে জানা যায় যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে যখন দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে ঘুরছিলেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সেই সময়ে তাঁর গা থেকে প্রচুর ঘাম ঝরেছিল। ঐ ঘামের ময়লা থেকেই জন্ম হলো এক স্ত্রী ও পুরুষের পাহাড়ের দেশে। তাই তারা পরিচিত হলো মালপাহাড়ী নামে। এরাই নাকি মালপাহাড়ীদের আদি পিতামাতা। রামচন্দ্রের সঙ্গে নিজেদের উদ্ভবের কাহিনী জড়িয়ে মালপাহাড়ীরা গর্ববোধ করে।

এই কাহিনী বিশ্লেষণ করলে বিষ্ণুর দেহের ময়লা থেকে অসুর সৃষ্টি বা সৃষ্টি কর্তার দেহের ময়লা থেকে পৃথিবীর মাটি ও অন্যান্য জীবকুল সৃষ্টির কাহিনী মনে পড়ে যায়। শূণ্য পুরাণেও দেখা যায় ধর্মতার দেহের ময়লা থেকে বসুমতীকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার মালপাহাড়ীরা বৈশাখ মাসে রাম রামীর পূজার মধ্যদিয়েই বৎসরের শুভ সূচনা করে থাকে। প্রতিটি পরিবারেই রাম-রামীর পূজা হয় রীতিমতো নৈবেদ্য সাজিয়ে। রামচন্দ্রের গুণ কীর্তনও করা হয় ঐদিন পূজার সময়ে। বাড়ীর কর্তাই পূজা করেন অন্য পূজারীর প্রয়োজন হয় না। বেদীর সম্মুখে থাকে তীর ধনুক রামচন্দ্রের তীর ধনুকের প্রতীক রূপে কোন মূর্তি অবশ্য থাকে না।

(৩) নুনিয়া লোকপুরাণ :

উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নুনিয়াদের মধ্যেও প্রচলিত আছে নানা পুরাণ কাহিনী। নুনিয়াদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে তাদের এক পূর্বপুরুষ 'বিদুর-ভগত' তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে স্বজাতির উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নোনা মাটিতে বসে তপস্যা করার সময় তিনি উপবাস ভঙ্গ করায় রামচন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত হন। রামচন্দ্র অভিশাপ দেন যে উপবাস ভঙ্গ করায় বিদুর সিদ্ধি লাভে ব্যর্থ

হবেন। তার স্বজাতিরও কোন উন্নতি হবে না। নুন তৈরী করে আর মাটির কাজেই জীবন কাটবে তাদের।

সেই থেকেই নুনিয়ারা নুন তৈরী আর মাটির কাজ নিয়েই আছে আজো।

বিভিন্ন পুরা কাহিনীতে তপস্যাকালে কোন বিশেষ ত্রুটির ফলে সাধকের সিদ্ধিলাভ না হবার ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। সেই রকম কোন কাহিনীই হয়তো ধরে রাখা হয়েছে এই পুরা কাহিনীতে।

তবে বিষ্ণু নয় ব্রহ্মা নয়, শিব নয় দুর্গা-কালী-গণেশও নয় রামচন্দ্রের অভিশাপের ঘটনায় কিঞ্চিৎ বিস্ময় জাগে বৈকি! তবে কি বিদুর শ্রীরামচন্দ্রেরই তপস্যা করছিলেন? নাকি এই ঘটনা রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে সেই শূদ্রের তপস্যার স্মৃতিবাহী যার জন্য গোটা অযোধ্যায় বিপুল আলোড়ন উঠেছিল?

মালপাহাড়ীদের মতো নুনিয়ারাও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। বিহার থেকেই এরা উত্তরবঙ্গে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। রামায়ণের যুগেও এরা ছিল ঐ মালপাহাড়ীদেরই মতোন মধ্য ও দক্ষিন ভারতের কোন অংশে হয়তো বা আর সেই সূত্রেই রামচন্দ্রের সঙ্গে নিজেদের পূর্ব পুরুষের কোন ঘটনাকে জড়িয়ে এরা হয়তো আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়।

(৪) মুন্ডা লোকপুরাণ :

ছোটনাগপুরের রাঁচী জেলা থেকে নীল চাষ, চায়ের বাগানে ও কৃষিকাজে জীবিকার সন্ধানে যেসব মুন্ডারা এসেছিল কালক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে। উত্তরবঙ্গের এইসব মুন্ডাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে নানা পুরাকাহিনী।

মুন্ডাদের লোকপুরাণ থেকে সৃষ্টিতেত্বের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এইরকম—আদিতে চারিদিকে ছিল শুধু জল আর জল। ঈশ্বর বা সিংবোংগা সেই জলের মধ্যে সৃষ্টি করলেন 'কাছুয়া' বা কাছিম, 'কারাকোস-বা কাঁকড়া এবং 'লেনদাদ' বা জোঁক। ঈশ্বর তিনজনকে আদেশ দিলেন জলের গভীর থেকে কাদা তুলে আনতে। কিন্তু লেনদাদই শুধু কাদা তুলে আনতে পারলো। ঈশ্বর সেই কাদা থেকে সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর স্থলভাগ। ক্রমে গাছ লতাপাতা এবং পশুপাখীও সৃষ্টি করলেন। একটা হাঁস ডিম পাড়লো। ঐ ডিম থেকে জন্মনিল একটি ছেলে ও মেয়ে। ক্রমে যখন তারা বড় হয়ে উঠলো তখন ঈশ্বর তাদের মদ তৈরীর কৌশল শিখিয়েদিলেন। সেই মদ পান করে তাদের হৃদয়ে যৌন বাসনা জাগলো। ক্রমে তাদের মিলনের ফলে বারো জোড়া ছেলে মেয়ে হলো।

সিংবোংগা ঐ বারো জোড়া ছেলেমেয়েকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে তাদের সামনে রেখে দিলেন, নানা ধরণের খাবার। ঐসব খাবার পছন্দের ওপরেই নির্ধারিত হলো তাদের ভবিষ্যৎ।

প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া গ্রহণ করলো ষাঁড় ও মোষের মাংস। এরা হলো কোল ও ভূমিজদের আদিপুরুষ। যারা নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করলো তারা হলো ব্রাহ্মণ এবং ছত্রীদের পূর্ব পুরুষ। মাছ ও ছাগ মাংস নিল যারা তারা হলো শূদ্র। যারা সেল মাছ নিল তারা হলো ভূঁইয়া। যে দু জোড়া দম্পতি শূকর মাংস নিল তারা হলো সাঁওতালদের

পূর্বপুরুষ। এক জোড়া কিছুই পেল না। প্রথম জোড়া এদের কিছু খাবার দিল দয়াবশত এরা হলো ঘাসী। এভাবেই বিভিন্ন ভাগে মানুষদের ভাগ করে দিলেন সিংবোংগা এবং কালক্রমে এদের দ্বারাই পৃথিবী পূর্ণ হয়ে উঠলো ধনে জনে শস্য ও ফুল ফলে।

মুন্ডাদের এই সৃষ্টিতত্ত্বে জলমগ্ন পৃথিবীতে সিংবোংগার স্থলভাগ সৃষ্টির পাশাপাশি ডিম থেকে নর-নারীর সৃষ্টি ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

মোটিফ্ বিচারে (ডি-৫৫০) কোন কিছু পান করে যে পরিবর্তন ঘটে মদ্যপানে আদি পিতা মাতার মধ্যে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে আদম এবং ইভের কথাই মনে পড়ে যায় যেন।

মুন্ডাদের কোন আদি পুরুষ হয়তো প্রথমে সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে কোন কাহিনী তৈরী করেছিলেন পরে তা বংশ পরম্পরায় ছড়িয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে।

এই কাহিনীতে কাঁকড়া-কাছিম, জোঁক ইত্যাদি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। সমুদ্র গর্ভের আদিমতম জীব এরাই। এদিক দিয়ে বিচার করলে মুন্ডাপুরা কাহিনীর স্রষ্টার প্রাণী সৃষ্টির আদি রহস্য সম্বন্ধে ভালই জ্ঞান ছিল বোঝা যায়।

(৫) সাঁওতালী লোকপুরাণ :

(ক) সৃষ্টিতত্ত্ব : সাঁওতালী লোকপুরাণ অনুসারে জানা যায় অনন্তজলের মধ্যে থেকে স্থলভাগ সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। গাছপালা পশু পাখীও সৃষ্টি করলেন কিন্তু মানুষ সৃষ্টি আর হয় না। শেষে একটা বুনো হাঁসের দুটো ডিম হলো ঐ ডিম থেকেই জন্মনিল এক নর ও নারী। 'পিলচু হরম ও পিলচু বুড়ী'। এরাই আদিপিতা ও মাতা। এদের মিলনের ফলে যেসব ছেলে মেয়ে হলো তারা সাতটা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো নানাদিকে। এইসব গোষ্ঠীরই একটি হলো এই সাঁওতাল গোষ্ঠী।

(খ) সাঁওতাল জাতি : সাঁওতালী লোকপুরাণ থেকে আরো জানা যায় যে তারা প্রথমে 'চায় চাম্পা গড়ে বাস করতো। সেখানে রাজার অধীনে মুর্মু, কিস্কু, মান্ডি, হাঁসদা, হেমরাম, সরেন, টুডু প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত হয়ে সুখেই কাল কাটছিল তাদের। শিকার গান, নাচ প্রভৃতিতে জীবন ছিল ছন্দময়। আনন্দময়। সুখ শান্তিময়।

কিন্তু হঠাৎই হিন্দু রাজা মাঁদ সিংহের সৈন্যরা আক্রমণ করলো তাদের। কেড়েনিল তাদের রাজ্য। ফলে চাম্পাগড় থেকে তারা ছড়িয়ে পড়লো ভারতের নানা প্রান্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে। মাঁদো সিংহের সৈন্যরা যাতে তাদের চিনতে না পারে সেই জন্য পুরুষদের হাতে এবং মেয়েদের গায়ে-হাতে ও বুকে আগুনে লোহা পুড়িয়ে দাগ কেটে দেওয়া হতে লাগলো। আর ঐ সময় থেকেই তারা গাছতলায় পাথরে, মাঠে ঘাটে নানা দেবদেবীর কল্পনা করে পূজো দিতে লাগলো যাতে ধরা না পড়ে তারা শত্রুর হাতে। এভাবেই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা শুরু হয় তাদের মধ্যে এবং ঠাকুর, গোঁসাই, মারাং বুরু প্রভৃতি নানা দেবদেবীর সৃষ্টি হয়।

এই লোকপুরাণ থেকে যে বিষয়গুলি বিশেষ নজর কাড়ে তাহলো—মুন্ডাদের মতোই সাঁওতাল দের লোক পুরাণেও মানুষের সৃষ্টি হয়েছে হাঁসের ডিম থেকেই বলা হয়েছে।

এক্ষেত্রেও আমাদের মোটিফ্ ইন ডেস্কের ঐন্দ্রজালিক জন্ম বৃত্তান্তের কথাই মনে জাগে। এমন কাহিনী অবশ্য পৃথিবীর বহু লোক কথাতেই ছড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, মুন্ডা এবং সাঁওতাল উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই মূলত আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীর উপজাতি। ধর্মের দিক দিয়েও এরা উভয়ে জড় উপাসক। দৈহিক গঠন এমন কি উৎসব পূজা পার্বণেও এদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উভয় গোষ্ঠীরই ভাষা মুন্ডারী গোষ্ঠীর ভাষার অন্তর্গত। নানাগোত্রে বিভক্ত উভয় গোষ্ঠীই। পশু পাখীই এদের 'টোটেম'।

তৃতীয়ত, এই দুই গোষ্ঠীর দুই পুরাকাহিনীর প্রাথমিক সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন মনে করা যেতে পারে যে হাঁস গোত্র ধারী (হাঁসদা) কোন গোষ্ঠীপতি বা মোড়লই হয়তো নিজেদের টোটেম কে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য হাঁসের ডিম থেকেই আদি মানব মানবীর সৃষ্টির কাহিনী প্রচার করেছিলেন কৌশলে। তার পরে ঐ কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে।

চতুর্থত, সাঁওতালদের আদি বাসস্থান যে চায় চাম্পাগড়ে ছিল বলে দাবী করা হয়েছে তার সত্যতা মিলেছে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে—"In champa they sojourned many generations and the present institutions of the tribe were formed. At last the Hindus drove them out of champa and they established them selves in saont, and ruled there for two hundred years." (Census of 1901-Page 143)

পঞ্চমত, এখানে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষের দেহে দাগ কেটে দেবার যে উদ্দেশ্য দাবী করা হয়েছে তা মানা যায় না। নিজেদের গোষ্ঠীর লোকদের চেনার জন্যই দেহের ওপরে নানা চিহ্ন, এঁকে দেবার প্রথা আদিম সমাজে প্রচলিত আছে। সাঁওতাল সমাজে ও ঐ প্রথাই অনুসৃত হয়ে থাকে—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

লোকশ্রুতি

লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যেসব কাহিনী জনমানসে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং অসামান্য প্রাণ শক্তিতে বহুকাল টিঁকে থাকে মানুষের বিশ্বাসে এবং যা অনেক সময় ইতিহাস বা উন্নত সাহিত্য রচনায়ও সাহায্য করে তাইই লোকশ্রুতি বলে গণ্য।

লোক পুরাণের মতো লোকশ্রুতিও লোক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে কতো না বিচিত্র সব লোক শ্রুতির কাহিনী! এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো হলো—

প্রথমত, বিভিন্ন ব্যক্তির বীরত্ব বা নৈপুণ্যকে কেন্দ্র করে, কোন বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে, কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, ধ্বংসস্তূপ, সমাধি, গ্রামগঞ্জ, ভগ্ন প্রাসাদ, ঢিবি, পশু, পাখী, নদী, মাঠ, দীঘি প্রভৃতি অনেক কিছুকেই কেন্দ্র করে দেশে দেশে গড়ে ওঠে লোক শ্রুতির কাহিনী।

দ্বিতীয়ত, লোক শ্রুতির জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে বিশ্বাস। রূপকথা বা লোককথাকে মানুষ গল্প হিসাবেই বিচার করে কিন্তু লোকশ্রুতিকে মানুষ বিশ্বাস করে এইভেবে যে এমন বীর মানব ছিল, বা এমন ঘটনা ঘটেছিল কোন বিশেষ স্থানে সত্যিই। পশুপাখী, নদী, দীঘি, মাঠ, গাছ, বাড়ী প্রভৃতি কেন্দ্রিক সব লোকশ্রুতির মূলেই আছে ঐ বিশ্বাস এবং সেই জন্যই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ঐ সব লোকশ্রুতির কাহিনী জনপ্রিয়তার শিখরে চড়ে।

তৃতীয়ত, মুখে মুখেই প্রচারিত হয়ে থাকে এইসব লোকশ্রুতির কাহিনী বংশপরম্পরায়। ফলে কখনো কখনো কল্পনার রঙও মিশ্রিত হয়ে থাকে। ফলে কাহিনী পরিবর্তিতও হয়ে যায় কখনো কখনো।

চতুর্থত, লোকশ্রুতির কাহিনী আকাশের সন্ধ্যাতারার মতোই জ্বল্ জ্বল্ করে মানুষের মনের আকাশে যুগ যুগ ধরে এমনই প্রাণশক্তি এদের। আবার দেখা যায় বহু ঐতিহাসিক ঘটনা বা কাহিনী ধীরে ধীরে কালের প্রবাহে পরিণত হয়ে যায় লোকশ্রুতির কাহিনীতে। যেমন সিধু কানুর লড়াই, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদির কাহিনী বা ঘটনার স্মৃতি ঝাপসা হতে হতে আজ চলে গেছে লোকশ্রুতির পর্যায়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী, তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, প্রভৃতিও হয়তো একদিন চলে যাবে ঐ লোকশ্রুতির অধ্যায়ে—কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে কৌতুহলী শ্রোতার মনোরঞ্জনের দায়ে। তখন হয়তো এদের ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করাই হবে কঠিন কাজ।

পঞ্চমত, লোকশ্রুতির কাহিনী আবার অনেক সময় সাহায্য করে থাকে ইতিহাস বা উচ্চতর সাহিত্য রচনায়।

ষষ্ঠত, কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে থাকে বহু লোকশ্রুতি পুরনো হতে হতে ধূসর যুগের ওপারে।

উত্তরবঙ্গের লোকশ্রুতি :

ভারত তথা বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও প্রচলিত আছে অসংখ্য লোকশ্রুতি। যুগ যুগ ধরে ঐসব লোকশ্রুতি মুখে মুখে চলে এসেছে বংশপরম্পরায় পরম বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই। আবার স্মৃতির ধূসর অধ্যায়ে হারিয়েও গেছে কতো সব লোকশ্রুতি। এখানে আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোকশ্রুতির কথা আলোচনা করবো এবার।

(১) ভবানী পাঠক (ঐতিহাসিক) :

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং সিনেমার দৌলতে ভবানীপাঠকের নাম আজ সকলেই জেনে গেছে। এই ভবানী পাঠক আসলে ছিলেন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন এই ভবানী পাঠক। যদিও ইংরেজরা তাঁকে দস্যু সর্দার বলেই প্রচার করে গেছেন।

ভবানীপাঠকের বীরত্ব, দয়া ও স্নেহমমতা নিয়ে কতো কাহিনীই না প্রচলিত আছে জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে। তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায় এবং দুষ্টের যম। গরীব দুঃখীদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতার মতো। দুঃস্থ কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা বা কোন দুঃখী মানুষ তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য গেলে তিনি কখনো নিরাশ করতেন না তাদের।

শোনা যায় ভবানী পাঠক ছিলেন কালীভক্ত। গভীর রাতে কালীপূজো সেরে মায়ের আশীর্বাদী ফুল সকলের মাথায় ঠেকিয়ে ললাটে সিঁদূর লাগিয়ে, মায়ের নামে শপথ নিয়ে দলবল নিয়ে বের হতেন অভিযানে। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা বজরায় চেপে বের হতেন ভবানী পাঠক দলবল নিয়ে। ভবানী পাঠকের নামে ঠক্ ঠক্ করে তখন কাঁপতো সারা উত্তরবঙ্গের মানুষ। অত্যাচারী জমিদার ও জোতদারদের সর্বস্ব লুট করে তিনি বিলিয়ে দিতেন গরীব ও দুখী মানুষদের মধ্যে। অত্যাচারী ইংরেজদের সঙ্গেও লড়াই করেছিলেন তিনি। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দেবতার মতো। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন বাংলার রবীন হুড্!

উত্তরবঙ্গে ভবানী পাঠককে ঘিরে ছড়িয়ে আছে বহু গল্প, বহু কাহিনী।

(২) দেবী চৌধুরাণী (ঐতিহাসিক) :

আজ দেবী চৌধুরাণীর নাম বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও সিনেমার দৌলতে।

লোকে বলে ঐ দেবী চৌধুরাণী নাকি ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তিন কূলে কেউ ছিল না তার। সবাই তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে। এই অনাথা মেয়েটিকেই লালন পালন করে বীর এবং যোদ্ধা নারী হিসাবে গড়ে তোলেন ভবানী পাঠক। পরবর্তীকালে

নিজেকে শ্রদ্ধেয়া নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। বহু রোমহর্ষক অভিযানের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি। বিপন্নের ত্রাণ কর্ত্রী ছিলেন তিনি। গরীব দুখীদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন দেবীর মতো।

আজো জলপাইগুড়ি জেলার মন্থনী গ্রামে তিন ফুট উঁচু যে কাঠের মূর্তিটি পূজিতা হন তাকে সাধারণ ভাবে মন্থনী দেবী বলা হলেও দেবী চৌধুরাণী জ্ঞানেই সাধারণ নরনারী পূজা করে থাকে ঐ মূর্তিটাকে।

করতোয়া নদীর উৎস মুখে বিশাল একটি তুলসী গাছ দাঁড়িয়ে আছে যার উচ্চতা প্রায় দশফুট এবং ছ ফুট বেড়। জনশ্রুতি যে ঐ তুলসী গাছের গোড়াতেই সন্ধ্যাদীপ দিতেন নাকি দেবী চৌধুরাণী। কাছেই পড়ে আছে একটি ভাঙা বজরার ধ্বংসাবশেষ। লোকে বলে ওটি ছিল দেবী চৌধুরাণীরই বজরা। ঐ বজরা চড়েই তিনি যাত্রা করতেন বিভিন্ন অভিযানে।

দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতি বিজড়িত করতোয়ার বিভিন্ন ঘাটগুলো আজো বিদ্যমান। ঐ সব ঘাটে ঘাটে থামতো দেবী চৌধুরাণীর বজরা। ঐ ঘাটগুলো হলো দুধিয়ার ঘাট, খট খটিয়ার ঘাট, হাওয়ার ঘাট প্রভৃতি।

জলপাইগুড়ি জেলার ভাণ্ডিগুড়ি গ্রামের কয়েকটি পরিবার নিজেদের ভবানী পাঠকের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভবানী পাঠকের মূল ঘাঁটি ছিল জলপাইগুড়ি জেলার 'ঝাকুরা পাড়া গ্রামে। ঐ গ্রামের নির্জন প্রান্তে যে বিশাল ঝুরি নামা বট গাছটা রয়েছে ওর গোড়াতেই ছিল ভবানী পাঠকের কালীমন্দির। গাছটির পাশেই রয়েছে প্রাচীন দীঘি। চোখে পড়ে খালও। আগে আরো নির্জন এবং বনজঙ্গলে ভরাছিল ঐ স্থান। তবে এখনো ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ঐ স্থানে গিয়ে দেখেছি কেমন যেন গা ছম্ ছম্ ভাব। পাশেই শ্মশান। সম্প্রতি একটি কালীমন্দিরও হয়েছে ঐ গাছের নীচে। গাছের গোড়ায় রয়েছে মা মনসার থানও। গভীর রাতে নাকি নানারকম শব্দ ওঠে ঐ গাছের তলায়। শোনা যায় ঘণ্টাধ্বনি এবং ওঠে মন্ত্রের ধ্বনিও।

বর্তমান দক্ষিন দিনাজপুর জেলার পতিরাম গ্রামের টিনের চালা ঘরে যে বিদ্যেশ্বরী দেবীর পূজা হয়ে থাকে ঐ মন্দিরের দেবীকে নাকি ভবানী পাঠক মাঝে মাঝে পূজো দিতে আসতেন।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা এবং বগুড়া ও রংপুর জেলার বহুস্থানেই ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গের জনশ্রুতির এই দুই নায়ক-নায়িকা ছিলেন যথার্থ্যই ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার যে কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"মজনুনের একজন সহযোগী ছিলেন ভবানী পাঠক। তিনি সাধারণত বগুড়া, রংপুর ও মৈমনসিংহ অঞ্চলে জলপথে ডাকাতি করিতেন। ১৭৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই সাতখানা বড় নৌকা ধরা পড়ে। তাঁহার সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোকও ডাকাতি করিতেন। তিনি নৌকাতেই বাস করিতেন এবং একদল বেতনভোগী বরকন্দাজ পোষণ করিতেন। সরকারী নথিতে এ দুজনেরই উল্লেখ আছে।"

—বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয়খণ্ড পৃষ্ঠা-২৩-২৪)

ইতিহাসের কাহিনী যদি লোক ঐতিহ্যে বহুল প্রচার লাভ করে তবে ঐ কাহিনী যে মাত্র দেড়শো-দুশো বছরের মধ্যে ঐতিহাসিক মেজাজ হারিয়ে লোকশ্রুতির উপাখ্যানে পরিণত হয়ে যেতে পারে ভবানী পাঠক ও দেবী চোধুরাণীর কাহিনীই তার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন উনবিংশ শতকের শেষার্ধে যখন এই কাহিনী শোনেন তখনই তা লোকশ্রুতির পর্য্যায়ে চলে গেছে প্রায়। বাংলার ঘরে ঘরে এঁদের নাম প্রচারের পুরো কৃতিত্ব অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

লোকশ্রুতির কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে যে কতো সার্থক সাহিত্য রচিত হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৩) নীলধ্বজ :

প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে একদা যে শক্তিশালী কামতাপুর রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেই রাজ্যের শক্তিশালী রাজা ছিলেন নীলধ্বজ। কিন্তু এই নীলধ্বজকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে বহু রোমাঞ্চকর লোকশ্রুতির কাহিনী।

লোকশ্রতি বলে নীলধ্বজই নাকি কামতাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেউ বলেন কামতাপুর বলে একটা ছোটশহর আগে থেকেই ছিল সেখানেই নীলধ্বজ রাজধানী স্থাপন করে তার সমৃদ্ধি ঘটান।

লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করতেন বালক নীল ধ্বজ। মাঠে গরু নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজে মনের সুখে নিদ্রা দেয় বালক। লোকের ফসল নষ্ট করে দেয় গরু বাছুর। সবাই এসে নালিশ জানায়। একদিন ব্রাহ্মণ নিজে গেলেন তদন্তে, দেখলেন অভিযোগ সত্য। বালক ঘুমুচ্ছে গাছতলায় গরু গুলো নষ্ট করছে অন্যের ফসল। রেগে শাস্তি দেবার জন্য তিনি ছুটে গেলেন গাছতলায়। কিন্তু গিয়ে দেখতে পেলেন এক বিশাল অজগর ফণা ধরে আছে বালকের মাথার ওপরে। রোদ থেকে রক্ষা করছে বালক কে. ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়েই মাথার ওপর থেকে ফণা নামিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল অজগর। ব্রাহ্মণ বালকের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন অষ্টদল পদ্মচিহ্ন ও ত্রিশূল রেখা অঙ্কিত। মুখমণ্ডলে রাজকীয় মহিমার ছাপ। কপালে রাজতিলক। বিস্ময়ের অন্ত থাকলোনা ব্রাহ্মণের।

সেই দিন থেকেই গরু চরানো বন্ধ হলো বালকের। ব্রাহ্মণ ঐ বালককে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে সে যদি রাজা হয় তবে ব্রাহ্মণকে সে মন্ত্রীর পদ দেবে। বালক হেসে কথা দিল আর মনে মনে ভাবলো তার মনিব নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। লোকশ্রুতি বলে এই ঘটনার বহুকাল পরে সেই বালকই যখন সত্যিই রাজা হলেন তখন ঐ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। নিজে হয়েছিলেন কামতেশ্বর নীলধ্বজ।

কিন্তু নীলধ্বজ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তিনিই যে কামতাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এমন প্রমাণ মেলে না। আসলে পৃথুর পুত্র সন্ধ্যা রায়ই মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কুচবিহারের দিনহাটা মহকুমার কামতাপুরে রাজ্যের মূলশাসন ব্যবস্থাকে সরিয়ে এনেছিলেন কামরূপ থেকে।

তবে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মৃগাঙ্কের মৃত্যুর পরে নীলধ্বজ কোন এক সময়ে কামতা রাজ্য অধিকার করে খেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর প্রথম জীবনের কাহিনী রহস্যাবৃত। বুকানন হ্যামিলটন সাহেবের মতে নীল ধ্বজ চাকর শ্রেণীর মতো নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন। তিনি লোকশ্রুতির ওপরে নির্ভর করেই ঐ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন মনে হয়।

ইতিহাস আরো বলে যে নীলধ্বজ একজন ব্রাহ্মণকেই তাঁর মন্ত্রী করেছিলেন তবে সেই ব্রাহ্মণ স্থানীয় ব্যক্তি নন। তাঁকে আনা হয়েছিল মিথিলা থেকে।

নীলধ্বজ ঐতিহাসিক ব্যক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা বা কাহিনী লোক ঐতিহ্যে বহুল প্রচার পাওয়ার ফলে যে প্রকৃত ইতিহাস ঝাপ্‌সা হয়ে আসে এবং কাল্পনিক কাহিনী যুক্ত হয়ে যায় তার সঙ্গে নীলধ্বজের এই কাহিনী তার প্রমাণও দেয়।

এই কাহিনীর অভিপ্রায় বা মোটিফ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন দেশেই লোক সমাজে একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে ঘুমন্ত ছেলে বা মেয়ের মাথার ওপরে সাপ যদি ফণা ধরে তাকে রোদের তাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে ঐ ছেলে বা মেয়ে নিশ্চয়ই রাজা বা রাণী হবে। নীলধ্বজের মতো হোসেনশাহ সম্বন্ধেও এমনই কাহিনী প্রচলিত আছে এবং প্রথম জীবনে হোসেন শাহও ছিলেন এক ব্রাহ্মণেরই বাড়ীর রাখাল। দুটি ঘটনার আশ্চর্য মিল। অথচ একটির ঘটনাস্থল কুচবিহারে অন্যটির মালদহে। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও কম নয়। নীলধ্বজ সিংহাসনে বসেছেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে আর হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে। ৫৩ বছরের ব্যবধান!

একই মোটিফ দেখা যায় দুটি কাহিনীতেই। এর আন্তর্জাতিক মোটিফ ইন্‌ডেক্স হলো বি-৯১ একই বিশ্বাস বা মোটিফ যখন অন্যস্থানে বা অন্য দেশেও থাকে তখনই তা হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক।

দ্বিতীয়ত, এই কাহিনী থেকে আরেকটি লোক বিশ্বাস বা মোটিফের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাহলো পায়ে ও কপালের শুভ চিহ্ন দেখে ভবিষ্যৎ নির্ণয়। এর মোটিফ ইনডেক্স হলো এইচ-৭১ এখানে ব্রাহ্মণ রাখালের পায়ে অষ্টদল পদ্মচিহ্ন ও ত্রিশূল আঁকা দেখেছিলেন এবং কপালে দেখেছিলেন রাজতিলক। বালক রাজা হবে বুঝেছিলেন এবং তাঁর অনুমান ও সত্য হয়েছিল। যদিও আন্তর্জাতিক মোটিফ বিচারে পদচিহ্ন দেখে ভবিষ্যৎ বাণীর কথা নেই তবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরেই কপাল-হাত ও পায়ের চিহ্ন সমহ বিচার করে ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনার প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গে নীলধ্বজ এবং হোসেন শাহের কাহিনী দুটির একটি অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

(৪) বাণগড়ের উষা-অনিরুদ্ধ—ও বাণরাজ :

বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার বাণগড়কে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী। লোকশ্রুতি বলে এখানেই নাকি ছিল পুরাণখ্যাত বলির পুত্র বাণরাজার রাজধানী।

পুনর্ভবার তীরে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে 'ধ্বংসাবশেষ উঁচু উঁচু ঢিবি, ভাঙা ইট আর পাথরের ছড়া ছড়ি। দুটি প্রাচীন দীঘি-জীয়নকুঁড়ি ও মরণকুঁড়ি। রয়েছে শ্বেতপাথরের চারটি স্তম্ভ। বাণগড়ের কিছু উত্তরে রয়েছে একটি প্রাচীন শিব মন্দির। রয়েছে উষাঢিবি, উষাহরণ রোড, উষাহরণ বাজার প্রভৃতি অনেক কিছুই। সেইসব দেখিয়ে লোকে বলে বাণরাজার কন্যাকে এখান থেকেই হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ। কিন্তু ক্রুদ্ধ বাণ রাজা তাঁকে বন্দী করলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন তাঁকে উদ্ধার করতে। শুরু হয়ে যায় তুমুল লড়াই। শেষ পর্য্যন্ত বাণ রাজকে হত্যা করে অনিরুদ্ধ এবং উষাকে উদ্ধার করে তিনি নিয়ে যান দ্বারকায়।

প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় বাণ কন্যা উষা স্বপ্নের মধ্যে প্রদুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধর সঙ্গে মিলনের পরেই ব্যাকুল হয়ে সখী চিত্রলেখাকে দ্বারকায় পাঠান এবং অনিরুদ্ধ বাণগড়ে এসে গোপনে মিলিত হন উষাবনে উষার সঙ্গে এবং তারপরে তাঁকে হরণ করেন। এরপরেই তাঁরা বন্দী হন এবং যুদ্ধ বেধে যায়—শিব শক্তিতে বলীয়ান বাণরাজা ও বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণে মধ্যে।

এখন এই কাহিনীর উৎস ও অভিপ্রায় বিচার করতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এই ঘটনা ও স্থানের ঐতিহাসিক ভিত্তি কি ?

বর্তমান বাণগড় যে অতি প্রাচীন স্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকেই মনে করেন আসামের শোণিতপুর নয় এই বাণগড়েই ছিল বাণরাজার রাজধানী যার প্রাচীন নামছিল বাণপুর। এ প্রসঙ্গে বাঙালীর ইতিহাস প্রণেতা ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—। তিনি বলেছেন—'পুনর্ভবাতীরস্থ কোটিবর্ষ এবং বলিরাজ পুত্র বাণাসুরের ও উষা অনিরুদ্ধের পুরাণ স্মৃতি বিজড়িত বাণপুরই বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।"

—(বাঙালীর ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা)

এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস প্রণেতা সুকুমার দাস মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তাও স্মরণ করা যেতে পারে—'বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বাণগড়ই পরবর্তীকালে কোটি বর্ষ বা দেব কোট রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং তা পুন্ড্রবর্ধনের দীর্ঘকালীন রাজপাট রূপে খ্যাতিলাভ করে।'

—উত্তরবঙ্গের ইতিহাস-২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

বাণগড় এবং বাণরাজ ও উষা অনিরুদ্ধের কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা বিচারের কাজ খুব সহজ না হলেও পূর্বভারতে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার যে বহু যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছিল একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। দ্রাবিড় শক্তির প্রতিভূ শৈব বাণ রাজার সঙ্গে তাই শ্রীকৃষ্ণের যাদব বাহিনীর সংঘর্ষকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায় যে পূর্বভারতের দ্রাবিড় রাজবংশের সঙ্গে ধীরে ধীরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আর্য্য রাজারা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বঙ্গের রাজকন্যা অযোধ্যার রাজবংশে বধূ হিসাবে স্থান পেয়েছেন। মহাভারতের

সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে দ্রাবিড় কন্যা ঊষার বিবাহ কাহিনী তাই অসম্ভব বা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। ঊষাবন থেকে ঊষাকে হরণ করে নিয়ে অনিরুদ্ধ সম্ভবত গান্ধর্ব মতেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ঊষাকে। কিন্তু আত্মমর্য্যাদায় ঘা লেগেছিল বাণরাজার এই চৌর্য্যবৃত্তিতে আর তাইই তিনি বন্দী করেছিলেন অনিরুদ্ধকে। তাইই বেধেছিল কঠিন যুদ্ধ।

তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণে বিশাল যাদব বাহিনীর সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধ এড়াতে পারতেন বাণরাজ। কিন্তু অনিরুদ্ধের এই হীন চৌর্য্য বৃত্তিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি তাইই নিজ দেশ, জাতি ও বংশের সুনাম রক্ষার জন্যই তিনি লড়াই করেছেন প্রাণপণে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। যুদ্ধে তিনি লাভ করেছেন বীরগতি তবু আত্মসমর্পণ বা সন্ধি করেননি। মাথা উঁচু করেই বরণ করেছেন বীরের মৃত্যু। এই আত্মর্য্যাদাবোধ, বীরত্বের গৌরব, দেশ, জাতি ও বংশের সম্মানকে ঊর্ধে তুলে ধরার এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রচেষ্টার জন্যই উত্তরবঙ্গ বাসীর হৃদয়ে তিনি লাভ করেছেন চিরস্থায়ী গৌরবের আসন। আর তাইই তাঁকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এত জনশ্রুতি,—এত নাটক ও পালাগান।

চতুর্থত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে পূর্বভারতে দ্রাবিড়দের শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠনের কথা বলা হয়েছে বারবার। গুপ্তযুগের আগে যে পুণ্ড্রবর্ধনে আর্য্যরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি একথা সবাই জানে। বাণগড়ে খনন কাজ চালিয়ে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যায় এখানে পরপর বেশ কয়েক যুগের রাজারা শাসন কাজ চালিয়েছেন। মৌর্য, শুঙ্গ এবং তারও আগের যুগের নিদর্শন মিলেছে এখানে। পরবর্তী স্তরে গুপ্ত-পাল এবং শেষ স্তরে মিলেছে মুসলিম যুগের নিদর্শন। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হলো পর পর এতগুলো যুগের বিভিন্ন রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেলেও শুধু বাণ রাজা এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধকে ঘিরেই বা এত আবেগ ও উচ্ছ্বাস কেন?

সুদীর্ঘ তিন হাজার বা তারো বেশী কাল ধরে এমন লোকশ্রুতির কাহিনী পৃথিবীর আর কোন দেশে টিঁকে আছে কিনা আমাদের জানা নেই। এটা যেমন গৌরবের তেমনি বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে।

তবে সুদীর্ঘ কাল ধরেই যে লোকমুখে এইসব কাহিনী গড়ে উঠেছে এই অংশে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রচিত হয়েছে বাণগড়-বাণরাজা ও ঊষা অনিরুদ্ধকে নিয়ে বহু ছড়া-গান ও নাটক এবং সেগুলো লাভ করেছে প্রভূত জনপ্রিয়তাও। একটি পালা-গানের উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে এই জনশ্রুতি কিভাবে লোক নাটক ও লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাণ কন্যা-ঊষা স্বপ্নে দেখেছেন অনিরুদ্ধকে। তাঁকে না পেলে প্রাণে বাঁচবে না ঊষা। তাই সখী চিত্রলেখাকে ঊষা অনুনয় করে বলছেন—

'সখি, কি উপদেখিনু মুই নিন্দের ভিতর।
ধরিমু কেমুনে পাণ কুণ্ঠি সে নাগর?
কি করিমু কুণ্ঠি যামু মন হৈল আউল।

কিসেক পেরেম ফান্দে এজীউ আউল ?
চিত্ত ন্যাখ্যা সখি তুই মায়ের গোড়ৎ যাও।
পাণ পতি আনে দিয়ে এজীউ বাঁচাও !

এরপরে চিত্রলেখার দ্বারকা গমন, অনিরুদ্ধর আগমন, মিলন, হরণ ও যুদ্ধের এবং বিবাহের কাহিনী বলা হয়েছে এই পালা গানে।

আন্তর্জাতিক মোটিফ ইন্‌ডেক্স অনুসারে এই স্বপ্নে দেখে প্রেমে পড়ার ঘটনাটিকে টি-১১. ৩ এ ফেলা যায়। কেননা ঐ স্বপ্ন থেকেই ঘটেছে যতসব ঘটনা।

এই অঞ্চলে বাণরাজার মেয়ে ও বাণরাজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বেশ কয়েকটি স্থান নিয়ে যেসব জনশ্রুতি আছে এবার তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(৫) বংশীহারী :

উত্তরবঙ্গে ব্যক্তি কেন্দ্রিক লোকশ্রুতির পাশাপাশি স্থানকেন্দ্রিক লোকশ্রুতিও ছড়িয়ে আছে বহু। ট্যাঙ্গন নদীর তীরে 'বংশীহারী' বলে যে থানা আছে ঐ বংশীহারী সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতি এই যে বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ নাকি ঐখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং বাণ রাজের কোন কর্মচারী (মতান্তরে কোন ছেলে) নাকি তাঁর শক্তিহ্রাসের জন্য তাঁর বাঁশীটি চুরি করেছিলেন। বংশীহারিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কতটা শক্তি হ্রাস হয়েছিল জানা যায় না কিন্তু সেই থেকেই ঐ স্থানের নাম হয়ে যায় বংশীহারী।

(৬) কুশমণ্ডী :

কুশমণ্ডী বলে যে স্থানটি রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সেটি নাকি বাণরাজার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের স্মৃতিবাহী। লোকশ্রুতি বলে ঐ স্থানেই নাকি ছিল বাণমন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের বাড়ী। বাণ রাজকে পরাজিত ও নিহত করার পরে এই কুষ্মাণ্ডকেই সিংহাসনে বসিয়ে ঊষা অনিরুদ্ধকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে দ্বারকায় ফিরে যান।

(৭) করদহ :

করদহ নামক স্থানে নাকি বাণরাজার করদহ করা হয়েছিল বলে এখনো মানুষের বিশ্বাস ঐ অঞ্চলের।

অন্য একটি মতে বাণরাজার করগুলি চক্র দ্বারা কর্তন করে যে দহে নিক্ষেপ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সেই দহই নাকি আজকের কর দহ।

(৮) তপনদীঘি :

তপন থানার তপনদীঘির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বাণরাজার স্মৃতি। বাণরাজা নাকি ঐ দীঘিতে স্নান তর্পন করতেন। দীঘিটি প্রায় পৌনে একমাইল লম্বা এবং আধমাইল চওড়া। ঐ দীঘিকে নিয়ে শোনা যায় আরো নানা কথা।

(৯) জীয়ন কুঁড়ি ও মরণ কুঁড়ি :

বাণগড়ের ধ্বংসস্তুপের পাশেই চোখে পড়ে দুটি প্রাচীন জীর্ণপ্রায় দীঘি। লোকে বলে এদীঘি দুটির একটি নাকি জীয়নকুঁড়ি অন্যটা মরণকুঁড়ি। জীয়নকুঁড়ির জল গায়ে ছিটিয়ে দিলেই মৃতব্যক্তি জীবন ফিরে পেত আর মরণ কুঁড়ির জল গায়ে ছিটিয়ে দিলেই জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু হতো। বাণ রাজের সৈন্য তাই নাকি কমতো না কিছুতেই।

লোকশ্রুতি আরো বলে যে পাঠান আমলে ঐ দীঘি দুটির জল অপবিত্র করার ফলে, আর কোন দৈবক্রিয়া সংঘটিত হতো না এবং এখন ও দুটি জীর্ণ ডোবা মাত্র আর কিছুই নয়।

ঐ দীঘি দুটির চারপাশে দেখা যায় ভগ্ন প্রাসাদের সারি। জলের ধারে পড়ে আছে একটি ষন্ডদেবের মূর্তি। শিববাহন নন্দীই সম্ভবত। এখনো কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বহুভক্ত নরনারী জীয়ন কুঁড়িতে স্নান করে পুণ্য অর্জনের আশায়।

(১০) বাণেশ্বর শিব :

বাণ গড়ের উত্তরদিকে পুনর্ভবার তীরে রয়েছে একটা প্রাচীন শিব মন্দির। লোকে বলে, ঐ মন্দির নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাণরাজ। শিব ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদিন পুনর্ভবায় স্নান সেরে তিনি পূজো দিতেন তাঁর ইষ্টদেব মহেশের এই মন্দিরে এসে।

(১১) উষাটিবি :

রাজীবপুরে পুনর্ভবার তীরে একটা উঁচু টিবি দেখিয়ে লোকে এখনো বলে যে ঐটিই হলো উষাটিবি বা উষাবন। ঐ খানেই বাস করতেন বাণ কন্যা উষা। অনিরুদ্ধ সুদূর দ্বারকা থেকে ঐখানেই এসে মিলিত হয়েছিলেন তারপরে উষাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন রথে করে।

(১২) উষাহরণ রোড :

লোকে বলে দ্বাপর যুগে উষাকে হরণ করে নিয়ে যে পথ ধরে পালিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ সেই পথই আজকের উষাহরণ রোড নামে খ্যাত। প্রচলিত বিশ্বাস যে ঐ পথটি রাজীবপুরের উষাটিবি থেকে চলে গেছে সোজা দ্বারকা পর্য্যন্ত।

লোকশ্রুতি অনেক কথাই বলে। তবে তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্নও ওঠে বহু ক্ষেত্রেই। অনেকে মনে করেন বক্তিয়ার খিলজির সময়ে যে রাস্তাটা বীরভূম থেকে দেবকোট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল তারই কিছু অংশ আজকের উষাহরণ রোড নামে খ্যাত।

(১৩) উষাহরণ বাজার :

উষাহরণ রোড যেখানে পাকা রাস্তায় মিশেছে তারপাশেই গড়ে উঠেছে একটা বাজার। নাম উষাহরণ বাজার। লোকে বলে উষাকে নিয়ে পালাবার সময়ে এখানে নাকি অনিরুদ্ধের রথ থেমেছিল কিছুক্ষণের জন্য। সেই অতীত দিনের রোমাঞ্চকর স্মৃতিরই সাক্ষী স্বরূপ ঐ উষাহরণ বাজার।

(১৪) যদু ও আসমান তারা :

মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুরের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে নানা কাহিনী আছে। একটি প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে দিনের পর দিন নাকি ছদ্মবেশে আজিম মঞ্জিলের কাছে একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়াতেন এক যুবক সন্ধ্যার সময়। তখনই বাতায়নে দেখা যেত এক সুন্দরীর স্মিত হাসি মাখা মুখ। খুশী হয়ে যুবক ফিরে আসতেন নিজের প্রাসাদে। এমনি করেই চলছিল মন দেয়া নেয়ার পালা। শেষ পর্যন্ত ঐ যুবক আর ধৈর্য্য রাখতে পারেন নি। ঐ সুন্দরীকে লাভ করার জন্য তিনি ঐ সুন্দরীর ধর্মও গ্রহন করেন। আসলে যুবক ধর্মত্যাগ করেন ভালোবাসার জন্যই।

হ্যাঁ, ঐ যুবকই হলেন হিন্দু রাজাগণেশ পুত্র যদু আর আজিম মঞ্জিলের ঐ রূপসীই হলেন ইলিয়াস শাহী বংশের আজম শাহের কন্যা 'ফুলজানি' যিনি পরে 'আসমান তারা' রূপে খ্যাত হন এবং মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যদুর নাম হয় জালালুদ্দীন।

জনশ্রুতি অনুসারে আরো জানা যায় যে ফুলজানিকে নাকি তুরুপের তাস হিসাবেই ব্যবহার করেছিলেন 'নূরকুতুব আলম' এবং যদুকে তিনিই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন।

এই জনশ্রুতির উৎস ও অভিপ্রায় বিচার করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ইতিহাসের পাতা উলটাতে হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'রাজাগণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। .....বারেন্দ্র ভূমিতে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে যদু ইলিয়াস শাহের বংশজাতা কোন সম্ভ্রান্তা মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া ছিলেন। কোনও মতে যদু আজমশাহের কন্যা আসমান তারার পাণি গ্রহন করিয়াছিলেন মতান্তরে যদুর পত্নীর নাম 'ফুলজানি বেগম'।

—বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫।

অর্থাৎ ঘটনাটা ঐতিহাসিক। একলাখী মসজিদে এখনো যদু ওরফে জালালুদ্দীন, আসমান তারা ও তাদের পুত্র আহ্‌মদশাহের সমাধি বর্তমান। এই কাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে বিখ্যাত যাত্রাপালা—'বেগম আসমান তারা'।

এই কাহিনীর মোটিফ্ হলো প্রেম। আন্তর্জাতিক মোটিফ্ ইন্‌ডেক্স অনুসারে টি-১৫—প্রথম দর্শনে ভালোবাসা।

লোক ঐতিহ্যে বহুল প্রচারিত ঘটনা কিভাবে ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ঝাপ্‌সা করে দিয়ে লোকশ্রুতিতে টিঁকে থাকে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কাহিনী।

(১৫) কমলাবাড়ী :

উত্তরদিনাজপুরের রায়গঞ্জের কাছে যে 'কমলাবাড়ী' বলে স্থানটা রয়েছে ঐ কমলাবাড়ীকে নিয়েও নানা লোকশ্রুতি ছড়িয়ে আছে এই জেলায়।

লোকশ্রুতি বলে ঐ কমলাবাড়ী নাকি গণেশ পুত্র যদুর স্ত্রী কমলার স্মৃতি বিজড়িত। যদু ধর্মান্তরিত হলে হিন্দু স্ত্রী কমলা চলে এসে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। স্বামী ধর্ম ত্যাগ করলেও কমলা নাকি প্রতিদিন তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে স্বামীর মঙ্গল কামনা করতেন। আরো জানা যায় যদু নাকি পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়ে কমলাদেবীর কাছে

ফিরে এসে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। কমলা দেবী সেদিন তাঁকে ক্ষমা করলেও ধর্মচ্যুত যদুকে স্বামী হিসাবে গ্রহন করতে পারেন নি। চোখের জলেই বিদায় জানিয়ে ছিলেন জালালুদ্দীনকে গভীর মর্মবেদনায়।

অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে যদুর অপর ভাই মহেন্দ্রদেবই যদুকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে নিয়ে আসেন কমলা দেবীর কাছে। কমলা দেবী অনুতপ্ত এবং বন্দী স্বামীকে ক্ষমা করলেও সমাজ ও ধর্মের ভয়ে তাঁকে আর স্বামী হিসাবে গ্রহন করতে পারেন নি। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে।

এ কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা বিচার করতে গেলে দেখা যায় ইতিহাসে মহেন্দ্র দেবের নাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু কমলা দেবীর নাম পাওয়া যায় না। মহেন্দ্রদেব 'চন্দ্রদ্বীপের শাসন কর্তা দনুজমর্দন দেবের সঙ্গে একত্রিত হয়ে জালালুদ্দীনকে পরাজিত করেছিলেন এবং দনুজমর্দনের পরে স্বল্প সময়ের জন্য পাণ্ডুয়া তথা উত্তরবঙ্গের অধিকারও লাভ করেছিলেন।

যদুর হিন্দু স্ত্রী কমলাদেবী বলে কেউ ছিলেন কিনা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও লোকশ্রুতিতে কিন্তু তিনি অমর হয়ে আছেন। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিভাবে নানারঙে রঞ্জিত হয়ে লোকশ্রুতিতে নতুন মাত্রা পায় এ কাহিনী তারই এক উজ্বল দৃষ্টান্ত। লোকশ্রুতির সবটাই তো যথার্থ ইতিহাস নয়।

এই লোকশ্রুতির মধ্যে দিয়ে যে অভিপ্রায়টি প্রকাশ পেয়েছে তাহলো বিধর্মীর সঙ্গে প্রেমে আপত্তি নেই কিন্তু ধর্মত্যাগে ঘোরতর আপত্তি আছে। তাইই সম্ভবত, এই লোকশ্রুতিতে কমলাদেবীর ঐ প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্তরের জ্বালা মিটিয়েছে বরেন্দ্র ভূমির হিন্দু নরনারীগণ।

(১৬) কসবা মহেশো :

উত্তরদিনাজপুরের রায়গঞ্জ সদর শহরের কিছু দূরেই বাঙাল বাড়ী স্টেশনের কাছেই কসবা মহেশো গ্রামকে কেন্দ্র করেও ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। ঐ গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। লোকে বলে ঐ ধ্বংসাবশেষ নাকি 'রাজাগণেশের ভিটা। আবার কেউ বলে ঐ ধ্বংসাবশেষ কংসের পিতা মহেশ নারায়ণের। 'মহেশ' নাম থেকেই ঐ গ্রামের নাম হয় প্রথমে মহেশপুর এবং পরে 'কসবা-মহেশো। এই গ্রাম থেকে ছোট পাণ্ডুয়া এবং কমলা বাড়ীর দূরত্বও খুববেশী নয়। মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান।

লোক বলে এই গ্রামের প্রাচীন মসজিদটি নাকি পীরশাহ মখদুম প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটির গায়ে রয়েছে পদ্মফুল ও লতাপাতার কারু কাজ। ছোট বড় দশটি গম্বুজ আছে ঐ মসজিদের মসজিদের ভিতরে রয়েছে একটি কুয়ো। আশে পাশে ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। মন্দির ভেঙেই নাকি মসজিদটি হয়েছে বলে শোনা যায় লোক মুখে। এখানে বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতি বারে একটি মেলা বসে দুদিনের জন্য পীরমখদুম শাহের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে। উৎসবটি নাকি পাঁচশো বছরেরো বেশী পুরনো। এখানে মখদুম দীঘি নামে আছে একটা প্রাচীন দীঘিও। পীর মখদম নাকি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি

নাকি আল্লার নির্দেশেই সুদূর পারস্য থেকে এসেছিলেন ওখানে ধর্মপ্রচার করতে। ছড়িয়ে আছে আরো নানা কাহিনী।

লোকশ্রুতিতো অনেক কথাই বলে। এখন দেখা যাক্ ইতিহাস কি বলে ?

ইতিহাস বলে রাজা গণেশ ছিলেন রাজসাহী জেলার ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার। দিনাজপুরের রাজবংশের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। গণেশের পিতার নাম ছিল 'মহেশ নারায়ণ'। কসবা মহেশো তাঁর নাম থেকেই হয়েছে কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ঐখানে যে কোন হিন্দু জমিদার বা ভূস্বামী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শামসুর রহমান সাহেব 'বদরুদ্দীন আলম' নামে একজন পীরের উল্লেখ করেছেন যিনি হোসেন শাহের সময়ে 'হেমতা বাদ' অঞ্চলে শিষ্য বর্গ নিয়ে আসেন ধর্মপ্রচারে। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের সামন্ত রাজা মহেশ তাঁকে বাধা দেন। হোসেন শাহের সেনাদলের সাহায্য নেন ঐ পীর এবং মহেশ রাজা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যান। পীর তখন ঐ রাজার প্রাসাদেই আস্তানা গড়েন। প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়েই ঐ পীরের সমাধিও তৈরী হয়েছে।

এখন প্রশ্ন শামসুর রহমান বর্ণিত ঐ মহেশ রাজাই কি কসবা মহেশের 'মহেশ রাজা' ? কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি হেমতাবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ দুটি স্থান ভিন্ন। তাছাড়া তিনি পীরের নাম বলেছেন 'শেখ বদরুদ্দীন'। অথচ কসবা মহেশের পীর 'মখদুমপীর' নামে খ্যাত। হিসাব মেলেনা কিছুতেই।

এই 'মখদুমপীর' সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। বহু দরগাও তাঁর স্মৃতি চিহ্নযুক্ত। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্তী মশায় বলেছেন—'বাস্তবিক পাণ্ডুয়াতেই ইঁহার মৃত্যু হয়।' .....ইহার দরগা কোন প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের স্থানেই নির্মিত হইয়াছে।'

এখন প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি শামসুর রহমান বর্ণিত বদরুদ্দীন পীরই এখানে পীর মখদুম রূপে খ্যাত হয়েছেন ? অথবা দুই পীর ভিন্ন ? শামসুর রহমান বর্ণিত হেমতা বাদই কি কসবা মহেশো ? স্থানের নামে কি ভুল করেছেন তিনি ?

আবার পাণ্ডুয়ায় সমাধিস্থ মখদুম্ পীর আর কসবা মহেশোর মখদুমপীর কি অভিন্ন ?

এইসব নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় মনের মধ্যে। লোকশ্রুতিতে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রং লাগে। এভাবেই হয়তো কালক্রমে কসবা-মহেশোর মহেশ রাজা পরিবর্তিত হয়েছেন গণেশ পিতা মহেশ নারায়ণে আবার এখানকার পীর মখদুম আর পাণ্ডুয়ার পীর মখদুম হয়ে উঠেছেন অভিন্ন। মিশে গেছে হেমতা বাদের সঙ্গে কসবা মহেশোর কাহিনী।

এই লোকশ্রুতির উৎস ও অভিপ্রায় আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে দীর্ঘদিন জনসমাজে কোন লোকপ্রিয় ঘটনা বা কাহিনী প্রচলিত থাকার ফলে ঐতিহাসিক কারণেই তাতে নানা অনৈতিহাসিক উপাদান মিশে যায় এক্ষেত্রেও সম্ভবত তাইই হয়েছে। স্থানীয় মানুষ নিজেদের গৌরবান্বিত করার জন্যই হয়তো ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের নাম যুক্ত করেছেন কসবা মহেশোর কাহিনীর সঙ্গে। এবং ঐ যোগও ঘটেছে খুবই ধীরে ধীরে। সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর পরে আজ সঠিক করে বিচার বিশ্লেষণ করার কাজটা সহজ নয় মোটেই। তবে

মহেশ রাজা এবং পীরের কাহিনী তাই বলে অসত্য নয়। ধ্বংসস্তুপ এবং মসজিদ ও সমাধি-ই বলেদেয় কোন প্রাচীন হিন্দুর রাজার প্রাসাদ এবং মন্দিরের স্থানেই গড়ে উঠেছে মসজিদ এবং সমাধিগুলো। কসবা মহেশো সত্যিই এক ঐতিহাসিক স্থান।

(১৭) মহীপাল দীঘি :

পাল বংশের বিখ্যাত রাজা মহীপালকে ঘিরে বাংলার নানা প্রান্তে কতো না কাহিনীই ছড়িয়ে আছে। ধান ভানতে মহীপালের গীত—প্রবাদটি আজো মুখে মুখে ছড়িয়ে।

উত্তরবঙ্গের দক্ষিন দিনাজপুরের কুশমণ্ডী থানায় যে বিশাল দীঘিটি রয়েছে মহীপাল দীঘি নাম নিয়ে তার দৈর্ঘ্য ১৩৪০ গজ এবং প্রস্থ ৩৭০ গজ। বর্তমানে এই দীঘিটি প্রায় মজে গেছে। দীঘিটির পাড়ে রয়েছে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এই দীঘিটি ঘিরেও ছড়িয়ে আছে নানাধরণের কাহিনী। নানা লোকশ্রুতি।

প্রচলিত একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে এই বিশাল দীঘিটি নাকি খনন করিয়েছিলেন মহীপাল এক শ্রেষ্ঠী কন্যার ইচ্ছায়। এর কাছেই ছিল তাঁর প্রমোদ প্রাসাদ। সেই প্রাসাদেই আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকতেন মহীপাল।

এদিকে চারিদিকে শত্রুর করাল ছায়া। পাল সাম্রাজ্য গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে শত্রুরা। কিন্তু মহীপাল মত্ত হয়ে আছেন নারী আর সুরায়। ভুলে গেছেন যুদ্ধ করতে। ভুলে গেছেন রাজ্যশাসন ও তরবারি ধরতে। পালরাজ বংশের গৌরব অস্তাচল গামী। পালবংশের এই বীর সন্তান বীরের ধর্ম ভুলে হয়ে উঠেছেন নিছকই এক প্রমোদ বিলাসী যুবক। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। ডুবে আছেন তিনি ভোগ-বিলাসে। নারী আর সুরা গ্রাস করে নিয়েছে তাঁর নৈতিক মূল্যবোধ, ভুলিয়েছে রাজ কর্তব্য, ভুলিয়েছে বীর ধর্ম। বীর মহীপাল কেমন যেন হয়ে পড়েছেন মোহাচ্ছন্ন। দুর্বল নেশাগ্রস্ত ভীরু কাপুরুষের মতো। প্রমোদ গৃহই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। দিবারাত্রির লীলা নিকেতন।

হ্যাঁ, সেই সন্ধ্যাতেও সুরাপাত্র হাতে মৌজ করে প্রতীক্ষায় ছিলেন মহীপাল তন্দ্রা জড়িত চোখে কোন এক রূপসীর জন্যই বুঝি। সময় গড়িয়ে যায়। এত দেরী হচ্ছে কেন? উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠেন রাজা। ঘন ঘন পায়চারী করতে থাকেন প্রমোদ কক্ষের ভিতরে।

এক সময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। দ্বার প্রান্তে শোনা যায় নূপুরের রুণুঝুনু ধ্বনি। অধীর আগ্রহে দুহাত ছড়িয়ে আলিঙ্গনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান রাজা সেই সুন্দরীর দিকে।

কিন্তু একি, পেছিয়ে যায় কেন ঐ সুন্দরী? টলো পায়ে রাজা আবার এগিয়ে যান সেই রমণীর দিকে। সহসা গর্জে ওঠে বামাকণ্ঠ—"স্তব্ধ হন রাজন! পাল সম্রাটের পক্ষে শোভা পায় না এই বিলাস ব্যসন, এই আলস্য, ভীরুতা ও লাম্পট্য। এই নিন্ তরবারি বীরের ভূষণ, যান ফিরে আসুন—শত্রু সৈন্য নাশ করে, বিজয়ীর বেশে পাল বংশের মুখ উজ্বল করে।' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহীপাল। কিছু বোঝার আগেই তরবারি মহীপালের হাতে তুলে দিয়েই দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রমোদ কক্ষ থেকে কোথায় যেন সহসাই অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই সুন্দরী রমণী।

কি হলো? চমক লাগলো! মহীপালের হাতে সুরাপাত্রের বদলে তরবারি কেন? বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল সারা দেহের ভিতরে। 'আমি অলস? আমি ভীরু? আমি লম্পট? শত্রু সৈন্য নাশ করতে হবে? তবে কি শত্রুরা রাজ্য গ্রাস করতে চলেছে?

কি একটা বিপ্লব ঘটে গেল যেন! অন্তরে জেগে উঠলো ঘুমন্ত সিংহ। ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে সেই তরবারি হাতে চাবুক খাওয়া সিংহের মতো গর্জন তুলে।

জাগ্রত সিংহ বীর মহীপাল যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর হৃত সাম্রাজ্য। উদ্ধার করেছিলেন পাল বংশের লুপ্ত গৌরব। আর সেদিনের সেই প্রেরণাময়ী নারীকে খুঁজে বের করে দিয়েছিলেন রাণীর মর্য্যাদা।

ঐ প্রেরণাময়ী নারী ছিলেন এক শ্রেষ্ঠী কন্যা। শোনা যায় তাঁরই ইচ্ছায় সেই প্রমোদ ভবনের প্রান্ত থেকে খনন করিয়ে ছিলেন মহীপাল এই বিশাল দীঘি।

লোকশ্রুতি আরো বলে যে, ঐ মহীয়সী রাণী প্রজাদের জল কষ্ট নিবারণের জন্যই নাকি খনন করিয়ে ছিলেন ঐ দীঘি এবং ঐ দীঘিটি ততটাই দীর্ঘ হয়েছিল যতটা পথ একটানা হেঁটে গিয়ে থেমেছিলেন ঐ রাণী।

লোকে বলে, ঐ ভগ্নস্তুপই সেই প্রমোদ প্রাসাদ। বর্ষাকালে যখন ভর্তি হয়ে যায় ঐ দীঘি জলে তখন নাকি তার ওপরে ভেসে ওঠে এক রমণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি। জ্যোৎস্না রাতে এখনো মাঝে মাঝে নাকি মহীপাল দীঘির পাড় ধরে হেঁটে যান ছায়ার শরীরে এক সুন্দরী রমণী—লোকে বলে, ঐ রমণীই নাকি সেই শ্রেষ্ঠী কন্যা যিনি জাগ্রত করেছিলেন মহীপালকে। উদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত গৌরবকে।

এই কাহিনী কতোটা ইতিহাস সম্মত তা বলা কঠিন তবে মহীপাল ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মহীপাল দীঘিও বর্তমান। ঐ শ্রেষ্ঠী কন্যার কাহিনী কতোটা ঐতিহাসিক তা বলা যায় না।

পালবংশের দুর্দিনে মহীপাল সিংহাসনে বসে প্রথম দিকে আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি সব কিছু ঝেড়ে ফেলে যে বিপুল বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের কাহিনী থেকেই তা জানা যায়। এক্ষেত্রে কারো প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েও থাকতে পারেন এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আসলে যখন কোন জাতীয় বীর বা কোন বিশেষ ব্যক্তি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তখন ধীরে ধীরে ঘটনা প্রবাহে প্রকৃত ইতিহাস ঝাপসা হয়ে আসে এবং কালে কালে নানা লোকশ্রুতি গড়ে ওঠে তাঁকে কেন্দ্র করে। বলা বাহুল্য পাল সম্রাট মহীপালের ক্ষেত্রেও ঠিক তাইই ঘটেছে।

লুপ্তপ্রায় পাল সাম্রাজ্য উদ্ধার করে, বহু দেবালয়, বৌদ্ধবিহার, দীঘি ও নগরীর প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করে, বহুবিধ জনহিতকর কাজের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে তিনি পেয়েছিলেন অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আর তাইই তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বহু গল্প,

বহু কাহিনী। দিনে দিনে ঘটনা অতীত হয়েছে। স্মৃতি হয়েছে ধূসর থেকে ধূসরতর। জনপ্রিয় রাজার নামে প্রচলিত কাহিনী লোকমুখে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে হতে পরিণত হয়েছে বিচিত্র সব লোকশ্রুতিতে। যেমন হয়েছে এই মহীপাল দীঘির ক্ষেত্রে।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"দীর্ঘতম কাল ব্যাপিয়া ইহা সমাজে প্রচলিত থাকিবার ফলে রাজা মহীপালের মৌলিক ঐতিহাসিক আচরণের মধ্যে বিবিধ অনৈতিহাসিক উপাদান প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনী অধিকাংশই ইতি কথার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়াগিয়া অনৈতিহাসিক জনশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে।"

—বাংলার লোক সাহিত্য (প্রথম খণ্ড—৬৫৩ পৃষ্ঠা)

এই উক্তির সঙ্গে আমরা একমত।

(১৮) শ্রীমতী নদী :

উত্তরদিনাজ পুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে যে পীচ রাস্তাটা চলে গেছে ফতেপুর হয়ে ইটাহারের দিকে তারই পাশ দিয়ে দেখা যায় একটা ক্ষীণকায়া নদীর ধারা। বর্ষাকাল ছাড়া ঐ নদীতে জল থাকে না। ভরাট হয়েগেছে তার বুক। অথচ কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও তার বুকের ওপর দিয়ে নৌকা চলতো। একদিন সেছিল প্রাণবন্তা। আজ ম্রিয়মানা। এর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল কত গ্রাম-গঞ্জ। স্মৃতিভারে এখন সে ভারাক্রান্তা। এখন বর্ষাকাল ছাড়া একে নদী বলেই ধারণা করা কঠিন। হ্যাঁ, আমরা শ্রীমতী নদীর কথাই বলছি। একদা যে ছিল নদী আজ সে ক্ষীণকায়া জলধারা মাত্র!

এই শ্রীমতীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা গল্প, নানা কাহিনী। লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে সেই সব গল্প ও কাহিনী যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায়। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে লোকশ্রুতিটি এই অঞ্চলে প্রচলিত সেটি হলো এই—

বহুকাল আগে শ্রীমতী নামে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল এই অঞ্চলেরই কোন এক গ্রামে। কোন এক যুবক নাকি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে কামনা করে কিন্তু শ্রীমতী রাজী হয় না তার প্রস্তাবে। দিন যায়। মাস যায়। যুবক কিন্তু আশা ছাড়ে না কিছুতেই। বার বার প্রস্তাব দিয়ে যায় সে। বারবারই প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমতী।

শেষে একদিন নির্জনে একা পেয়ে হাত চেপে ধরে শ্রীমতীর ঐ যুবক। 'আজ কথা দিতেই হবে তোমাকে। নইলে ছাড়বোনা কিছুতেই।' চোখে মুখে ফুটে ওঠে আদিম হিংস্রতা। শ্রীমতী ভয় পেয়ে হাত ছাড়িযে নিয়ে দৌড় লাগায় প্রাণ পণে। যুবক তাড়া করে। ছুটতে থাকে পিছনে পিছনে। শক্ত মাটি আর কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় শ্রীমতীর কোমল পদতল। ঝরতে থাকে রক্ত ঘাসের ওপরে, শক্ত মাটির ওপরে। অঙ্কিত হয়ে যায় রক্তের দাগ তার ছোটার পথের ওপরে। তবু ছুটতে থাকে সে প্রাণ পণে। ছুটছে, ছুটছে আর ছুটছে। পিছনে ছুটে আসছে সেই যুবকও। কিন্তু আর পারে না সে। দুচোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে। টলতে থাকে পা। লুটিয়ে পড়ে সে মাটির ওপরে। আর ওঠে না।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যে পথে তার পায়ের রক্ত ঝরেছিল সেই রক্ত ঝরা পথের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক বেগবতী নদী। ভাসিয়ে নিয়ে যায় শ্রীমতীর প্রাণহীন দেহ দক্ষিনের দিকে। ঐ যুবকও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেয় জলে শ্রীমতীকে উদ্ধারের বাসনায়। কিন্তু ভেসে যায় নদীর স্রোতে সেও।

সেই নদী হলো ঐ যুবতী। ঐ নদীর নাম হলো শ্রীমতী। আর ঐ যুবক পরিণত হলো প্রণয়ের দেবতা 'গাভুরায়'।

আজো ঐ অঞ্চলের রাজবংশী যুবকরা পূজো করে 'গাভুরার'। স্মরণ করে 'শ্রীমতীকে'। গাভুরার জন্যই তো হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় তাদের। পূজোয় অংশ নেয় যুবতী মেয়েরাও। গাভুরার আশীর্বাদ না পেলে যে জীবনই বৃথা তাদের। সুস্থ যৌন জীবনের আকাঙ্খাই গাভুরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে রেখেছে তাদের যুগ যুগ ধরে।

লোকে বলে 'ছিরামতী' বর্ষাকালেই নদীতে রূপান্তরিত হয়েছিল তাই বর্ষাকালেই নদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে সে। অন্য সময়ে থাকে ম্রিয়মানা।

এ কাহিনীর পিছনে কোন ইতিহাস লুকিয়ে আছে কিনা তা বিচার করা আজ কঠিন। হয়তো অতীতের কোন যুবক-যুবতীর ব্যর্থ প্রণয় কাহিনীকে এভাবেই রূপকের আড়ালে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। সেই যুবতীর নাম হয়তো শ্রীমতী বা ছিরামতীই ছিল। আর ঐ প্রণয় পাগল যুবকের নামও হয়তো ছিল গাভুরাই। কে জানে ?

আবার এমনও হতে পারে শান্ত নদী শ্রীমতী ফলে ফুলে শস্য শ্যামলা করে তুলেছিল ঐ অঞ্চল বলেই হয়তো কৃতজ্ঞ মানুষরা রূপসী স্নেহময়ী কন্যার সঙ্গে তুলনা করেছিল শ্রীমতীকে এবং মুখে মুখে ছড়িয়েছিল নানা গল্প। গাভুরাকে প্রণয়ের দেবতা রূপে বসিয়েছিল মর্য্যাদার আসনে যাতে যুবক যুবতী তাঁর আশীর্বাদে সংযত যৌন জীবন যাপন করে এই উদ্দেশ্যেই।

এই লোকশ্রুতির মোটিফ্ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের ঐন্দ্রজালিক রূপান্তরের অভিপ্রায়টিই মনে পড়ে। বহু দেশেই ঐন্দ্রজালিক রূপান্তরের কাহিনী প্রচলিত আছে। সেখানে মানুষ কোন পশু, পাখী, পাথর, নদী বা কোন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে দেখা যায়। এখানে শ্রীমতী হয়েছে নদী আর গাভুরা দেবতা !

গ্রীক দেবতা কিউপিড্ এবং আমাদের মদন দেবের কথাই মনে পড়িয়ে দেয় 'গাভুরা'। একাহিনী মনে পড়িয়ে দেয় কীটসের বিখ্যাত কবিতা 'Ode on a greecian urn' কে। সেখানে যুবক ধরতে পারেনি যুবতীকে এখানেও তাই তবে সেখানে মৃত্যুকে জয় করেছে তারা এখানে পারেনি পার্থক্য এটাই। অবশ্য মৃত্যুর পরেও অমর হয়েছে শ্রীমতী ও গাভুরা অন্যভাবে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার কালিয়াগঞ্জ থেকে ইটাহার পর্য্যন্ত অঞ্চলে শ্রীমতী এবং গাভুরা খুবই জনপ্রিয় নদী ও জনপ্রিয় দেবতা।

(১৯) বৈদোল রাজার ঢিবি :

গঙ্গা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, করতোয়া, টাঙ্গন প্রভৃতির তীরে তীরে পাল এবং সেন আমলে উত্তরবঙ্গের বহুস্থানেই যেমন গড়ে উঠেছিল বহু সমৃদ্ধ গ্রাম ও গঞ্জ, তেমনিই শ্রীমতীর তীরে ও গড়ে উঠেছিল আনাউন, বৈদোল, দেহাবন্ধ, ফতেপুর প্রভৃতির মতো সমৃদ্ধ গ্রাম ও গঞ্জ। এই সব অঞ্চলের জমিদার বা সামন্ত প্রভুদের কল্যাণে রীতি মতো জাঁকজমকপূর্ণও হয়ে উঠেছিল কোন কোন গ্রাম বা গঞ্জ।

এমনই একটি সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে উঠেছিল বৈদোলে। এই বৈদোলের ধ্বংস স্তুপ ও দীঘিদের ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা কাহিনী। ছড়িয়েছে নানা লোকশ্রুতি। উঁচু ঢিবি দেখিয়ে লোকে বলে যে ঐখানেই ছিল বৈদোল রাজার প্রাসাদ। বিভিন্ন ঢিবির পরিচয়ও দেয় তারা নানা নামে। কোথায় ছিল ট্যাঁকশাল, কোথায় ছিল কামারশাল, কোথায় ছিল হাতিশাল বা ঘোড়াশাল এসবও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে তারা। দেখাবে রাণী দীঘি, আমলা দীঘি কৈকুঁড়ি, শাঁখারী পুকুর প্রভৃতি অনেক কিছুই। শোনাবে বৈদোল রাজাদের নানা কীর্তি কাহিনীও

কিন্তু কি করে ধ্বংস হলো সবকিছু তার উত্তরে লোক মুখে শোনা যাবে এই কাহিনী—বৈদোল রাজারা ছিলেন খুবই শান্তিকামী এবং প্রজাদরদীও। দাসদাসী লোকজনে সর্বদা গম্ গম্ করতো রাজবাড়ী। হাতি শালে হাতি ছিল, ঘোড়াশলে ঘোড়া ছিল। ঢাল তলোয়ার হাতে সৈন্য ছিল, ছিল মন্ত্রী এবং নানা রাজকর্মচারীও। ট্যাঁকশালে টাকা তৈরী হতো। কাগজী টোলায় কাগজ তৈরী হতো। কামারশালে তৈরী হতো অস্ত্র। বৈদোলের রাজ কুমাররা ট্যাঁকশালে তৈরী 'গুজরী মুদ্রাকে গুলতির গুলি হিসাবে ব্যবহার করতেন এমনই ছিল তাঁদের সমৃদ্ধি এবং বড়লোকী চাল।

পরম গৌরবে দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব করার পরেই শনির দৃষ্টি পড়লো বৈদোল রাজ বাড়ীতে। উদ্ধত রাজ কুমারের দৃষ্টি পড়লো রাজপুরোহিতের সুন্দরী কন্যার প্রতি। বিয়ে করতে চাইলেন রাজকুমার ঐ কন্যাকে কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজী হলেন না কিছুতেই নীচু জাতির সঙ্গে বিয়ে দিতে। তখন রাজ কুমার অপহরণ করলেন ঐ কন্যাকে। ঐ ব্রাহ্মণ তখন ক্রোধে অভিশাপ দিলেন যে রাজকুমারের সন্তান হবে না কোনদিন। রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তারপরেই ব্রাহ্মণ ঝাঁপিয়ে পড়েন শাঁখারী পুকুরের জলে আর ওঠেন না।

ঐ রাজ কুমার পরে রাজা হলেন। কিন্তু স্বভাব গেলনা তাঁর। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই লুব্ধ হতেন তিনি। আশে পাশের গ্রামের কতো মেয়ে যে তাঁর কামনার শিকার হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। প্রজাদের ওপরে অত্যাচারও চালাতে লাগলেন নানাভাবে ঐ নবীন রাজা।

কিন্তু সব পাপেরই তো শেষ আছে। তাই বুঝি এক অন্ধকার রাতে বৈদোল আক্রমণ করলো মুসলিম সেনাদল। ধ্বংস হয়ে গেল বৈদোল রাজ বাড়ী। নিহত হলেন পাত্র পরিজন সহ সেই অত্যাচারী রাজা নিঃসন্তান রূপেই। এমনি করেই ফলে গেল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অভিশাপ! অনাদরে অবহেলায় দিনে দিনে ভেঙে পড়লো জরাজীর্ণ প্রাসাদ।

জঙ্গলে ভরে গেল চারিদিক। গ্রামের লোকেরা ইঁট কাঠ পাথর খুলে নিয়ে যেতে লাগলো। দীঘিগুলোও মজে যেতে লাগলো। শূন্য হয়ে গেল সব। এখন শুধু ভগ্নস্তুপ আর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ইঁট পাথরের টুকরোর মধ্যেই অতীত স্মৃতির রোমন্থন।

এখন দেখা যাক্ এই কাহিনীর উৎস ও অভিপ্রায় বিচার করে।

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে এই বংশের কোন এক পূর্ব পুরুষ নাকি লক্ষ্মণ সেনের সেনাপতি ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখানোর ফল স্বরূপ তিনি ভূঁইহারা, কবরতল এবং সুরহোর মানিকর পরগণা লাভ করেন লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে এবং কালক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে সামন্ত রাজা হয়ে ওঠেন।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে বৈদোল রাজবংশ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো ঘটনা। বৈদোল রাজাদের প্রচলিত গুজরী মুদ্রাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই অঞ্চলে। কিন্তু আনাউন নিবাসী রজনীকান্ত সরকার মহাশয় দাবী করেন যে তিনি বৈদোল রাজাদের দেওয়ানদের বংশধর। একটি জীর্ণ দলিল দেখিয়ে তিনি জানালেন যে ঐ দলিলে তাঁর পূর্ব পুরুষ রাজা রাম সরকারকে বৈদোল রাজ ৩২ বিঘা জমি জায়গীর দিয়ে ছিলেন। ঐ রাজা রামের পুত্র রামনাথ, রামনাথের পুত্র বল্লভ, বল্লভের পুত্র বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথের পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের পুত্র রাজকেশর, রাজকেশরের পুত্র সহদেব এবং সহদেবের পুত্র রজনীকান্ত।

কোন এক বৈদোল রাজার আমলে দেওয়ান ছিলেন রাজা রাম। সেই হিসাবে তিনি খুব বেশী হলে আড়াই শো বছর আগের লোক ছিলেন। কিন্তু লোকশ্রুতি অনুসারে বৈদোল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আরো প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে!

লোকশ্রুতি বলে যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান টিপু বল্লভের সময়েই মুসলিম আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায় বৈদোল যাজবংশ। ঐ টিপু বল্লভ ছিলেন খুবই অত্যাচারী এবং লম্পটও বটে।

রজনীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যে প্রাচীন খাড়াটি ছিল সেটি এখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে আছে। তবে হাতে লেখা চন্ডীমঙ্গল, মনসা মঙ্গল, জীমূত বাহন, লক্ষ্মী-গণেশ প্রভৃতির মাহাত্ম্যসূচক বেশ কিছু পূরনো পুঁথি আছে রজনী বাবুর বাড়ীতে এখনো।

বৈদোল রাজা সম্ভবত ছিলেন ছোট খাটো সামন্ত রাজা বিশেষ। তাঁদের প্রাচীনত্বের সঠিক কাল নির্ণয় করা আজ কঠিন। তবে গুজরী মুদ্রা, প্রাচীন দীঘি ও ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় বাংলায় মুসলিম আক্রমণের আগে থেকেই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অন্তত ইংরেজ আমলের আগে তো বটেই!

কালিয়াগঞ্জ থেকে ফতেপুর ছুঁয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে দেহাবন্ধ হয়ে ইটাহারের দিকে সেই রাস্তা ধরে অগ্রসর হলেই শ্রীমতী নদীর তীরে চোখে পড়বে এই বৈদোল গ্রাম ও তার ধ্বংসাবশেষ।

লোক ঐতিহ্যে অতীত স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আজ নানা লোকশ্রুতির জন্ম দিয়েছে। প্রিয় রাজার পরে অত্যাচারী রাজার হাতে নিগৃহীত হবার করুণ স্মৃতি আজ যেমন তীব্র ঘৃণায় স্মরণ করে এখান কার জনগণ তেমনিই গর্বও প্রকাশ করে তারা বৈদোলের প্রাচীন রাজ বাড়ী ও রাজাদের নিয়েও।

প্রসঙ্গত বলি, বৈদোল রাজাদের সম্পত্তি বর্তমানে যে মুসলিম ভদ্রলোকের হাতে তিনি বর্তমানে নাকি বাংলাদেশের বাসিন্দা তবে তাঁর আত্মীয় স্বজনরা আছেন দেহাবন্ধ ও তার আশে পাশে।

(২০) বৈরহাট্টা গ্রাম :

বংশীহারী থানার অন্তর্গত বৈরহাট্টা গ্রামটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে নীরবে নিভৃতে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে মরছে আজ অভিমানে। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ। ভগ্নমূর্তি ও ইটপাথরের ছড়া ছড়ি। রয়েছে ছোট বড় বহু প্রাচীন দীঘি এবং প্রাচীন গাছ পালাও। লোকে বলে বৈরহাট্টাই নাকি সেই মহাভারতের বিরাট নগর।

কালিয়াগঞ্জ থেকে যে পীচ রাস্তাটা চলে গেছে বুনিয়াদপুরের দিকে সেই রাস্তায় পড়বে জোড়াদীঘি গ্রাম। সেখান থেকে নির্জন মাটির রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে মাইল সাতেক হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে এই প্রাচীন গ্রাম। আবার ইটাহার থেকেও এর দূরত্ব ঐ মাইল সাতেকই হবে। দুর্গম পথ। দুপথেই বার কয়েক ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ছুটে গেছি এখানে দলবল নিয়ে। বদল পুর থেকে আরতিদের সঙ্গে গরুর গাড়িতে গেছি দুবার আর দুবার গেছি মনসাপুর থেকে সুবোধ চক্রবর্তীদের সঙ্গে। কিন্তু যতবারই গেছি বিস্মিত হয়েছি এখান কার লোকসংস্কৃতির অফুরন্ত উপাদানের সন্ধান পেয়ে।

এখানকার ব্রতপার্বণে ও মেলায় ঘুরেছি। বসেছি ছড়া ও ধাঁধাঁর আসরে। বুড়ীমাতলায় দেখেছি মুখোস নৃত্য। প্রাচীন গাছের গোড়ায় দেখেছি ভগ্নমূর্তির স্তূপ। প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে শুনেছি নানা গল্প, নানা লোক কাহিনী। দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, বিস্মিত হয়েছি। শিহরিত হয়েছি বারে বারে। হয়েছি পুলকিত ও ক্ষণে ক্ষণে। কতো গান, কতো ধাঁধাঁ, ছড়া, কতো গল্প, কতো কাহিনী। এখনো চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে সেই সব উজ্বল উচ্ছল মুখগুলো। দেখতে পাই মেলা ও উৎসবে গ্রামীন ছেলেমেয়ে এবং নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহনের বর্ণোজ্বল ছবি। বারে বারে মন ছুটে যায় বৈরহাট্টার মেলায়, উৎসবে, প্রাচীন দীঘিদের পাড়ে। বুড়ীমার মন্দিরে।

(ক) গড়দীঘি : প্রাচীন দীঘিদের পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে শুনেছি প্রাচীন দিনের কথা। সুদীর্ঘ গড় দীঘির পাড়ে বসে শুনেছি বিরাট রাজার কাহিনী। বিরাট রাজাই নাকি খনন করিয়েছিলেন উত্তর দক্ষিনে লম্বা এই বিশাল দীঘিটিযার দৈর্ঘ্য আটশো গজের বেশী এবং প্রস্থ প্রায় চারশো গজের মতোন এবং দোতলা সমান উঁচু পাড়। এখন শুখিয়ে গেছে এই দীঘি। বর্ষাকাল ছাড়া জল জমে না আর। চাষও হচ্ছে তার বুকে এখন।

শুনেছি গড় দীঘির পাড়ে নাকি ছিল একটা প্রাচীন গড়। কিন্তু আজ আর নেই তার কোন অস্তিত্ব। শত্রু সৈন্যরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই নগরে তখনই ঘর বাড়ী মানুষজনও রাজ প্রাসাদের সঙ্গে নাকি ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই গড়টিও। ধ্বংস করে দিয়েছিল মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তিও। আর শত্রুসেনার সেই বর্বর আক্রমণের পর থেকেই ধীরে ধীরে শুখিয়ে গেল টলটলে জলের বিশাল এই দীঘিটি। হারিয়ে গেল তার প্রাণোচ্ছল রূপ।

এই দীঘিকে কেউ কেউ গৌড় দীঘিও বলেছে। বলেছে আরো সব কতো বিচিত্র কথা। এই দীঘির জল নাকি অপবিত্র করে দিয়েছিল শত্রু সেনারা সেইজন্যই শুখিয়ে গিয়েছিল সব জল। শুনেছি এর বুকে এক রাজ কন্যার আত্মবিসর্জনের করুণ কাহিনীও।

(খ) মৈলান দীঘি : বৈরহাট্টার উত্তরে রয়েছে আর একটা বিশাল দীঘি—নাম তার মৈলান দীঘি। এই দীঘিকে ঘিরেও ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী।

পূব পশ্চিমে লম্বা এই দীঘিটিতে এখনো জল থাকে বারোমাসই। তবে গভীরতা কমে এসেছে। এই মৈলান দীঘিকে ঘিরেও প্রচলিত আছে নানা কাহিনী।

প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে এক মালিনী নাকি বৈরহাট্টার রাজকন্যাকে প্রতিদিন সুগন্ধী ফুলের মালা যোগাতো। রাজ রাণীকেও দিত নানা সুগন্ধী ফুল। রাজপুরীর সকলেই খুব খুশী ছিল ঐ মালিনীর ওপরে। কিন্তু একদিন সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠলো ক্রমেই। রাজকন্যা ছুটে গেলেন তার মৃত্যু শয্যায়। জানতে চাইলেন তার শেষ ইচ্ছার কথা। মালিনী ক্ষীণ কণ্ঠে জানালো তাদের বাড়ী থেকে গৌড় দীঘি বহু দূরে। তাদের বড় জলকষ্ট। একটা দীঘি যদি খনন করে দেওয়া হয় তার বাড়ীর কাছে তাহলেই সে খুশী হবে। এই বলেই সে ঢুলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। রাজকন্যা মালিনীর সেই শেষ ইচ্ছা জানান রাজাকে।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় দীঘি কাটার কাজ। একদিন সম্পূর্ণও হয় ঐ দীঘি। নাম দেওয়া হয় মালিনী দীঘি। কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় মালিনী—মালিয়ান—মৈলান দীঘি।

মৈলান দীঘির পশ্চিম পাড়ে দেখা যায় একটা ভগ্নস্তুপ। লোকে বলে যে ওখানে ছিল রাজার বিশ্রামের স্থান। নাচগান হতো ওখানে। মৈলান দীঘিতে ভাসতো সৌখীন বজরা। চাঁদিনী রাতে জমে উঠতো নাচ গানের আসর। শোনা যেত মধুর কণ্ঠস্বর আর রিনিঠিনি নূপুর নিক্কণ।

লোকে বলে, এখনো নাকি নীরব নিশীথে ঐ দীঘির বুক থেকে কোন কোন জ্যোৎস্নারাতে ভেসে আসে গানের কলি। শোনা যায় নূপুরের ঝংকার। বাতাসে ভেসে যায় বাঁশীর মন কেমন করা সুর।

—আরো শোনা যায়, এই দীঘির নীচে আছে সুড়ঙ্গ সেখানে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর সব ডাকাতের দল।

(গ) আলতা দীঘি : গৌড় বা গড় দীঘির পৌনে এক মাইল দূরে শুরু হয়েছে আরো একটা বিশাল দীঘি। এদীঘির নাম আলতা দীঘি। পূব পশ্চিমে লম্বা এই বিশাল দীঘিটিকে ঘিরেও ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী।

একটি প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায়যে এই দীঘিটি কাটা সম্পূর্ণ হবার পরেও যখন কিছুতেই জল ওঠে না তখন এক সধবা নারী কোথা থেকে চলে আসে ঐ দীঘির পাড়ে। আলতা রাঙানো পা নিয়ে সে নেমে যায় ঐ দীঘির বুকে। ঠিক মাঝখানে পা রাখতেই পাতাল থেকে কুলু কুলু বেগে জল উঠতে শুরু করে।

প্রথমে ডুবে যায় ঐ রমণীর পদতল। তার পরে জল উঠতে থাকে হাঁটু ছাপিয়ে কোমর, ক্রমে কোমর ছাপিয়ে বুক, বুক ছাপিয়ে মাথা। দেখতে দেখতে সলিল সমাধি হয়ে যায়

ঐ রমণীর। হায় হায় করে ওঠে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য নরনারী। কেউ কেউ ঝাঁপিয়েও পড়ে দীঘির জলে তাকে উদ্ধারের বাসনায়। কিন্তু ততক্ষণে দীঘির পাড় পর্য্যন্ত উঠে এসেছে জল। থৈ থৈ দীঘি। হারিয়ে যায় সেই সধবা নারী চিরতরে ঐ দীঘির বুকে আলতা রাঙানো পা দুখানি নিয়ে। আর ঐ আলতা রাঙানো পা নিয়ে দীঘিতে জল এনেছিল বলেই দীঘিটির নাম রাখা হয় আলতা দীঘি।

অন্য একটি লোকশ্রুতিও অবশ্য আছে এই দীঘিটির নাম করণের বিষয়ে। সেই দ্বিতীয় লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে ঐ দীঘিটিতে রাজকন্যা যখন তাঁর সখীদের সঙ্গে নৌকা বিহার করছিলেন তখন নৌকার বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আলতা রাঙানো পা। ঐ পায়ের আলতা ধুয়ে যায় দীঘির জলে এবং জলের রং হয়ে যায় লাল। সেই থেকেই ঐ দীঘির নাম হয়ে যায় 'আলতা দীঘি'।

এই দীঘিরও পশ্চিম পাড়ে আছে একটা ধ্বংসাবশেষ। লোকে বলে ওখানেই ছিল আনন্দ বাসর। নাচ গান হতো ওখানে। দীঘির বুকে ভাসতো নৌযান। চলতো নৌবিহার। হাসি গানে মুখর হয়ে উঠতো আলতা দীঘি জ্যোৎস্না রাতের অবকাশে।

(ঘ) সিঁদুর মুছি : বৈরহাট্টার ভিতরে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় সব দীঘিকেই ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী।

এখানে মাঝারি আকারের একটি দীঘির নাম সিঁদুর মুছি। এই নামকরণের পিছনে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তা হলো এই—

বহুদিন আগে কোন এক দম্পতি এই দীঘির পাড় দিয়ে দূরে কোথায় যেন যাচ্ছিল। স্বামীটির খুব জল তেষ্টা পাওয়ায় স্ত্রীকে গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে স্বামীটি জল পান করতে নামে দীঘিতে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল স্বামী ফিরছেনা দেখে স্ত্রীটি এগিয়ে যায় দীঘির দিকে। জলের ধারে গিয়ে দেখতে পায় জলের ওপরে ভাসছে স্বামীর মাথার চুলগুলো। বৌটি তখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দেয়। লোকজন জমে যায় সেখানে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায় মাথার চুল গুলোও। জলে নেমে লোকজন খুঁজতে শুরু করে দেয়। কিন্তু দীঘির জল তোল পাড় করেও সন্ধান মেলে না সেই হতভাগ্য স্বামীর। বুকফাটা আর্তনাদে ভেঙে পড়ে বৌটি। তার পরে হাতের শাঁখা নোয়া ভেঙে সিঁদুর মুছে বিধবার বেশে ফিরে যায় বাড়ী। সেই থেকেই অভিশপ্ত ঐ দীঘিটিকে 'সিঁদুর মুছি' নামে পরিচয় দিতে শুরু করে সবাই। আর সধবারা সেইদিন থেকেই স্নান করা বন্ধ করে দেয় ঐ দীঘিতে।

(ঙ) হাতি ডোবা : ছোট্ট একটি বাঁধানো দীঘির নাম হাতিডোবা। লোকে বলে ঐ দীঘির নীচে খুব কাদা ছিল এবং ঐ কাদায় পড়ে রাজার হাতি আর উঠতে পারে নি। ডুবে যায়। তাইই নাকি ঐ দীঘির নাম হয়েছে হাতি ডোবা।

ছোট্ট বাঁধানো ঐ দীঘিটি রাজ বাড়ীর ভিতরেই ছিল বলে মনে হয়। পুর নারীদের ব্যবহারের জন্যই বোধ হয় তৈরী হয়েছিল ওটি।

(চ) কীচক কুঁড়ি : বৈরহাট্টায় ছোট্ট অথচ খুব গভীর একটা দীঘি নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত বাঁধানো ইট দিয়ে। এই দীঘির দক্ষিণে পাথরের ড্রেন আছে। ড্রেনটি চলে গেছে

বহুদূর পর্যন্ত। ঐ ড্রেন দিয়ে ঐ দীঘিতে সম্ভবত গরমও ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করানো হতো।

প্রচলিত লোকশ্রুতি বলে এই সেই স্থান যেখানে ভীম বধ করেছিল কীচককে। মতান্তরে কীচক ঐ দীঘিতে স্নান করতেন বলেই দীঘির নাম কীচক কুঁড়ি।

এবার দেখা যাক্ বৈরহাট্টার এই সব দীঘিগুলোর উৎস ও অভিপ্রায় বিচার করে।

বৈরহাট্টার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে প্রাচীন দিনের বহু স্মৃতি চিহ্ন। একদা যে এখানে এক সমৃদ্ধ হিন্দু নগরী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে পাওয়া গেছে বহু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি, পাওয়া গেছে বহু ভগ্নমূর্তি, মকরের মুখ অঙ্কিত পাথরের খিলান, দেবদেবীর মূর্তি খোচিত চওড়া পাতলা ইট, বাঁধানো দীঘি ও ধ্বংসস্তপ। এখানে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও অন্যান্য মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা যাদুঘরে এবং চুরিও হয়ে গেছে বহু মূর্তি ইট ও অন্যান্য মূল্যবান প্রত্ন সামগ্রী।

তবে মহাভারতের বিরাট নগর বলে এই বৈরহাট্টাকে ভাবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। যদিও কিছু দূরেই বাণ গড়ের সঙ্গে দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধর কাহিনী জড়িত হয়েছে এবং পাণ্ডুয়ার সঙ্গে পাণ্ডবদেরও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। সম্ভবত ঐসব স্থানের নানা কাহিনী এবং লোকশ্রুতিই পরবর্তী কালে বৈরহাট্টা বাসীদেরও বৈরহাট্টা সম্বন্ধে অনুরূপ প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে গৌরব লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকবে। তাইই বিরাট রাজা, বিরাট নগর, ভীম কীচক প্রভৃতির কাহিনী প্রচারিত হয়েছে মুখে মুখে।

তবে এখানকার মূর্তি ও পাথরের কারু কাজ দেখে মনে হয় এই অংশে মুসলিম আক্রমণের পূর্বে এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। গৌড় বা গড় দীঘি সেই সমৃদ্ধ হিন্দু রাজাদেরই কীর্তি। কেননা দীঘিটি উত্তর দক্ষিনে লম্বা। কিন্তু মৈলান দীঘি ও আলতা দীঘি পূব পশ্চিমে লম্বা যা মুসলিম ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে। তাই মনে হয় এই অংশে হিন্দু রাজাকে ধ্বংস করে মুসলমানরা বস বাস শুরু করেছিল। ছোট দীঘিগুলো হয় প্রাচীন যুগের দীঘিগুলিরই সংস্কৃত রূপ না হয় নতুন করে কাটা হয়েছিল। তবে বড় বড় দীঘিগুলিকে ঘিরে যেসব লোকশ্রুতি গড়ে উঠেছে সেগুলো সত্যিই ভেবে দেখার।

সম্ভবত মুসলমান শাসকগণ এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠার জন্যই এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান—গৌড় বা পাণ্ডুয়ার দিকে। বর্তমানে বৈরহাট্টা ও তার আশে পাশের গ্রাম আমিনপুর, কসবা, পাটন, রাণীপুর, বদলপুর ও হেতমপুরের অধিবাসীদের অধিকাংশই হলো রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক। কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনও আছে। আছে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়েরও লোক। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেখা মেলে না বিশেষ এইসব অঞ্চলে।

(২১) করণ দীঘি :

উত্তরদিনাজপুরের বিখ্যাত করণ দীঘি নিয়েও প্রচলিত আছে নানাকাহিনী। বিশাল এই দীঘিটি দেখিয়ে লোকে বলে যে এটি নাকি মহাভারতের বীরকর্ণ খনন করিয়েছিলেন এবং এর তীরে তিনি তর্পণ করতেন।

স্বরভক্তির নিয়মে কর্ণ থেকে করণ হওয়াটা অসম্ভব নাহলেও এই দীঘিটি যে কর্ণই খনন করিয়েছিলেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এইসব এলাকা অতিপ্রাচীন, পৌণ্ড্র বাসুদেবের সময় থেকেই উত্তরবঙ্গের এই অংশ আর্য্য ভারতের সংস্পর্শে এসেছে নানা ভাবে। কিছু দূরের বাণগড়েও শ্রীকৃষ্ণের যাদব সেনাদের আগমন ঘটেছে শোনা যায়। মহাভারতের যুগে অর্জুন এসেছেন পূর্ব ভারতে। সম্ভবত কর্ণও তাঁর কাহিনী নিয়ে এই অংশে অভিযান করে থাকতে পারেন। এবং সেই সময়েই জনসাধারণের সুবিধার্থে এই বিশাল দীঘিটি খনন করিয়েও থাকতে পারেন।

দীঘিটি মহাভারতের যুগের কিনা তা নিশ্চিত ভাবে বলা না গেলেও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ নেই। উত্তর দক্ষিনে লম্বা এই দীঘিটি যে হিন্দুযুগেরই প্রাচীন দীঘি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে দীঘিটি সংস্কার করা হয়েছে বহুবার।

সম্ভবত, স্থানীয় লোকেরা মহাভারতের বীর কর্ণের স্মৃতির সঙ্গে এই বিশাল দীঘিটাকে জড়িয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত করার জন্যই এমন কাহিনী প্রচার করে আসছেন বলে মনে হয়।

(২২) পীরপুকুর (তরঙ্গপুর) :

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থেকে যে রাস্তাটা শেঠ কলোনীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে রায়গঞ্জের দিকে তারই পূর্ব দিকে পড়ে তরঙ্গপুর গ্রাম। এই তরঙ্গপুরে ঢোকার মুখেই পড়বে একটা বিশাল প্রাচীন দীঘি। এর পাড়ে রয়েছে প্রাচীন কোন বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। ঐ দীঘিটার নাম পীর পুকুর। ঐ দীঘিকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতি।

লোকে বলে পীরসাহেব নাকি একরাতের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বলে কাটিযে ছিলেন ঐ দীঘিটি। ঐ দীঘির পাড়েই একটা ঘরে রাত্রে বিশ্রাম নিতেন তিনি। গভীর রাতে তিনি নাকি স্নান করতেন ঐ পুকুরে। সাঁতার কাটতেন এপার থেকে ওপারে। তার পরে ওপরে উঠে প্রার্থনা করতেন,—নামাজ পড়তেন।

এখনো নাকি গভীর রাতে ঐ পুকুরের জলে ওঠে নানা শব্দ। কে যেন সাঁতার কাটে। শেষ রাতে ঐ দীঘির পাড়ে এসে থামে একটা সাদা ঘোড়া। জল থেকে সিক্ত বসনে উঠে আসেন দীর্ঘদেহী এক সৌম্যকান্তি পুরুষ। চুল দাড়ি, পোষাক সব সাদা তাঁর। তার পরই সওয়ার নিয়ে ছুটে যায় সেই শ্বেত অশ্ব দিগন্তের পারে।

কিছু দূরেই রয়েছে তরঙ্গপুরের বাজার ঐ বাজারের পূর্ব দিকে কয়েকটা গাছের নীচে রয়েছে একটা পীরের থান। আগে নাকি গভীর জঙ্গল ছিল ওখানে। লোকে বলে পীরপুকুরের পীর আর তরঙ্গপুরের এই পীর নাকি একই ব্যক্তি—একই মহাত্মা পুরুষ। বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই পীরসাহেব। ঐখানে নাকি এখনো গভীর রাতে আগুন জ্বলে ওঠে। কে যেন ঝাঁট দেয় চারপাশে। টগ্‌বগ্‌ করে ছুটে যায় একটা সাদা ঘোড়া সওয়ার নিয়ে। পীর পুকুরের ঘোড়াটার মতোই দেখতে এই ঘোড়াটাও এবং পিঠে তার সেই সাদা চুল-দাড়ি নিয়ে একই সৌম্য কান্তি দীর্ঘ দেহী দরবেশ।

এই কাহিনীর উৎস বিচার করতে গেলে চলে আসে বাংলার মুসলিম আক্রমণ এবং পীরদের আগমনের কথা। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে উত্তরবঙ্গেও মুসলিম আধিপত্য কায়েম হয় এবং দলে দলে পীর দরবেশ আসতে থাকেন ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য। নানা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েও দূরারোগ্য ব্যধি সারিয়ে এঁরা মানুষকে প্রভাবিত করে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার সহজ করে তুলেছিলেন। এমনই এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পীর ছিলেন এই পীর পুকুর বা তরঙ্গপুরের পীর।

সাধু ও পীরদের মাহাত্ম্যসূচক বহু অলৌকিক কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই প্রচলিত আছে। মোটিফ অনুসারে এদের ডি-২২১ বা ডি-২২২ এ ফেলা যায়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নানা কল্পনার রং লাগে এইসব সাধু পীরদের কাহিনীতে এক্ষেত্রেও তাইই হয়েছে মনে হয়।

অনেক চেষ্টাতেও ঐ পীরের নাম জানা যায় নি। বাঁধানো কোন সমাধিও নেই ঐ দুই স্থানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার পীর পুকুরের পাড়ের পূর্ব তরঙ্গপুর গ্রামের সকলেই মুসলমান এবং তারা দাবী করে যে আফগান সেনারাই তাদের পূর্বপুরুষ।

তরঙ্গপুর-ভেউড়-রাতুন-আখানগর প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে আছে প্রচুর ভাঙা মূর্তি, ইট, পাথর, খিলান, সিঁড়ি বাঁধানো প্রাচীন দীঘি এবং ধ্বংসাবশেষ। ইসলাম-আগ্রাসনের সময়েই এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ হিন্দু রাজ্য যে ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্ব তরঙ্গপুরের আফগান বংশধরগণ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন বৈকি ?

(২৩) নাগর নদী :

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাস পাড়া লক্ষ্মীপুর সুজালীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নাগর নদীকে নিয়েও প্রচলিত আছে নানা কাহিনী। নানা লোকশ্রুতি।

একটি কাহিনী থেকে জানা যায় বহু অতীতে নাগর নামে এক সুন্দর যুবক ছিল। মাধবী নামে এক গরীবের মেয়ে ভালবেসেছিল তাকে। এক বাসন্তী রাতে মিলনও হয় তাদের। কিন্তু পরে নাগর অস্বীকার করে মাধবীকে এবং অপমান করে তাড়িয়ে দেয় তাকে। মাধবী তখন তাকে অভিশাপ দিয়ে ছুটে চললো মাঠ-বন পেরিয়ে দূরন্ত গতিতে মহানন্দার দিকে। নাগরের বুকেও লাগলো অনুশোচনার জ্বালা। ছুটলো সেও তাকে ফেরানোর তাগিদে।

পরের দিন সকালে দেখলো সবাই নাগরের বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। যে পথ দিয়ে মাধবী ছুটে গিয়েছিল সেই পথে বয়ে গেছে এক নদী। সেই নদীই আজকের নাগরী। আর মাধবীকে ধরতে গিয়ে ঐ নাগরও হয়েছিল নদী। ঐ দুই ধারার মিলিত রূপই আজকের নাগর। জীবনে যাদের সত্যিকার মিলন হয়নি তারাই আজ অতৃপ্ত আকাঙ্খার জ্বালা নিয়ে বয়ে চলেছে কুলু কুলু বেগে সুদূরের আহ্বানে।

একাহিনী মুখে মুখে চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। নিজেদের প্রিয় নদীকে গৌরবান্বিত করার জন্যই হয়তো এই লোকশ্রুতি। ঐন্দ্রজালিক অভিপ্রায়টিই কাজ করেছে এই প্রণয় কাহিনীতে।

এই নাগর নিয়ে রচিত হয়েছে বহু ছড়া, গান, গল্প, নাটক ও উপন্যাস। এই লেখকের রচিত নাগর যেখানে নদীও একটি জনপ্রিয় উপন্যাস।

(২৪) রাজা পৃথুর ঢিবি :

জলপাইগুড়ি জেলার মোহিত নগরের কাছে জোড়াদীঘিতে ছড়িয়ে আছে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। উঁচু ঢিবি দেখিয়ে লোকে বলে রাজাপৃথুর ঢিবি। এখানেই নাকি চিল পৃথুরগড়। গভীর রাতে নাকি ঐ ঢিবির চারপাশে শোনা যায় সেনাদের কুচকাওয়াজ। কাণে আসে অস্ত্রের ঝন্ ঝনাও। কোথায় যেন ওঠে শঙ্খ ঘণ্টার রোলও। গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসে কার যেন কঠোর নির্দেশ। ঐ ঢিবিকে নিয়ে শোনা যায় আরো নানা কথা।

এই লোকশ্রুতির উৎস ও অভিপ্রায় আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় রাজা পৃথুর কথা। বীর পৃথু একাধিকবার মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করে জীবদ্দশাতেই হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। কামরূপ থেকে কামতাপুর পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড রক্ষার জন্য নানাস্থানেই তিনি তৈরী করেছিলেন বহু গড় বা দুর্গ। ঐ জোড় দীঘিতেও হয়তো তেমনি কোন দুর্গ তৈরী করেছিলেন তিনি। কালক্রমে যা ধ্বংস হয়ে যায় বটে কিন্তু লোকের স্মৃতি পটে রেখে যায় গৌরবের প্রভাব। দিনে দিনে সেই গড়ের ঢিবিই নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে লোক মুখে নানা কাহিনী ছড়িয়েছে।

বীর নায়কের সঙ্গে ঐ ঢিবিকে জড়িয়ে জোড়াদীঘির মানুষেরা লাভ করতে চেয়েছে আত্মপ্রসাদ। তাইই দিনে দিনে রং লেগেছে লোকশ্রুতির গায়ে।

(২৫) পাণ্ডুয়া :

মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াকে ঘিরেও ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতি। লোকে বলে এই নগর নাকি পাণ্ডবরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন নাম হয়েছিল পাণ্ডবনগর। পাণ্ডব থেকেই হয়েছে পাণ্ডুয়া।

এখানকার সাতাইশ ঘরা দীঘিটিকে দেখিয়ে লোকে বলে ঐ দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

পাণ্ডুয়া যে অতি প্রাচীন নগরী তা এখানকার ধ্বংসাবশেষ, ভগ্নমূর্তি এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই বুঝতে পারা যায়। মুসলিম আক্রমণেই এ নগরী ধ্বংস হয়েছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে যখন সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ পাণ্ডুয়াতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন তখন পাণ্ডুয়া জেগে ওঠে নতুন করে।

পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতি যে কতোটা ইতিহাস সম্মত তা বলা কঠিন। তবে প্রাচীনকালে বেশ সমৃদ্ধ নগরীই যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে মহাভারতের যুগের নায়কদের যোগাযোগ ছিল এমন অনুমানের ভিত্তিতেই সম্ভবত পাণ্ডুয়াকে পাণ্ডবনগর হিসাবে প্রচার করে এই অঞ্চলের মানুষরা নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

(২৬) লেপচাবীর গেইবু আচক :

দার্জিলিং জেলায় লেপচাদের মধ্যে লেপচা বীর গেইবু আচককে নিয়ে প্রচলিত আছে নানাকাহিনী। 'গেইবু আচকের' অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী মুখে মুখে ফেরে লেপচাদের মধ্যে। তবে যে ঘটনা তাঁকে অমর করে রেখেছে সে ঘটনাটা হলো ভূটানীদের সঙ্গে যুদ্ধের।

লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে বহুযুগ আগে একবার ভূটানীরা লেপচাদের আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে প্রথম দিকে পরাজিত হয় লেপচারা। কিন্তু পরে বীর 'গেইবুর' নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। লেপচাদের 'ডালিং দুর্গ উদ্ধার করে পাল্টা মার শুরু করে। ভূটানীরা বিধ্বস্ত হয়। 'তামসাং ফিরে পায় লেপচারা গেইবুর অসীম বীরত্বে। ভূটানীরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ভূটানীরা গোপনে অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে 'গেইবু আচকই' লেপচাদের মূল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। অতএব চলে তাঁকে খতম করার ষড়যন্ত্র। রাতের অন্ধকারে ভূটান সেনাপতি তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে এলো লেপচাদের শিবিরে বন্ধুর বেশে। সঙ্গে আনলো প্রচুর মদ আর মাংস। সারারাত ধরে চললো হৈ হৈ নাচ গান আর মদ মাংসের ভোজ। আকণ্ঠ মদপান করে বেহুঁস হয়ে পড়লো সবাই। সেই সুযোগে ভূটানীরা তুলে নিয়ে গেল গেইবুকে। টুকরো টুক্‌রো করে গেইবুকে কেটে ফেলে দিল জঙ্গলের মধ্যে।

পরের দিন খোঁজ পড়লো গেইবুর। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলনা তাঁকে। হায় হায় রব উঠলো লেপচাদের মধ্যে।

ওদিকে গেইবুর প্রাণ কিন্তু তখনো বেরিয়ে যায়নি। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর খণ্ডিত দেহ জোড়া লাগলো। ভূটানীদের চোখে পড়ে গেল ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেনাপতি আবার নিষ্ঠুর ভাবে তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো কেটে ভাসিয়ে দিলো নদীর জলে। এবার গেইবুর সত্যিই মৃত্যু হয়। তখন ভূটানীরা তামসাং অধিকার করে নেয়।

গেইবু কিন্তু মরেও ভূটানীদের বিরক্ত করতে ছাড়েন না। তাঁর অশরীরী আত্মা আক্রমণ করে চলে ভূটানী ব্যবসায়ীদের 'তামসাং' অঞ্চলে প্রবেশের মুখে। মারাও পড়ে অনেকে। তখন ভূটানীরা গেইবুর অশরীরী আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য নানাভাবে পূজা দিতে শুরু করে। উৎসর্গ করতে থাকে মদ মাংসও।

এখনো ঐ অঞ্চলে অশরীরী আত্মার কবলে যদি কেউ পড়ে তবে বলা হয় গেইবুর আত্মাই ধরেছে তাকে। তখন মদ মাংস উৎসর্গ করলেই ভূত ছেড়ে যায়। এখনো বিশেষ একটি দিনে ওপেডং উৎসবের আগে মদ মাংস উৎসর্গ করা হয় তাঁর উদ্দেশ্যে।

লেপচাদের বিশ্বাস গেইবুর অশরীরী আত্মা আজো ঘুরে বেড়ায় ডালিং দুর্গের আশে পাশে এবং তামসাং এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। গেইবু আচককে আদর করে সবাই ডাকে। 'তামসাঙের পাখী' বলে।

তামসাঙের অধিকার নিয়ে ভূটানীদের সঙ্গে লেপচাদের যুদ্ধ এবং গেইবুর অসাধারণ নেতৃত্ব ও রণকুশলতা ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু গেইবুর দেহের খণ্ডিত অংশের জোড়া লাগার ঘটনা অলৌকিক ঘটনাই বটে। বিভিন্ন দেশের রূপ কথা বা লোককথায় এমন

ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় অবশ্য। কাটা অঙ্গ জোড়া লেগেছে দেখা যায় বহু দেশের বহুগল্পেই। আন্তর্জাতিক মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই ঘটনাকে ই—৪০ এই বিভাগে ফেলা যেতে পারে। যেখানে কাটা অঙ্গ জোড়া লাগার কথা বলা হয়েছে।

আলোচ্য লোকশ্রুতিতে আরো একটা অভিপ্রায় কাজ করেছে সেটা হলো মৃত আত্মার শত্রুর ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া। এটিও বিভিন্ন দেশের লোক কথাতে দেখা যায়। গেইবুর আত্মা লেপচাদের রক্ষায় আজো তৎপর বলেই লেপচাদের বিশ্বাস।

জাতীয় বীর বা নেতা অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য কিভাবে কালক্রমে লোকশ্রুতির মহানায়কে পরিণত হয় এবং কিভাবে সেই কাহিনীতে নানা উপাদান এসে মেশে লেপচাবীর 'গেইবু আচকের' কাহিনীই তার প্রমাণ।

ভূটানীদের সঙ্গে যুদ্ধ ও গেই বু আচকের প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অমল কুমার দাস ও স্বপন কুমার দাস মহাশয় যেকথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"The Lepchas believe that this is a true story and connected with their un written history."

—Lepchas of Darjeeling District—page-135.

(২৭) বাণেশ্বর শিব :

কুচবিহার জেলার বাণেশ্বর শিবের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা উত্তরবঙ্গে। এই শিবকে ঘিরে যে লোকশ্রুতিটি ছড়িয়ে আছে তাহলো—

বাণরাজা কঠোর তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করেন। শিব বর দিতে চাইলে বাণরাজা বলেন যে তিনি শিবকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেখনেই যেতে হবে। শিব রাজী হয়ে যান কিন্তু সর্ত করেন যে বাণরাজাকে আগে আগে যেতে হবে এবং পিছনে তাকানো চলবে না। বাণরাজা রাজী হয়ে যান শিবের সর্তে।

সর্ত মেনে বাণরাজা এগিয়ে চলেন সম্মুখের দিকে হৃষ্টচিত্তে। বনজঙ্গল-পাহাড়-নদী মাঠ পেরিয়ে মাইলের পর মাইল এগিয়েই চলেন বাণরাজা। বহুদূর যাবার পরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামেন রাজা এক নির্জন স্থানে। কৌতূহলী মন উশখুশ্ করে ওঠে। পিছনে তাকান রাজা। সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হন শিব।

বাণরাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে হায় হায় করে ওঠেন। তখন মাটিতে বসে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতে থাকেন শিবেব কাছে এবং মার্জনা চান শিবের কাছে। তখন শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলেন, 'তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করো। যুগ যুগ ধরে লোকে আমার সঙ্গে স্মরণ করবে তোমাকেও।'

তাই হবে প্রভু। তাইই হবে! বলেই বাণরাজা সেইখানেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। তারপর ঐ লিঙ্গের জন্য নির্মাণ করেন এক সুদৃশ্য মন্দিরও।

যেস্থানে বাণরাজ ঐ লিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্থানের নাম ছিল 'গের্দ সান্ডারা'। বাণরাজা প্রতিষ্ঠিত শিবের নাম হয় 'বাণেশ্বর শিব'। আর গ্রামের নাম হয়—বাণেশ্বর গ্রাম।

উৎস বিচারে বলতে হয় এই কাহিনীর প্রকৃত ইতিহাস আজও অস্পষ্ট। ঐ বাণরাজা যে কোন্ রাজা তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কোন্ সময়ে ঐ লিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাও অজানা। উনি কি কোচবিহারেরই কোন রাজা ? অথবা বাণগড়ের বাণরাজা ?

মোটিফ বিচারে বলতে হয়, কোন মন্দিরের বিগ্রহ বা লিঙ্গাদির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এমন সব নানা কাহিনী পৃথিবীর বহুদেশেই প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার সাক্ষীগোপাল, জলপাইগুড়ির জল্পেশ, তারকেশ্বরের শিব, জ্বালামুখী, বৈষ্ণোদেবী এমন কতো নাম করা যায়। সম্ভবত বাণেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এমন কাহিনী কৌশলে প্রচার করা হয়েছে বলে মনে হয়।

(২৮) লোকনাহারের লোকশ্রুতি :

আজো লোকনাহার আমাকে ডাকে। উদ্বেল করে তার নির্জন মাঠ, প্রাচীন দীঘি, বেণুবন আর সহজ সরল নরনারী। দেখতে পাই ধ্বংসাবশেষ, মহারাজ মন্দিরের সেই ছোট্ট ধবল চূড়া। ঘুরে বেড়াই তিস্তা বুড়ীর পূজোর মেলায় ইসাক অমৃত, তাপসী, সামাদ, অমল, ইমাম ও সুরেশদের সাথে। কখন যেন সামনে এসে দাঁড়ায় নব্বুই বছরের দুই বৃদ্ধা হিতোমনি আর কোফাতুন্নেষা।

মাটির ঘরের বারান্দায় বসে ওদের মুখ থেকে শুনি লোকনাহারের বিচিত্রসব কাহিনী। শুনি প্রাচীন দিনের রাজারাণীর কথা। চারশো-পাঁচশো-হাজার বছর আগেকার কথা। বলতে বলতে হিতোমনি আর কোফাতুন্নেষার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। বিস্ময়ের ঘোরে শিহরিত হয় সঙ্গীরা। ওরা বলে যায় প্রাচীন দীঘির কাহিনীও। বুড়ী কোফাতুন্নেষা বলে, 'বাবু এ পোখর তো মানষের খোঁড়া লয়! এ যে বিশ্বকম্মার খোঁড়া গো। কেউ কতি পারেনা এর পানি কতো। ডরনাগে বাবু। মাপ করেন গে।' গুণাহ্ হবে। কোফাতুন্নেষা চুপ করে যায়। হিতোমণিকে ধরে সবাই।

বুড়ী হিতোমনির মুখে তন্ময় হয়ে শুনি লোকনাহারের প্রাচীন দীঘির গভীরতার কথা। কতো মানুষ যে ডুবে গেছে ঐ দীঘির বুকে কেউ জানে না সেসব কথা। ঐ দীঘিতে জালও ফেলে না কেউ। অথচ কতো সব বড় বড় মাছ ছিল ঐ দীঘিতে। দু একজন জাল ফেলার চেষ্টা যে করেনি তা নয় কিন্তু সেই জাল টেনে নিয়ে গেছে মাছে। জলের নীচে যখ' নয় আছে নাকি 'গেরাম ঠাকুর'। তিনিই নাকি দয়া করে আগে অনেক কে থালা বাসনপত্র দিতেন। তবে শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা করলেই পাওয়া যেত এবং কাজ মিটে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হতো সেসব। একবার বুঝি কে একটা বাটি ফেরত দেয়নি সেই থেকেই আর থালা-বাসন পাওয়া যায় না।

ঐ দীঘির বুকে সিন্দুকের মাথা ভেসে উঠতো আগে। কতোজন দেখেছে সে মাথা। ঐ দীঘির নীচে পাতাল পুরীতে আছে রাজবাড়ী। সেখানেই থাকেন নাকি গেরাম ঠাকুর।

সেই সন্ধ্যায় হিতোমনি শুনিয়েছিল আরো একটা মজার কাহিনী। একদিন গভীর রাতে সাপনিকালার দাই মাকে কে যেন ডাকে, 'দাই মা, চল্মোর বাড়ীত চল্। মোর কইন্যার ছুয়া হবে রে।

দাইমা সে কথা শুনেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু পিছনে পিছনে দাই মা চলছে তো চলছেই। পথ যেন আর শেষ হয় না। এক সময় এসে দাঁড়ালো দাই মা ঐ মহারাজ পুকুরের জলের ধারে। সামনের সেই লোকটা জলে পা দিতেই জল দুভাগ হয়ে গেল। আর দেখা গেল একটা বাঁধানো রাস্তা। সেই পথ ধরে ওরা চলে গেল পাতাল পুরীতে। চারিদিকে সারি সারি নতুন নতুন বাড়ী। আলোয় আলো ময়।

লোকটা থামলো একটা ঘরের সামনে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে একটা মেয়ে। পরীর মতো সুন্দরী। প্রসব করালো দাইমা নতুন কাপড় পরে। তারপরে মাছ মাংস-মণ্ডা-মিঠাই কতো কি খাবার।

ছেলে হয়েছে তো রাজার আর আনন্দ ধরে না। দাইমার সামনে রাখলো ডালা ভর্তি সোনা-হীরেদানা-মোহর আরো কতোকি—যতখুশী নিয়ে নাও। দাইমার দুচোখ ছানাবড়া।

ওদিকে সাপ নিকালায় হৈ চৈ পড়ে গেল দাইমা কোথায় ? দাই মা কোথায় ? সাতদিন সাত রাত খোঁজ নেই দাইমার। খোঁজ থাকবে কি করে ? সে যে তখন রাজবাড়ীতে রাজ ভোগ খাচ্ছে।

আট দিনের দিন গভীর রাতে এক কোঁচড় ভর্তি সোনাহীরে নিয়ে ফিরে এলো দাইমা। কিন্তু সে শপথ করে এসেছিল যে পাতালপুরীর কথা বলবেনা কাউকে। বললেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যাবে সে।

ছমাস পর্য্যন্ত চুপ করে ছিল দাইমা। কিন্তু তার অবস্থা ফিরতে দেখে সন্দেহ হয় পাড়াপড়শীদের। কেমন করে যেন রহস্যটা ফাঁস হয়ে যায়। রাগের মাথায় কাকে নাকি পাতালপুরীর রাজা আর ধনের কথা একদিন বলে ফেলে দাইমা। আর সেই দিন রাত্রেই দেখা যায় খাটের ওপরে শুয়ে আছে দাইমা কিন্তু দেহে প্রাণ নেই তার। রক্তে ভাসছে বিছানা।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার লোকনাহারের বুকে ছড়িয়ে আছে এমন বহু কাহিনী। এই কাহিনীর উৎস ও মোটিফ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই লোকনাহারের ঐতিহাসিক পরিচিতি বিচার করে দেখা দরকার।

লোকে বলে লোনাহারের প্রাচীন রাজার নাম নাকি 'লোকন বা লক্ষ্মণ'। একোন্ লক্ষ্মণ ? লক্ষ্মণ সেন নাকি ?

এর পাশের গ্রামগুলো হলো কোদাল ধোয়া এবং ছুঁতিয়ানি ও সাপ নিকালা। লোকশ্রুতি যে ঐ দীঘি কাটার পরে যেখানে কোদাল ছোড়া হয়েছিল তার নাম হয় কোদাল ধোয়া, যেখানে ঝুড়ি ফেলা হয়েছিল তার নাম হয় ছুঁতিয়ানি আর ঐ দীঘি থেকে বিশাল সাপ বেরিয়ে যেদিকে গিয়েছিল তার নাম হয় সাপনিকালা।

একদা যে এখানে প্রাচীন রাজারা বসবাস করে গেছেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। পাতলা চওড়া ইট মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় এখানে।

বিশাল দীঘিটি সেই প্রাচীন রাজাদেরই আমলের। এখানে মা যশোদা ও কৃষ্ণের প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে যেমনটা পাওয়া গেছে বুলবুল চণ্ডীতে। পাওয়া গেছে তিস্তা ক্যানেল খোঁড়ার সময় একটা সোনার মূর্তিও। সেই সঙ্গে মাটির নীচে প্রাচীন যুগের বড় বড় জালাও। পাওয়া গেছে বড় বড় গাছের গুঁড়ি এবং কূয়োর সন্ধানও।

ইতিহাস বিচারে লোকনাহার যে অতি প্রাচীন গ্রাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে এখন দীঘির পাড়ে চলে তিস্তাবুড়ীর পূজা ও মহারাজের পূজা। প্রথম বৈশাখে ঐ সময়ে বড় মেলাও বসে।

রাজবংশী মেয়েদের মুখে তিস্তা বুড়ীর গান, বিয়ের গান, ছড়া, ধাঁধা যেমন শোনা যায় এখানে তেমনি মুসলমান মেয়েরাও নানা গল্প, গান, ধাঁধাঁ এবং ছড়াও বলে। হিন্দু মুসলমানের অপূর্ব সহাবস্থান এখানে।

লোক কথা ও লোকাহিত্যের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে লোকনাহার ও তার আশে পাশে।

প্রাচীন দীঘির গভীরতা বোঝাতে গিয়ে বা শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে যখের কথা, সিন্দুকের কথা বা থালা বাসনের কাহিনী বহু দীঘি সম্বন্ধেই ছড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রেও লোকনাহারের দীঘির শ্রেষ্ঠত্ব বা গুরুত্ব বাড়াতে গিয়েই এমন লোকশ্রুতির কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় দিনে দিনে।

দীঘি কেন্দ্রিক দ্বিতীয় কাহিনীটি কিছুটা রূপকথা ধর্মী হলেও দাই মা বাস্তব চরিত্র। সম্ভবত আগের দিনের কোন দাইমাই পাতাল পুরীর রাজবাড়ীর গল্পটা চালু করেছিল মনে হয়। পাতাল পুরী সম্বন্ধে মানুষের একটা চিরন্তন কৌতুহল আছে। সেই কৌতুহলের প্রকাশ ঘটেছে এখানে বলে মনে হয়।

তাছাড়া এই গল্পের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরন্তন-রূপকথার গল্পের সাধও মেটানো হয়েছে। শঙ্খমালা, কিরণমালারা হয়তো এখানে নেই কিন্তু রাজপুরী আছে। রাজকন্যা আছে। পাতাল পুরীর প্রাসাদ আছে। সোনা হীরে, আলো ঝলমল নগর আছে। আর কি চায়? আছে দাইমা আর হিতোমণির সাথে কোফাতুন্নেষাও যে।

(২৯) করদহের গোপালজীউ :

দক্ষিণ দিনাজ পুরের পুনর্ভবার তীরে করদহের গোপালজীউ সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতি এই যে একবার দিনাজপুরের রাজা সময় মতো রাজস্ব জমা দিতে না পারায় দিল্লীর সম্রাট তাঁকে তলব করেন। জলে পথে দুশ্চিন্তায় দিনাজপুর রাজ চলেছেন দিল্লীতে। রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে স্বয়ং গোপালজীউ তাঁকে বলেছেন, 'ওরে, আমি যে পড়ে আছি করদহে পুনর্ভবার জলে অনাদরে। ব্যবস্থা কর। আমি খুব কষ্টে আছি। আমাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।'

ঘুম ভেঙে যায় রাজার। দ্রুত সেইখানে পৌঁছান তিনি। খুঁজে পান গোপালজীউকে। সঙ্গে করে নিয়ে যান গোপালজীউকে দিল্লীতে। আর কি আশ্চর্য্য সম্রাট সেবার তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনাই করলেন তিরস্কারের পরিবর্তে।

রাজা বুঝলেন এসবই গোপালজীউ এর কৃপা। ফেরার পথে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি করদহে নির্মাণ করলেন মন্দির এবং সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন গোপালজীউ এর বিগ্রহ। সেই থেকেই নিত্যগোপাল জীউ পূজিত হয়ে আসছেন ঐ মন্দিরে।

এই লোকশ্রুতির উৎস ও অভিপ্রায় আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় দিনাজপুরের রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তবে ঐ রাজার নাম জানা যায় না। ঐ মন্দিরটিও দিনাজপুর

রাজদেরই প্রতিষ্ঠিত। মোগল যুগের কোন এক সময়েই করদহের গোপালজীউ এর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিনাজপুরের কোন এক রাজার দ্বারা।

এই মন্দির এবং বিগ্রহ সংক্রান্ত যে স্বপ্ন কাহিনী প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে বলা যায় যে বাংলা তথা ভারত ও পৃথিবীর বহু মন্দির এবং বিগ্রহ সম্বন্ধেই এমন স্বপ্নদর্শনের কাহিনী শোনা যায়। এইসব কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে ঐ সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই করা হয়ে থাকে আসলে। দেবতা যে জাগ্রত তা বোঝাবার জন্যই এইসব কাহিনীর প্রচার। গোপালজীউএর বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনীর পিছনে ঐ একই অভিপ্রায় কাজ করেছে বলে মনে হয়।

(৩০) ধাওয়াইল গ্রামের কংস পূজা :

মালদহ থেকে বালুরঘাট যাবার পাকা সড়ক ধরে এগিয়ে সরাণ পাড়ায় নেমে কিছুদূর গেলেই পাওয়া যাবে ধাওয়াইল গ্রাম। এখানে আছে কুতুব শাহপীরের আস্তানা এবং শিব ও দুর্গার মূর্তি। আর আছে কংসের বেদী। ঐ বেদীতে মুন্ডুহীন হাত ভাঙা যে পুরুষ মূর্তিটি আছে সেটিই কংসের মূর্তি বলে প্রচারিত।

প্রতি বছর মাঘমাসের চতুর্দশী বা পূর্ণিমার দিন ঐখানে অনুষ্ঠিত হয় 'কংস ব্রত পূজা। ত্রয়োদশীর দিন পাশের দীঘিতে ডুবিয়ে রাখা একটি বড়মাপের কাঠ তুলে এনে তেল সিঁদুর মাখিয়ে গ্রাম ঘুরানো হয়। চতুর্দশীর দিন হয় কংসব্রত পূজা। পূর্ণিমার দিন হয় আগুন উৎসব।

প্রচলিত লোকশ্রুতি বলে এখানেই নাকি শ্রীকৃষ্ণ মথুরাধিপতি কংসকে বধ করেছিলেন। ঐ ঘটনাকে স্মরণে রেখেই প্রতিবছর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই কাহিনীর উৎস ও অভিপ্রায় আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই যে কথা মনে আসে তাহলো কংসকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজসভা প্রাঙ্গনেই বধ করেছিলেন বলে সবাই জানে। তাহলে ইনি নিশ্চয়ই অন্য কোন কংস নামধারী রাজা। তাহলে কে সেই রাজা?

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে যে বাঙালী সামন্ত রাজ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠে ইলিয়াস শাহের বংশধরকে হত্যা করে পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বসেন তাকে বলেছেন 'কানস্' বা কংস। এই 'কংস' সম্ভবত রাজাগণেশই কেন না পারসিক ভাষায় হাতে লেখা বইয়ে 'গাফের' পরিবর্তে লেখা হয় 'কাফ'।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘ অধ্যায়ে রাজা গণেশই একমাত্র হিন্দু রাজা যিনি নির্যাতিত হিন্দু জনগণের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ত্রাণ কর্তারূপে। আর তাইই জনগণ তাঁকে বসিয়েছিলেন দেবতার আসনে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় নায়ক। ১৪০৫ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ প্রায় ৬০০ বছর আগে তিনি রাজত্ব করে গেছেন পাণ্ডুয়ায়।

লোক ঐতিহ্যে বহুল প্রচারের ফলে ১০০ বছরের মধ্যেই কোন ঘটনা বা কাহিনী কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রাজা গণেশের ক্ষেত্রেও তাইই হয়েছে। ঐ পূজা যখন শুরু হয়েছে সেও আজ প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা অর্থাৎ গণেশ তখন

জাতীয় বীর বা দেবতার পর্য্যায়ে। কিন্তু যেহেতু তখনো বাংলায় মুসলিম শাসন চলছে তাইই গণেশকে কংসের আড়ালে আত্মগোপন করতে হয়েছে বলেই মনে হয়।

(৩১) দুর্গাপুরের স্বামী নাথের মন্দির :

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কাছেই দুর্গাপুর। এখানেই রয়েছে বিখ্যাত স্বামীনাথের মন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং বিগ্রহের নামকরণ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হলো এইরকম—দুর্গাপুরের বর্তমান জমিদার চৌধুরীদের কোন এক পূর্বপুরুষ একরাত্রে নাকি স্বপ্নে দেখেন যে কে যেন তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওরে আমি যে এখানে এই শর্ষেক্ষেতের নীচে পড়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠছি। আমাকে তুলে নিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকর তোদের মঙ্গল হবে। আর আমার নাম দিবি স্বামী নাথ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় চৌধুরী মশায়ের। সকালে স্বপ্নে দেখা শর্ষেক্ষেতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখেন কষ্টি পাথরের এক সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি শুয়ে আছে মাটিতে। সেখানেই তিনি গড়ে তোলেন এক বিষ্ণু মন্দির। প্রতিষ্ঠা করেন ঐ বিষ্ণু বিগ্রহ এবং নাম দেন স্বামীনাথ।

মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমাতেই দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে সেই থেকে প্রতি বছর ঐ বৈশাখী পূর্ণিমাতেই ধুম ধাম করে পূজা হয়ে আসছে আজো। ঐ পূজার সময় মেলাও বসছে বহুকাল ধরে।

এর পরেই ঐ চৌধুরীদের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। 'চূড়ামন' থেকে দুর্গাপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন চৌধুরীরা।

এই কাহিনীর পিছনেও সম্ভবত দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারই মূল লক্ষ্য বলে মনে হয়। তবে সুদৃশ্য বিষ্ণু মূর্তিটি পাল আমলেরই বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে চৌধুরীদের কোন পূর্ব পুরুষ ঐ স্থানে ঐ মূর্তিটি পাওয়ার পরেই সম্ভবত ঐ কাহিনীর প্রচার করা হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার উত্তর দিনাজপুরের ঐসব অঞ্চলে এমন বহু পূর্ণাঙ্গ ও ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গেছে এবং এখনো হয়তো মাটির নীচে পড়ে আছে এমন বহু মূর্তি। যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে ঐ সব অঞ্চলে তাদের অতি সামান্য সংখ্যক মূর্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। বহু মূর্তি বিদেশে পাচার হয়েছে বা এখনও পাচার হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে এমন অসংখ্য লোকশ্রুতির কাহিনী ছড়িয়ে আছে। উৎসাহী এবং পরিশ্রমী গবেষকরা যদি সেগুলো সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে আমাদের লোক সাহিত্যের ভাণ্ডার যে সমৃদ্ধ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নৃত্য : উৎস ও অভিপ্রায়

(১) নৃত্যের উৎস ও অভিপ্রায় :

মানব ইতিহাসের অতি শৈশবকাল থেকেই নৃত্যের প্রচলন হয়েছিল গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে। শিকার লাভ করার আনন্দে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে বা যুদ্ধ জয়ের আনন্দে একদিন তারা মেতে উঠেছিল নৃত্যের অঙ্গনে। আবার মনের কোন বাসনা পূর্ণ হবার পরেও তারা নৃত্যের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করেছিল তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস। আদিম মানুষদের সেই সব হাত পা নাড়া বা উদ্দাম প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে হয়তো যথাযথ ছন্দ তাল বা লয় ছিলনা। ছিল না যথাযথ বিজ্ঞান সম্মত মুদ্রার প্রকাশও। নৃত্যের কোন ব্যাকরণও তাদের অজানাই ছিল। কিন্তু নৃত্যের আদি উৎস ঐসব আদিম উচ্ছ্বাস ময় ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিহিত ছিল।

আবার সূর্য্য, নদী, পাহাড়, আকাশ, চন্দ্র, মেঘ, গ্রহ, নক্ষত্র, বাতাস, গাছ পালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে আদিম মানুষরা যখন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছে তখন ঐসব শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করেছে। সঙ্গীত, নৃত্য এবং পূজাচারের মাধ্যমে ঐসব শক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে নানাভাবে। বলা যায় প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে যেসব ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিল আদিম মানুষ নৃত্য তাদেরই একটি।

প্রাচীন সভ্যতার ধারা বেয়ে মানুষের যেসব সুকুমার কলা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অপ্রতিহত ভাবে টিঁকে রয়েছে নৃত্য তাদেরই একটি। কিন্তু নৃত্যের এই জয়যাত্রার মূলে শুধু যে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ও বিভিন্ন উৎসবের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ হিসাবে থাকাটাই মূল কারণ তা অবশ্য নয় এর পিছনে সৌন্দর্য্যবোধ এবং শারীরিক ব্যায়ামের বিষয়টিও নিহিত আছে। তাছাড়া ভাব বা আবেগ মোক্ষণও ঘটে থাকে এই নৃত্যের মাধ্যমে।

যুগ যুগ ধরে একক, দ্বৈত বা দলগতভাবে চলে এসেছে এই নৃত্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আলো, সঙ্গীত, বাজনা। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এসেছে কতো না বৈচিত্র্য। পোষাকেও আনা হয়েছে কতো না নতুনত্ব। এসেছে গতির মূর্চ্ছনাও।

(২) শ্রেণীবিভাগ (শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য) :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নৃত্যকে দুটি বিভাগে ফেলা হয়ে থাকে। একটি হলো শাস্ত্রীয় অন্যটি হলো লোকনৃত্য।

সুনির্দিষ্ট রীতিকে অনুসরণ করে যে নৃত্য করা হয়ে থাকে তাই‍ই শাস্ত্রীয় নৃত্য। সমাজের কোন বিশেষ অংশের মধ্যেই এই ধরনের অনমনীয় নৃত্যের ধারাটি অনুসৃত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মের বেড়াজালে বন্দী না হয়ে যে নৃত্যের ধারা প্রচলিত থাকে তাইই লোকনৃত্য। সাধারণত লৌকিক উৎসব, পালা পার্বণ ও বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানেই এই লোকনৃত্যের স্ফূর্তি। এই লোকনৃত্যের কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। এর ধারা বহমান যুগে যুগে। সকল শাস্ত্রীয় নৃত্যই কিন্তু কোন না কোন ভাবে লোক নৃত্যের কাছে ঋণী।

আমাদের দেশের প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে লোক নৃত্যের বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে বেশী করে তুলনায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব কম।

(৩) উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য :

বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের নৃত্যশিল্পের ঐতিহ্যও অতিপ্রাচীন। গৌড় পুণ্ড্রবর্ধন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে যেসব নৃত্যরত মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তা খুবই সামান্য। মধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। বিধ্বস্ত হয়েছে ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গের যাবতীয় মঠ, মন্দির, প্রাসাদ এবং সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়েছে সঙ্গীত, নৃত্য এবং অঙ্কন শিল্প, দারু শিল্প, মূর্তি শিল্প প্রভৃতিও।

কিন্তু সেই কালাপাহাড়ী ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যেও গ্রামের নিভৃত পরিবেশে লোকনৃত্যের ধারাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অদম্য প্রাণশক্তির জোরে লোকনৃত্যের ধারাটি কিন্তু উত্তরবঙ্গের গ্রামীন পরিবেশে অব্যাহতই থেকে গেছে যুগ যুগ ধরে।

উত্তরবঙ্গে নানা ধরনের লোকনৃত্যের প্রচলন আছে। ঐসব নৃত্যের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে তেমনিই পাওয়া যায় অফুরন্ত আনন্দের সন্ধানও। একদিকে যেমন সমবেত গোষ্ঠী নৃত্য আছে এ অঞ্চলে তেমনিই আবার আছে একক, দ্বৈত বা তিনচার জনের নৃত্যও। আছে ধর্মীয় আচার মূলক নৃত্য, উৎসব অনুষ্ঠানে আছে মুখোস নৃত্য, স্ত্রী নৃত্য ও স্ত্রী পুরুষের সমবেত নৃত্যও।

এখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রধান প্রধান কয়েকটি লোকনৃত্যের আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) গম্ভীরা নৃত্য :

শস্য কামনা এবং শস্য ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে মানব সমাজে বহু যুগ ধরে নৃত্যগীত যুক্ত উৎসব অনুষ্ঠান চলে আসছে। গম্ভীরা নৃত্যও সেই ধারারই একটি বিশিষ্টরূপ। মালদহের গম্ভীরার নৃত্য আসলে ধর্মীয় আচার মূলক নৃত্য এবং এটি মুখোস নৃত্যও বটে। আগে মুখোস তৈরী হতো নিম কাঠ বা ডুমুর কাঠ দিয়ে। বর্তমানে শোলা, মাটি বা কাগজের মুখোস পরেও নাচে অংশ গ্রহনকারীরা। তবে নাচ শুরু করার আগে পূজারীর কাছ থেকে মুখোস গুলোকে শুদ্ধ করে নেবার প্রথা প্রচলিত আছে। দেবদেবীর মুখোস পরার নিয়ম আছে। তেল না মেখে হবিষান্ন খেয়ে পবিত্র মনে পরিস্কার পোষাক পরে তবেই ঐ সব মুখোস পরে নৃত্য করতে হয় নইলে মৃত্যু পর্যান্ত ঘটতে পারে বলে প্রচলিত বিশ্বাস।

গম্ভীরার মুখোস নৃত্যকে আবার বিষয়বস্তু অনুসারে পৌরাণিক, লোকায়ত, পশুপাখী সম্পর্কিত, সামাজিক ও অন্যান্য ভাগে ভাগ রা হয়ে থাকে।

গম্ভীরার নৃত্যে বিভিন্ন ধরনের বিষয় বস্তুর সমাবেশ ঘটায় বৈচিত্র্যও এসেছে যথেষ্ট। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নৃত্যের মাধ্যমে দেবতার কৃপা প্রার্থনা করা। এই প্রসঙ্গে গম্ভীরা বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ মহাশয় যথার্থই বলেছেন—"গম্ভীরার নৃত্যে একদিকে যেমন আদিম সমাজের প্রভাব লক্ষ্যণীয় তেমনি লোক সমাজের পূর্ণ প্রভাবও এখানে দেখা যায়। পূজা উপলক্ষ্যে গম্ভীরা মুখোস নৃত্য তৈরী হয়েছিল লোক সমাজে এখন তাকে পৃথকভাবে বিচার করলেও পূজা অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত তার চরিত্র চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বাণ, কালী, নারসিংহী ইত্যাদি নৃত্যে দৈহিক নির্য্যাতনের মধ্যে দেবদেবীর প্রসাদ পুষ্ট হওয়ার ঐকান্তিকতা বর্তমান।

—লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা ৪৪ পৃষ্ঠা।

কয়েকটি গম্ভীরার নৃত্যের কথা বলা হচ্ছে এখানে।

(ক) বাণ নৃত্য : গম্ভীরার সকল নৃত্যেই ঢাক এবং কাঁসীই মূল বাদ্য যন্ত্র। ঢাকীদের বাজনার তালে তালে চলে নাচ। গম্ভীরার বাণনৃত্যে বাণমন্ত্র উচ্চারণ করে নর্তকদের কোমরে বাণ বেঁধে দিয়ে ঐ বাণের ফলায় সরষের তেল ভেজানো ন্যাকড়া বেঁধে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকের বাজনার তালে তালে শুরু হয় নাচ। এটি দলগত নাচ।

(খ) কালী নৃত্য : কালীর সাজে সজ্জিত হয়ে মুখোস পরে নাচে নর্তক ঢাকের তালে তালে। এটি একক নৃত্য।

(গ) নারসিংহী নৃত্য : শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে নানাভাবে চলে নৃত্যটি। এই মুখোসটিই সবচেয়ে বড় মুখোস। এটিও একক নৃত্য।

(ঘ) পৈরী নৃত্য : পিঠের দুপাশে তূলো দিয়ে ডানা বা পাখী তৈরী করে পরী সেজে চলে এই নাচ। এককভাবে কখনো বা দ্বৈতভাবেও হয়ে থাকে।

(ঙ) ধাপা বা মাছ ধরা নৃত্য : এটি দুজনে নাচে। একজন পলো নিয়ে অল্প জলে মাছ ধরার অভিনয় করে অন্যজন খালুই নিয়ে পিছনে পিছনে যায় মাছ রাখার জন্য। এ নাচে মুখোস লাগে না। অঙ্গভঙ্গীই মুখ্য।

(চ) ভাল্লুক নৃত্য : কাল রঙের শণ বা পাটের চুল দিয়ে সারা দেহ ঢেকে ভাল্লুকের মতো নাচে নর্তক। মুখোস থাকে। এটি একক নৃত্য।

(ছ) বকনৃত্য : সাদা কাপড়ে মোড়া পলোর মধ্যে বসে একটা হাত পলোর ওপরে বের করে খাল বিলে মাছ ধরার অভিনয় করে নর্তক।

(জ) গৃধিনী বিশাল : এটি দলগত নাচ। নর্তকরা ডানা লাগিয়ে শকুন সেজে শ্মশানে মৃতদেহ খেতে থাকে।

(ঝ) রাখাল ও মোষ : এটি দ্বৈত নাচ। একজন মোষ সাজে অন্যজন রাখাল। মোষের মুখোস থাকে। রাখাল লাঠি হাতে মোষকে বাগে আনার চেষ্টা করে।

(ঞ) ঘোড়া নৃত্য : মুখোস পরা ঘোড়ার পিঠে থাকে সোয়ার এবং সহিস দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায়। বেশ মজা হয় এই নাচে।

(ট) বুড়ো বুড়ী : দুজন বুড়ো বুড়ী সেজে নানা ঢং করে নাচে ও হাত পা নেড়ে লোক হাসায়। এই নাচটিও বেশ মজার।

গম্ভীরার অন্তর্গত সব নাচই যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় এবং চিত্তাকর্ষকও বটে। তাইই যুগ যুগ ধরে এখনো চলে আসছে এই নাচ। একসময় পৌরাণিক বিষয়বস্তু এই নাচের প্রধান অবলম্বন থাকলে ও কালক্রমে এর সঙ্গে বহু লোকায়ত উপাদান যুক্ত হওয়ায় এই সব নৃত্যের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং এদের জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান হয়েছে।

(২) মুখা খেইল :

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশে একধরনের মুখোস নৃত্য প্রচলিত আছে ঐ নৃত্যকে বলা হয় 'মুখা খেইল' অর্থাৎ মুখোসের খেলা। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সাধারণ মানুষ, পশুপাখীর মুখোস পরে চলে এই নাচ। এই নাচ একক, দ্বৈত বা দলগতভাবে হয়ে থাকে। বিশেষ কোন কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হয় এই নাচে।

মুখা খেইল মূলত প্রমোদ মূলক নৃত্য। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বহুক্ষেত্রে মোড়ল বা নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশে শুরু হয়ে যায় এই নাচ।

কখনো কখনো গান এবং সংলাপও যুক্ত হয়ে থাকে এ নাচে। তখন ফুটে ওঠে নৃত্য নাট্যের বৈশিষ্ট্য। মূকাভিনয়ের মাধ্যমে নৃত্যের ছন্দে ও তালে তালে কাহিনীর প্রকাশ হতে থাকে ধীরে ধীরে। হয়তো কোন ব্যক্তি বনে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছে তার আর্তনাদে ছুটে এলো গ্রাম বাসী। শুরু হলো বাঘে মানুষে লড়াই। কিংবা কোন পরিচিত ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনেও হতে পারে এই নাচ। আবার রূপকথার কাহিনী বা কোন হাস্যরসাত্মক কাহিনী অবলম্বনেও হতে পারে এই নাচ।

এক বা একাধিক দল থাকে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলে নাচ। যথেষ্ট আনন্দ পায় দর্শক-বৃন্দ। তবে বহুক্ষেত্রেই সবকিছু নিখুঁত হয় না কেননা বিনা প্রস্তুতিতেই আসরে নামতে হয় অনেক সময়।

উপযুক্ত প্রচার এবং যথাযথ নির্দেশনা পেলে 'মুখা খেইল' যে 'ছৌ' এবং গম্ভীরার মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারে একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

(৩) ধাই চণ্ডী নৃত্য :

কুচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন অংশে এই নৃত্যটি প্রচলিত আছে। এটি ধর্মীয় নৃত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। দেবী চণ্ডীর উগ্ররূপ ফুটে ওঠে এই নৃত্যে। দেবী চণ্ডী যেন ক্ষুধায় কাতর হয়ে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যতা। এলো মেলো পদক্ষেপ পড়ে নর্তকের। জোরে জোরে ঢাক বাজে। উদ্দাম হয় নৃত্যের গতি। একই সঙ্গে বীর ও রৌদ্ররসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই নৃত্যে। নৃত্য হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়।

এটি একক নৃত্য। অনেকে বলে এই নৃত্য করার সময় নাকি দেবীর ভর হয় নর্তকের ওপরে। আর সেই জন্যই এত জীবন্ত হয়ে ওঠে নৃত্য।

(৪) মশান কালীর নাচ :

উত্তর দিনাজ পুরের 'বৈরহাট্টা' ও তার আশেপাশে মশান কালীর পূজো উপলক্ষ্যে এক ধরনের বীর রসাত্মক নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই নাচকে 'যুদ্ধ নৃত্য' হিসাবে বিচার করাই ভাল। মুখোস পরে ঢাল তলোয়ার হাতে দুপক্ষের যুদ্ধ চলে ঢাকের বাজনার তালে তালে। বাজনার তালে তালে উদ্দাম হয় নৃত্যের গতি। দুই পক্ষ যখন এগিয়ে যায় পরস্পরের দিকে হাতিয়ার তুলে তখন সত্যিই রোমহর্ষক হয়ে ওঠে পরিবেশ।

এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির লড়াইকেই তুলে ধরা হয়ে থাকে।

আবার অনেকে মনে করেন ধনপতি সদাগরের কাহিনীর দেবীচণ্ডীর বাহিনীর সঙ্গে সিংহলী বাহিনীর যুদ্ধেরই প্রতীক এই যুদ্ধ নৃত্যটি।

(৫) বাউল নাচ :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু বাউলের আখড়া বা আশ্রম আছে। ঐ সব আখড়ায় যেমন তত্ত্বালোচনা চলে তেমনি একতারা বাজিয়ে চলে নাচ গানও। একটা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে একতারা বাজিয়ে চলে এই নাচ ও গান। চলে মনের মানুষের সন্ধান। একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে এই বাউল নৃত্যে। কেমন একটা আত্মভোলা ভাব ফুটে ওঠে বাউলের চোখেমুখে। মন উদাস হয়ে যায় বাউলের নাচে ও গানে। অন্ধকারের মধ্যে সুরের আলো জ্বালিয়ে দেয় যেন বাউল।

(৬) ব্রত ও পূজাপার্বণের নৃত্য :

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কোচ ও পোলিয়া সম্প্রদায়ের মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্রত ও পূজা পার্বণাদি করে থাকে সেই উপলক্ষ্যে তারা নাচ গানও করে থাকে। ঐসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যেসব নৃত্যানুষ্ঠান তারা করে তা একান্তই সহজ সরল। প্রাণের আবেগ এবং ভক্তিভাবই মূল কথা। কোন শিক্ষিত পটুত্ব বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই ঐসব নাচে। এই ধরনের ভক্তি ও প্রাণের আবেগ আশ্রিত নৃত্য গুলোকে আমরা ব্রত ও পূজা পার্বণের নৃত্য হিসাবে ধরতে পারি। এসব নৃত্য একান্তই মেয়েদের নৃত্য।

এই ধরনের নৃত্য গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো (১) তিস্তাবুড়ীর নাচ (২) কার্তিক পূজার নাচ, (৩) ষাইটাল পূজার নাচ (৪) ভাঁজো পূজার নাচ।

(৭) প্রমোদ মূলক নৃত্য :

নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্যই বেশ কিছু ধরনের লোক নৃত্যের প্রচলন আছে উত্তর বঙ্গে। এগুলিকে বলা যায় প্রমোদমূলক নৃত্য। এইসব নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (ক) সঙ নৃত্য (খ) রুমাল নৃত্য প্রভৃতি।

(ক) সঙ নৃত্য : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নানা ধরনের সঙ বের হয়। কখনো বা দেবদেবীর সাজে কখনো বা রাজা-রাণী ও পশুপাখীর সাজে সেজে

সঙেরা অঙ্গভঙ্গী সহকারে উৎসবাঙ্গনে নৃত্য করে। এইসব নৃত্যের ছন্দ, তাল, লয় বা মুদ্রা বড় কতা নয়। বড় কথা হলো আনন্দদানের দিকটা। সঙ সাজা চরিত্রদের নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গীতে দর্শকরা লাভ করে প্রভূত আনন্দ। লোককে আনন্দ দেওয়াই এই ধরনের নৃত্যের মূল লক্ষ্য।

(খ) রুমালনৃত্য : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা জলসাদিতে কখনো কখনো বাইজীর সাজে সেজে রুমাল নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে চটুল ভঙ্গীতে যে নাচ দেখানো হয় তাইই রুমাল নৃত্য বলে পরিচিত। নর্তক বা নর্তকীর পায়ে ঝুমুর থাকে। বাদ্রযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। একক বা দ্বৈত ভাবেও এই রুমাল নাচ চলে। হাল্কা রসের গানও গাওয়া হয়। শৃঙ্গার রসের উদ্রেক করাই এই নাচের মূল লক্ষ্য। রুমালকে কেন্দ্র করেই এই নাচ বলে এই নাচকে বলা হয় রুমাল নৃত্য।

(৮) আদিবাসী নৃত্য :

(ক) সাঁওতাল ওঁরাও নৃত্য : উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের যেসব বিভিন্ন ধরনের নাচ প্রচলিত আছে সে গুলো হলো (ক) ইঁদ পরবের নাচ, বা ছাতা পরবের নাচ (খ) বাঁধনা বা সোহরাই পরবের নাচ (গ) সহরুল বা বাহা পরবের নাচ (ঘ) করম পরবের নাচ (ঙ) আষাড়ী ও অন্যান্য পরবের নাচ।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতিরা উৎসব পাগল। নাচ গান এদের প্রাণ। দ্রিমি দ্রিমি মাদলের বোলে, সঙ্গীতের মূর্ছনায় জমে ওঠে এদের সমবেত নাচ। মাদল, বাঁশী, ঢাম্‌সা প্রভৃতি এদের বাদ্য যন্ত্র। এদের সকল নৃত্যই যৌথ নৃত্য। কোমর জড়িয়ে ধরে সারিবদ্ধ ভাবে চলে এদের যৌথ নাচ।

(খ) রাভাদের নৃত্য--

(১) চরখেলাইঙে : উত্তরবঙ্গের আলিপুর দুয়ার এবং তুফানগঞ্জের রাভাদের মধ্যেও নানা ধরনের নৃত্যের প্রচলন আছে। ঐ সব নৃত্যের মধ্যে কৃষি ও যুদ্ধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাভাদের একটি উল্লেখ যোগ্য নৃত্য হলো **'চর খেলাইঙে'** নাচ। এটি মুখোস নৃত্য। দুজনে মুখোস পরে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নাচে। দীর্ঘ নলের বাঁশীর সুর ও নৃত্যের ছন্দ পরিবেশকে করে তোলে ছন্দিল ও মাদকতা ময়। চলে বিলম্বিত লয়ে গান—'কালাই মুই, জরিপুর মুই শরেন.......সাধারণত, কালী পূজোর সময় এই নাচটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(২) কাতাঙ্গে : রাভাদের আরেকটি বিশিষ্ট নাচ হলো এই 'কাতাঙ্গে' নাচ। এটি অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। এই নাচের উদ্দেশ্য হলো অপদেবতার বিতাড়ন। রোগ বা মহামারী দেখা দিলে দেবী 'আমায় জু' কে তুষ্ট করার জন্যে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। দেবী তুষ্ট হলেই অপদেবতাদের বিতাড়ন করেন। এই নাচে ১৬ জন লোক অংশ গ্রহন করে। ৬ জন বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

রীতিমতো সাড়া পড়ে যায় এই নাচের সময়ে।

(৯) লেপচা নৃত্য :

দার্জিলিং জেলার লেপচারাও খুবই আমোদপ্রিয় জাতি। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, ফসল ঘরে তোলা প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যেই এরা দল বেঁধে নাচে গানে মেতে ওঠে। এদের নৃত্যগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) প্রাকৃতিক নৃত্য (২) কৃষি নৃত্য (৩) যুদ্ধ নৃত্য (৪) ঐতিহাসিক নৃত্য (৫) অতিন্দ্রিয় রহস্যময় নৃত্য (৬) পুরাতত্ব বিষয়ক নৃত্য বা কিংবদন্তীর কাহিনী ভিত্তিক নৃত্য। উৎসব অনুষ্ঠানে একক, দ্বৈত ও দলগত ভাবে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে এইসব নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

(১০) অন্যান্য লোকনৃত্য :

উত্তরবঙ্গে এইসব প্রধান প্রধান নৃত্যগুলো ছাড়াও বিভিন্ন লোকনাট্যের আসরেও একক, বা দ্বৈত নাচের ব্যবস্থা থাকে। ঐসব নৃত্যের মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং আনন্দের খোরাক থাকে। বলা বাহুল্য এসবই লোক নৃত্যেরই অংশ। গান এবং অভিনয়ের পাশে নাচ হলো দর্শকদের বাড়তি পাওনা।

তবে এইগুলো ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো লোকনৃত্য আছে। অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা যদি সেগুলোর সন্ধান করে দেশ বাসীকে জানান তবে
ভাজন হবেন তাঁরা এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

লোকশিল্প

১. লোকশিল্প

(ক) লোক শিল্প ও তার পরিধি : লোক সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো লোকশিল্প। ব্যাপকতর বিষয়বস্তু নিয়েই বিস্তৃত এই লোক শিল্পের পরিধি। পৃথিবীর দেশে দেশে গ্রামে গঞ্জে নীরবে কাজ করে চলেছেন লক্ষ লক্ষ লোক শিল্পীর দল। যুগ যুগ ধরে লোক শিল্পীরা কতো না বিচিত্র শিল্প সামগ্রী তৈরী করেছেন ও এখনো করে চলেছেন দেশে দেশে তার হিসাব রাখা ভার।

আদিমতম লোকশিল্প সৃষ্টির মূলে কাজ করেছিল মূলত দুটি উদ্দেশ্য (১) এক দিকে ছিল পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ (২) অন্যদিকে ছিল অন্তরের নান্দনিক বোধ বা উপলব্ধির বিকাশ সাধন। কিন্তু ঐসব লোকশিল্প সর্বদাই যে একক প্রচেষ্টাতেই হয়েছিল বা এখনো হয় তা কিন্তু নয়। ধাতু, মাটি, পাথর, কাঠ বা পাতা যে কোন উপাদানের সাহায্যেই লোকশিল্প তৈরী হোক না কেন তার পিছনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরো সহযোগিতা থাকে। তাই লোকশিল্পকে শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে না দেখে যৌথ প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে বিচার করে দেখাই ভাল।

(খ) বাংলার লোকশিল্প : বিভিন্ন ধাতু শিল্প থেকে শুরু করে মাটি, কাঠ, পাতা, পাথর ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পের ঐতিহ্য আমাদের দেশের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য। বাণগড়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতু গড়, গৌড়, মহাস্থান গড়, ও পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেসব পোড়া মাটির পাত্র, খেলনা, প্রস্তর মূর্তি, ধাতব পাত্র ও অন্যান্য যেসব শিল্পকর্মের নমুনা, কাঠের কাজ, মন্দির ও প্রাসাদ-ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয়েছে তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লোকশিল্পের ঐতিহ্য এদেশে কতো প্রাচীন।

প্রাগার্য যুগ থেকেই আমাদের দেশে নানা ধরনের লোকশিল্প গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। আধুনিক যন্ত্র শিল্পের তীব্র প্রতি যোগিতার মুখেও বহু লোকশিল্প যে টিঁকে আছে এদেশে তার থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সব লোকশিল্পের জনপ্রিয়তা এবং প্রাণ শক্তির। ঐ সব শিল্পের গুণগত মান বাড়াতে পারলে এবং বাজার তৈরী করতে পারলে হয়তো টিঁকে থাকবে আরো বহু বহুকাল!

(গ) লোকশিল্পের উৎস ও অভিপ্রায় : বিভিন্ন লোকশিল্পের উৎস আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে ঐসব শিল্প কর্মের পিছনে এমন বহু বিশ্বাস, সংস্কার, অভ্যাস, প্রথা, লোকগাথা, ব্রতকথা, আচার প্রভৃতি লুকিয়ে আছে যেগুলো আসলে যাদুধর্মী। যেমন বিভিন্ন ধরনের আলপনা ও চিত্রন কর্ম, পুতুল, মূর্তি, পশুপাখী ও অনেক বস্তুর পরিকল্পনার পিছনেই অতীত দিনের যাদুধর্ম কাজ করেছে বলে মনে হয়।

কাঁথার নক্সা, ব্রতাদির আলপনা, পটচিত্র, নবান্নের পরে ধানের ছড়া বা কূলো দিয়ে ঘর সাজানো, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা, মঙ্গল ঘট স্থাপন প্রভৃতি শিল্প কর্মের মধ্যে কল্যাণ সূচক ধারণা কাজ করে থাকে।

আবার স্বস্তিকচিহ্ন, পদ্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা বা ফুল প্রভৃতি আঁকার মধ্য দিয়ে নারী হৃদয়ের যেসব অনুভূতি কাজ করে থাকে সেগুলোও ভাববার।

লোকশিল্পের শৈল্পিক মূল্য এবং তাদের অভিপ্রায় নিয়ে নানা সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতো সমালোচনাই উঠুকনা কেন লোকশিল্পের কাল শেষ হয়ে যায়নি আজো। যতোদিন গ্রাম গঞ্জের মানুষ লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহী থাকবে, যতদিন লোকশিল্প মানুষের প্রাত্যহিক এবং নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবে ততদিন টিঁকে থাকবে লোকশিল্প।

(২) উত্তরবঙ্গের লোক শিল্প :

সাধারণত উপাদানের সহজ লভ্যতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্যই বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ ধরনের লোকশিল্প বিকশিত হয়ে ওঠে দেখা যায়। বহু নতুন নতুন লোকশিল্প যেমন গড়ে ওঠে তেমনিই নানা কারণে লুপ্তও হয়ে যায় বহু লোকশিল্প।

আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধার জন্য উত্তরবঙ্গে যেসব লোকশিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলোর মধ্যে মাটি, কাঠ, বেত ও বাঁশের কাজ, কাগজের কাজ, পশমের কাজ, সূতি বস্ত্র, শঙ্খ শিল্প, সূচীশিল্প, গৃহনির্মাণ শিল্প, দড়ি ও তারের কাজ, পাতার কাজ, ধাতুশিল্প, শোলার কাজ, আসন, আলপনা, চিত্রন, অঙ্কন, চর্মশিল্প, শিঙ ও হাড়ের কাজ, মূর্তি ও মুখোস, পাটের কাজ, বীচির কাজ, মালা তৈরী প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান কয়েকটি লোকশিল্পের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) শোলা শিল্প : উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শোলা শিল্পের। বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের মালাকারগণও শোলা দিয়ে টোপর, মালা, ফুল, মুকুট, প্রতিমার সাজ, চাঁদমালা, টুপি, গহনা ও মূর্তি প্রভৃতি তৈরী করে থাকেন। এছাড়া শোলার মুখোস এবং নানা ধরনের পুতুল ও খেলনাগুলোও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। উৎসবে, পূজা পার্বণে, বিয়ে-তে ঐ সব বস্তুর যথেষ্ট চাহিদা আছে। বর্তমানে শোলা শিল্পে জরি, পুঁতি ও চুম্‌কি ব্যবহার করে শোলা শিল্পে বৈচিত্র্যও আনা হচ্ছে। ফলে চাহিদাও বাড়ছে।

তবে দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মালাকার সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাতেই উন্নত হয়েছে এই শোলা শিল্প।

(খ) মৃৎ শিল্প : মাটিকে কেন্দ্র করেই একদা গড়ে উঠেছিল মানুষের আদিম লোক শিল্প। প্রথমে মানুষ নিত্য প্রয়োজনের তাগিদেই পাত্রাদি তৈরী করেছিল। পরে হাঁড়ী, কলসী, জালা, টালি, ইট, গেলাস, সরা, মূর্তি, খেলনা প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল ধীরে ধীরে।

উত্তরবঙ্গে মাটির বিভিন্ন তৈজস পত্রের সঙ্গে নানা ধরনের পুতুল, খেলনা, ফল, পশু পাখী প্রভৃতি সব কতো বস্তুই না তৈরী হয়ে থাকে। বর্তমানে ঐসব মাটির দ্রব্যাদি

আবার চিত্রিতও হচ্ছে ফলে আকর্ষণও বাড়ছে দিনে দিনে। বর্তমানে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবেও মাটির দ্রব্যাদির চাহিদা ভীষণ।

(গ) বাঁশ শিল্প : সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঁশ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে মানব সমাজে। বাস গৃহ থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় কতো বস্তুই না বাঁশ থেকে তৈরী হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

উত্তরবঙ্গের বাঁশের থেকে তৈরী ঝুড়ি, পাখীর খাঁচা, টোকা, কুলা, ডালা, চালুনি, ফুলের সাজি, খালুই, বিত্তি, আটুল, পলো, ঢাকনা, ঝাঁকা, গোলা, মই, গেট, গাছের খাঁচা, মন্থন দণ্ড, প্রতিমার সজ্জা, বাঁশের প্রতিমা, ধূপদানি, ছাইদানি প্রভৃতি ছাড়াও ছোটদের পুতুল, খেলনা, বেড়া, মাচা, খুঁটি, বাতা, চালা, ছিপ, লাঠি, বাঁশী, ছৈ, চাটাই, মোড়া ইত্যাদি কতো কিছুই না তৈরী হয়ে থাকে। এসবের চাহিদাও আছে যথেষ্ট।

(ঘ) বেত শিল্প : বেতের তৈরী নানাধরনের শিল্পদ্রব্যেরও যথেষ্ট চাহিদা আছে আমাদের দেশে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে যেসব বেত পাওয়া যায় তাই দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে বেতের ছোট বড় ধামা, পাতি, ঝাঁপি, মোড়া, চেয়ার, দাঁড়িপাল্লা, স্যুটকেশ, টেবিল, সোফা, কুলো, খাঁচা, দোলনা, ফুলের সাজি, ঝুড়ি, শীতল পাটি, ছাতার বাট প্রভৃতি অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এসবের শিল্প কাজও দেখার মতো।

(ঙ) পাতার কাজ : খেজুর পাতা, তালপাতা, শালপাতা প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি তৈরী হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ছোট বড় তালপাতার পাখা, ব্যাগ, টুপি, ঝাঁপি, ছাতা, আসন, টোকা, বাঁশী, খেলনা প্রভৃতি যেমন তৈরী হয় তাল পাতার দ্বারা তেমনি খেজুর পাতার পাটি বা শালপাতার ঠোঙা ও খাবারের পাতা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবেই বিপুল চাহিদা পেয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে।

পাতার এইসব শিল্পে বহুলোক জড়িত থাকে। অথচ এই সব কাজে খুববেশী দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য পাতার কাজে মেয়েরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

(চ) দড়ি ও তারের কাজ : পাট থেকে সরু মোটা নানা ধরনের দড়ি যেমন তৈরী হয় তেমনি আবার হাঁড়ি ঝোলানোর সিঁকে, নীচে ঝোলানো দোলনা, থলে, ব্যাগ, দড়ির জাল, পশুপাখী ধরার নানা ধরনের ফাঁদ, দড়ির খাটিয়া, নৌকার গুণটানা দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

আবার নারকেলের ছোবড়া থেকে কাতার দড়ি, পাপোষ, খসখসে, খাটিয়া, নীচু মোড়া প্রভৃতি কতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষই না তৈরী হয়ে থাকে।

তারের তৈরী পাখীর খাঁচা, ধূপদানি, খেলনা, বাক্স প্রভৃতি বহুজিনিষ তৈরী হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গে বহু লোক জড়িত থাকে এসব শিল্পে। ঐসব দ্রব্যাদির চাহিদাও ব্যাপক।

(ছ) তাঁত ও বয়ন শিল্প : উত্তরবঙ্গের বহু ব্যক্তি তাঁত ও বয়ন শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে। সূতা বয়ন থেকে শুরু করে তাঁতের শাড়ী, বিছানার চাদর, গামছা, লুঙ্গী, মশারী, ধূতি, থান প্রভৃতি তৈরী করে থাকে এই অংশের তাঁতিরা। কাপড়ের ওপরে নক্সাগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(জ) রেশম শিল্প : উত্তরবঙ্গের রেশম শিল্পের কেন্দ্রস্থল হলো মালদা। রেশম সূতোর বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় মালদায়। মালদার বহুলোক যুক্ত আছে এই রেশম শিল্পে। রেশম চাদর, সিল্কের শাড়ী ও ধুতির চাহিদা ভারতব্যাপী।

এই শিল্প গড়ে উঠেছে তিনটি ভাগে (১) গুটি পোকার চাষ (২) সূতো কাটা (৩) কাপড় বোনা।

(ঝ) পশম শিল্প : এই শিল্প মূলত : দার্জিলিং জেলার ঘুম, তুংসুং এবং কালিম্পঙে গড়ে উঠেছে। এই শিল্পে যুক্ত আছে কয়েক হাজার শিল্পী। ভেড়া ও অন্যান্য পশুর লোম থেকে পশম সংগ্রহ করে বিশেষভাবে 'প্রসেসিং' করে সূতো তৈরী করা হয়। তারপরে ঐসব পশম সূতো বাণ্ডিল থেকে সোয়েটার, মাফলার, শাল, টুপি, কম্বল, কোট, জ্যাকেট প্রভৃতি নানাবিধ শীতের পোষাক তৈরী করা হয়ে থাকে। সূচীকর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় ঐসব শীতের পোষাকে ফুল, লতা-পাতা পশু-পাখীর সুন্দর সুন্দর নক্সা। দার্জিলিঙের পশম শিল্পের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের নানা প্রদেশেও রয়েছে।

(ঞ) চর্ম শিল্প : উত্তরবঙ্গে চর্মশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত আছে বহুলোক। জুতো, চটি, ব্যাগ, স্যুটকেস, মানি ব্যাগ, সাইকেলের সীট প্রভৃতি কতো রকমারী জিনিষই না তৈরী হয় চামড়া থেকে। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে এক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিযোগিতা করেই টিঁকে আছে ছোট ছোট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চর্ম শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি।

(ট) শঙ্খ শিল্প : শাঁখা এবং শঙ্খের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে শঙ্খশিল্প। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শঙ্খবণিক ও শাঁখারীরা। মেয়েদের শাঁখা পরার বিষয়ে প্রচলিত আছে নানা কাহিনীও এই উত্তরবঙ্গে। বহু লোক যুক্ত আছে এই শঙ্খশিল্পে। তবে একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই গড়ে উঠেছে শঙ্খশিল্প।

(ঠ) পাথর শিল্প : দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এই পাথর শিল্প। গম ভাঙা যাঁতা, শিল, নোড়া, বাটি, ধূপদানি, পাথরের থালা, মূর্তি, পূজার্চনার বাসনাদি কতো জিনিসই না তৈরী হয় এই সব এলাকায়। কিন্তু বর্তমানে পিতল, কাঁসা, এ্যালুমিনিয়াম ও স্টীল জাত দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে এই শিল্প।

(ড)) গৃহনির্মাণ শিল্প : পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গেও মোটামুটি তিন ধরনের খড়ো ঘর বা মাটির চালা ঘর দেখা যায়।

(১) চারকোণা খড়ো ঘরগুলো দোচালা, চারচালা বা আটচালা হয়ে থাকে। প্রায় দোতলা সমান উঁচু হয় ঘরগুলো। (২) বাঁকা চালের খড়ো ঘরগুলো সাধারণত চৌচালা হয় এবং একতলা বা দোতলা সমান উঁচু হয় (৩) গোলাকার গোলাগুলোতে ধান বা শস্য মজুত রাখা হয়।

চারচালা বা আটচালা ঘরগুলো বাংলার গৃহনির্মাণ শিল্পের এক উজ্বল নিদর্শন। পুরু দেয়াল এবং মজবুত বাঁশের আড়াগুলো দেখার মতোন। সরু বাঁশের বাখারি দিয়ে যে কাঠামো তৈরী হয় তাও চমৎকার শিল্পের নিদর্শন। ঘরামিরা ঐ বাঁশের কাঠামোর ওপরে

স্তরে স্তরে যখন খড়গুলো বসায় তখন মুগ্ধ হতে হয় তাদের নৈপুণ্যে। চালের ওপরে ঘরের দেয়ালে, জানালা ও দরজার ওপরে যেসব নক্সা ও কারু কাজ করা হয় সেগুলোও দেখার মতো। ঘরের মেঝে, বারান্দা ও দেওয়াল গোবর দিয়ে নিকিয়ে ঝক্‌ঝকে করে রাখা হয় যেন সত্যিই মন্দির হয়ে ওঠে গৃহগুলো। খড়ো চালের ঘরকে কেন্দ্র করে কেন দোচালা, চারচালা ও আটচালা মন্দির গড়ে উঠেছিল এককালে তা এইসব ঘর বাড়ী দেখলে বোঝা যায় সহজেই।

(ঢ) কাঁথা শিল্প : পুরনো ছেঁড়া, শাড়ী, ধুতি, চাদর ইত্যাদি পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি দিয়ে সাদা মাটা কাঁথা তৈরী করে তার ওপরে (মেয়েরা) কতো সুন্দর সুন্দর নক্সাই না ফুটিয়ে তোলে। পদ্মফুল, সূর্য্য, চন্দ্র, ফুল, লতা-পাতা, প্রজাপতি, ময়ূর, পাল্কী, জাঁতি, মাছ, হাঁস, লোকজন, ছেলেমেয়ে কতো নক্সাই না ফুটিয়ে তোলে মেয়েরা। উত্তরবঙ্গের গ্রামীন মেয়েদের সূঁচী শিল্পের এক উজ্বল নিদর্শন হলো এইসব কাঁথাগুলো। এগুলো প্রকৃতপক্ষে সূচী শিল্পের গৌরবময় দৃষ্টান্ত।

আজ কম্বল লেপ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা সত্বেও গ্রামাঞ্চলে এখনো কদর আছে এই কাঁথার। শুধু শীত নিবারণের জন্যই নয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শোয়ানোর জন্য ছোট ধরনের কাঁথা, বাক্সের ঢাকনা, আয়নার ঢাকনা, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর থলে, রুমাল প্রভৃতি অনেক কিছুই কাঁথা শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে।

অবশ্য দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মেয়েদের হাতে এই উত্তরবঙ্গের কাঁথা শিল্প যে বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

(ণ) আসন—শাড়ী চাদর প্রভৃতি শিল্প : বর্গাকার বা আয়তাকার ছোট বড় চটের ওপরে শাড়ীর পাড় এবং নানা ধরনের রঙীন সূতো দিয়ে কতো সুন্দর সুন্দর আসনই না তৈরী করে মেয়েরা। ঐসব আসনের ওপরে ফুল ফল, লতা-পাতা, মানুষ, পশু পাখী, চাঁদ, সূর্ব ও নানা দেবদেবীর চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়। অতিথি বা আত্মীয় কুটুম্বদের বসতে দেওয়া হয় সব থেকে সুন্দর আসনটিতেই। আসনের শৈল্পিক দিকটি সত্যিই প্রশংসা করার মতো।

আসন ছাড়াও শাড়ী, চাদর, ঢাকনা, রুমাল প্রভৃতিতে যে সব নক্সা তৈরী করে উত্তরবঙ্গের মেয়েরা তা সূচী শিল্পের উজ্বল নিদর্শন হিসাবে রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(ত) আলপনা : বাংলার পারিবারিক লোক শিল্প হিসাবে আলপনার খ্যাতি আজ জগৎ জোড়া। এই শিল্প কাজে উত্তরবঙ্গের মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। পূজা পার্বণ, ব্রতানুষ্ঠান এবং শুভ কাজে আলপনার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এই অংশে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভেদে আবার আলপনার পার্থক্যও ঘটে। শুধু যে উঠোনে, বারান্দায় বা ঘরের মেঝেতেই আলপনা দেওয়া হয় শুভকাজে তা কিন্তু নয়। সরাতে, ঢেঁকিতে, পিঁড়িতে, দেওয়ালে, গোয়ালে, গোলায়, মঙ্গল ঘটে, সিঁড়িতে, দরজায় এমন কি বাড়ীর বাইরে ও গেটের মুখেও দেওয়া হয় নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর আলপনা।

আমাদের দেশে আলপনার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণেও আলপনা দেওয়ার কথা আছে। আচার মূলক স্ত্রীশিল্প হিসাবে এই আলপনার জনপ্রিয়তা

কিন্তু ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা একটি আবশ্যিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র।

(থ) ধাতু শিল্প : উৎকর্ষের বিচারে উত্তরবঙ্গের তামা-কাঁসা, লোহা বা পিতলের তৈরী জিনিসপত্র খুব উন্নত মানের না হলেও উত্তরবঙ্গের কামার শালায় যেসব দা, বঁটি, হাতা, খুন্তি, বর্শা, কুড়ুল, কাস্তে, নিড়ানি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে সেগুলোর ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। পিতল, কাঁসা, তামার নানা পাত্রাদিও তৈরী হয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশের ছোট বড় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। আবার ঐসব ধাতব বস্তুর ওপরে সুন্দর সুন্দর যেসব নক্সা বা ডিজাইন করা হয় সেগুলোর শৈল্পিক মূল্যও কম নয়।

(দ) অলংকার শিল্প : পৃথিবীর সবদেশেই অলংকারের ব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। অলংকারের বহিরঙ্গের সাজেই লক্ষ্য করা যায় লোকায়ত সংস্কৃতির ছাপ। অলংকারের ব্যবহার হয়ে আসছে সেই আদিম কাল থেকেই। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো এই উত্তরবঙ্গেও অলংকারের ব্যাপক প্রচলন আছে ধনী-গরীব সকল শ্রেণী এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

উত্তরবঙ্গের স্বর্ণকারগণ যেমন সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতির নানা অলংকার প্রস্তুত করে থাকেন তেমনি বিভিন্ন লোকশিল্পীগণ সহজলভ্য প্রাণীজ ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি দিয়েও নানা অলংকার নির্মাণ করে থাকেন। ঐসব অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শাঁখা ও রুলি, ফলের বীজের হার, কুঁচ ফলের মালা, তুলসী কাঠের মালা, পদ্মবীজের মালা, শাঁখের আঙটি, লোহার বালা ও আঙটি, কাঁচ ও পুঁতির মালা, শোলার গয়না, তামা ও রূপোর আঙটি, বালা প্রভৃতি।

(ধ) দারু শিল্প : ভারত তথা বাংলার অন্যান্য অংশের মতো উত্তরবঙ্গের দারু শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। প্রাচীন কাল থেকেই উত্তর বাংলার সূত্রধরগণ রথ, দরজা, পালঙ্ক, মূর্তি, রথের চাকা, চণ্ডীমণ্ডপ, আট বা চার চালা বসতবাড়ীর শৈল্পিক কারু কাজে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যেসব মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায় সেইসব কাঠ উত্তরবঙ্গের দারু শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ছোট বড় বহু কাঠের কারখানা। শিলিগুড়ি তো বর্তমানে গোটা পূর্ব ভারতেরই দারু শিল্পের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরবঙ্গের দারু শিল্পীগণ রথ, পালঙ্ক, দরোজা, থাম প্রভৃতি ছাড়াও আলমারী, কাঠের বাক্স, ঠাকুরের সিংহাসন, বসার পিঁড়ি, টুল, টেবিল প্রভৃতির ওপরে হাতুড়ী বাটালি, করাত, ছুরি ও ছেনির সাহায্যে ফুল, লতা-পাতা, গাছ, পশু পাখী ও দেবদেবীর যেসব চিত্র অঙ্কন করে থাকেন তা লোক শিল্পের এক উজ্বল নিদর্শনই বটে।

ঐ সব ছাড়াও নৌকা, পাল্কী, বৃষকাষ্ঠ, দেবদেবীর মূর্তি, আয়নার খাপ, দেরাজ, শেলফ, ধূপদানি, পূজার তৈজসপত্র ও বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রাদির ওপরের কারু কাজও দেখার মতো।

কাঠের তৈরী নানাবিধ পুতুল ও খেলনাগুলোও কম আকর্ষণীয় নয়।

উত্তরবঙ্গের দারু শিল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো কাঠের মুখোসে। মুখোস নৃত্যের প্রয়োজনেই দেবদেবী, পশুপাখী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-দৈত্যের বিচিত্র সব মুখোস তৈরী করে থাকেন শিল্পীরা। রঙও করা হয় ঐসব মুখোসে। শিল্প কর্মহিসাবে এইসব মুখোসগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়।

(ন) মন্দির স্থাপত্য ও মূর্তি শিল্প : উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি যদিও সবই মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে তবুও ধ্বংস প্রাপ্ত স্থান থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন ভগ্নাংশ দেখে মন্দির স্থাপত্য শৈলীর উন্নত নিদর্শনে আশ্চর্যই হতে হয়। ঐসব মন্দিরে যেসব পোড়া মাটির কাজ ছিল সেগুলোও কম আকর্ষণীয় ছিল না।

তবে বর্তমানে যেসব মন্দির রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে সেসব মন্দিরের স্থাপত্য শৈলী প্রাচীন যুগের তুলনায় তেমন আহামরি না হলেও কম আকর্ষণীয় নয়।

এককালে উত্তরবঙ্গে বিষ্ণু, সূর্য্য, দুর্গা, বুদ্ধ, শিব, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে যে উন্নত শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায় তা যথেষ্ট গর্বের বিষয়। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় কী অসাধারণ শিল্প প্রতিভার সাক্ষী ঐসব মূর্তিগুলো।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকভাষা

(ক) ব্যবহৃত লোকভাষা :

উত্তরবঙ্গে বহুভাষাভাষী লোকের বাস। এই অংশের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দ্রাবিড় অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত প্রায় সবকটি ভাষাই এই অংশে কম বেশী প্রচলিত। তবে বাংলা, হিন্দী এবং নেপালী ভাষাই উত্তরবঙ্গের প্রধানভাষা। এদের মধ্যে আবার সংখ্যা গরিষ্ঠের ভাষা হলো বাংলার ভাষা। কিন্তু এই বাংলা ভাষার মধ্যেও রয়েছে নানা স্তর ভেদ। এখানে আছে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, মার্জিত বাংলা বা বাবু বাংলা এবং কামরূপীয় উপভাষা।

শহরাঞ্চলে বর্ণ হিন্দু বাঙালী বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বরেন্দ্রী বা রাঢ়ী উপভাষা প্রভাবিত মার্জিত বাংলা ব্যবহৃত হলেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা প্রভাবিত বাংলাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কোচ, পোলিয়া, মেচ ও অন্যান্য তপশীলী জাতি উপজাতি এবং এই অংশে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান গণও প্রধানত ব্যবহার করে থাকেন কামরূপী উপভাষাই।

কিন্তু দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসের ফলে বাংলা ভাষীদের ভাষার মধ্যে সংমিশ্রনের কাজটা কিন্তু বেশ নীরবেই সম্পন্ন হয়ে চলেছে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে উত্তরবঙ্গের লোকভাষার উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(খ) কামরূপী উপভাষা :

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে বাংলা ভাষার চারটি প্রধান উপভাষা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। ঐ উপভাষা গুলো হলো (১) পশ্চিমের উপভাষা (২) উত্তরবঙ্গের উপভাষা (৩) উত্তর পূর্ববঙ্গের উপভাষা এবং দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ববঙ্গের উপভাষা।

এই উত্তর ও উত্তর পূর্ববঙ্গের উপভাষা প্রাচীন অসমীয়া ভাষার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত। এখন অনেকে ঐ উপভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' না বলে পৃথক 'রাজবংশী' ভাষা বলে চালাতে চাইছেন। তাঁরা গ্রীয়ারসন সাহেবের মন্তব্যকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে গ্রীয়ারসন ঐ উপভাষাকে রাজবংশী ভাষা বললেও ঐ ভাষা যে বাংলারই একটি উপভাষা সেকথাও বলেছেন বেশ জোর দিয়েই।

তাছাড়া ঐ ভাষা শুধু রাজবংশীরাই ব্যবহার করেন না। পোলিয়া, কোচ, বর্ণহিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য তপশীলী জাতি উপজাতিরাও ব্যবহার করে থাকেন।

আবার এই উপভাষাটি শুধু যে উত্তরবঙ্গেই ব্যবহৃত হয় তাও নয়। বাংলাদেশের রংপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর এবং আসামের গোয়াল পাড়া জেলা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেও ঐ উপভাষায় কথা বলে অসংখ্য নরনারী।

আর একটি মজার কথা হলো এই উপভাষাটির ব্যাপ্ত বিভিন্ন অংশে হলেও ঠিক একই ধ্বনিগত বা রূপগত মিল সর্বত্র কিন্তু নেই যদিও তাতে বোঝার খুব একটা অসুবিধা হয় না।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই উপভাষাকে 'কামরূপী' উপভাষা বলে অভিহিত করেছেন এবং ভাষা বিশেষজ্ঞরা ঐ মত মেনেও নিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বাসীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার ওপরে অসমীয়া ভাষার প্রভাবের মূল কারণ হলো সুদীর্ঘ কাল উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অংশ ছিল কামরূপের অধীনে। আবার কোচরাজ বিশ্ব সিংহ সুদীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গ থেকেই শাসন করেছেন আসামের বহু অংশ। স্বাধীন কামতাপুর রাজ্য ছিল আসাম, রংপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ নিয়ে। মহারাজ পৃথু এবং সন্ধ্যা রায়ের সময়ে এমনকি খেন বংশের আমলেও আসামের বহু অংশ শাসিত হয়েছে কামতাপুর থেকে। উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী উপভাষার ভিতরে তাই ঢুকে গেছে বহু অসমীয়া শব্দ।

সংক্ষেপে বলা যায় কোন দেশের ক্ষুদ্রাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম আঞ্চলিক অনুন্নত বা অসংস্কৃত উচ্চারণ ও ধ্বনিগত রূপগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে ভাষা প্রচলিত তাইই উপভাষা রূপে স্বীকৃত। বঙ্গভূমির বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক অনুন্নত ও ধ্বনিগত রূপগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কামরূপী উপভাষা এমনই একটি উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত যার মধ্যে অসমীয়া ভাষার প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"The common dialect current in North Bengal and Assam continued as one speech as a member of the Bengali-Assamese group of dialects. In the 15th century it split up into two sections Assamese and North Bengali.

(গ) বৈশিষ্ট্য :

এই উপভাষা পর্য্যালোচনা করতে গেলে যেসব বিশেষত্ব গুলো আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো হলো—

(১) বাংলা ভাষার মধ্যযুগের বেশ কিছু নিদর্শন এখনো টিঁকে আছে এই উপভাষায় যেমন আজি—আইজ, আইসা, রাতি—রাইত—আইত, দেইখ্যা, ধইর‍্যা প্রভৃতি। এইসব ক্ষেত্রে অপিনিহিতি 'ই' কার এর অবস্থান লক্ষ্যনীয়।

(২) মধ্যযুগের বাংলায় শব্দের অন্তস্থিত 'অ' কার 'আ' কার হতো অনেকক্ষেত্রে। এই উপভাষাতেও তেমন উদাহরণ দেখা যায় যেমন— ঘড়া—ঘাড়া, অনল—আনল, গলা—গালা, কথা—কাথা, নয়া—নায়া, লম্বা—লাম্বা প্রভৃতি।

(৩) মধ্যযুগীয় ইল, ইব, এখানেও দেখা যায় রান্ধাল ভাত, হারাল টাকা, দৌড়াল ঘড়া, কান্দিল কইন্যা, ধরি বা বাস প্রভৃতি।

(৪) 'র' এর স্থানে 'অ' এর ব্যবহার যেমন—রস—অস, রাত—আত, রাজা—আজা, রতন—অতন, রমজান—অমজান প্রভৃতি।

(৫) 'ব' স্থানে 'ম' দিয়ে ভবিষ্যৎকাল বোঝানো যেমন— রাখিম, বলিম, করিম্ প্রভৃতি।

(৬) মধ্যযুগীয় বাংলার বহু ক্রিয়াপদ এই উপভাষাতে এখনো আছে যেমন—করিল—করিলু, সাজিল—সাজিলু, পরা—পিন্ধা, জিতিয়া—জিনিয়া, বিয়ে—বিয়া প্রভৃতি।

(৭) 'ল' স্থানে 'ন' এর ব্যবহার লজ্জা—নইজ্জা, লাল—নাল, লেখে—নেখে, লোক—নোক, লতা—নতা প্রভৃতি।

(৮) মধ্যযুগের বাংলার বহু শব্দ এই উপভাষাতে আছে এখনো যেমন—পিড়া—পিরহা, কোথায়—কুণ্ঠিয়া, একস্থানে—একঠিয়া, গন্ধ—বাস, দন্ড—ডাং, ঐস্থানে—ঐঠিয়া, কোমর—কমর্যা, গৃহস্থ—গিরস্ প্রভৃতি।

(৯) এই উপভাষাতে বহু হিন্দী বা উর্দু শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে দেখা যায় যেমন—দুলহন্—দুলা, বহিন—বোন, আন্ডা—ডিম, আমার—হামার, কাহা—কৈ, লকড়ি—কাঠ, হাড্ডি—হাড়, শাদি—বিয়ে, বিহান—সকাল, পানি—জল, কাজিয়া—বিবাদ প্রভৃতি।

(১০) অষ্ট্রিক শব্দ— চ্যাংরা, চেংরি, ঝিঙ্গা, ঝাং, ঢাক, ঢেঙ্গা, টোপা, ঢং প্রভৃতি।

(১১) একই ক্রিয়াপদ দুবার ব্যবহার করে ছন্দিল সুর সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় বহু ছড়ায়—

'স্যুট পিন্ধ্যা দশের মাঝত্ বসে কিনা বসে।
কাল কাল ঘুঙুরা বাজে কিনা বাজে।

(১২) ধ্বন্যাত্মক শব্দ : গিল গিল, ঘাং ঘাং, টাউ টাউ, ছন্ ছন্ ইত্যাদি।

(১৩) দ্রাবিড় শব্দ : ইচা, ডাঙ্গুয়া, দামাল, দুন, খুকরা, ঘুষরা, খাল প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গের লোক ভাষার মধ্যে বিশেষ করে এই কামতাপুর উপভাষার মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার বহু শব্দ যেমন অবিকৃত অবস্থায় আছে তেমনি সমাসবদ্ধ পদ, উপসর্গ ও প্রত্যয় যুক্ত শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বিত্ববাচক শব্দ, প্রবাদ প্রবচনের বহুল প্রয়োগ প্রভৃতি নানা দিক দিয়েই এই উপভাষাকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করে তুলেছে এবং ভাষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ নির্মল দাশ মহাশয় যথার্থ্যই বলেছেন—'ভাষিক এলাকা হিসাবে উত্তরবঙ্গ বাংলার অন্যান্য এলাকা থেকে নানাভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। উত্তরবঙ্গের ভাষিক স্বাতন্ত্র্য শুধু পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকদেরই নজরে পড়বেনা। বাংলার অন্য এলাকার যেকোন বাঙালীই কাণ পাতা মাত্র বুঝতে পারবেন উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষা বাংলার অন্য এলাকার বাংলা থেকে অনেকখানি আলাদা।"

—উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে—পৃষ্ঠা ৫।

(ঘ) উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের কিছু শব্দের পরিচয়—

(১) **বচন জ্ঞাপক :** হামি—হামরা, মুই—মোরা, তুই—তোরা, উয়া—উয়ারা।

(২) **বৃত্তি পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ :** কামহার, কুমহার, কারুয়া, গুয়াল, নাউ, ঘাটোয়াল, মাছুয়া, রাখোয়াল প্রভৃতি।

(৩) **দেহবিষয়ক শব্দ :** মাথা, কাপাল, জীউ, গতর, চুলি, দাত, জিভা, গালা, পাও, তন, দাড়িহি, উরাৎ, ওঙ্গুল প্রভৃতি।

(৪) **কালজ্ঞাপক ঘটমান বর্তমান :** মুই করহু—হামরা করিহি, তুই করিহিস—তোরা করিহিস্, উয়ায় করেহে—উয়ারা করেহে।

(৫) **কালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ :** করনু—করিলু (করলাম), যাম্—(যাবো), বুঝনু—(বুঝলাম), খাইনু—(খেলাম), জানু—(জানি), যাবু—(যাবে), লেখহুং (লিখছি), পরুহং (পরছি), আনিম—(আনবো), হোইল—(হলো), দিবা হবে—(দিতে হবে) হইগেইল—(হয়েগেল), কুণ্ঠি যাহিস্—(কোথায় যাস্?) বেড় বা চল্ (বেড়াতে চল্))।

(৬) **কৃষি সম্পর্কিত শব্দ :** হাল—নাঙগাল, আইল, বাথান, খুরা, কোদলানো, ডিপ্ শেলো, গাড়া, রোয়া, বুনা, ভুঁই, বীচি, পুয়াল, বোদরা (উঁচু নীচু))।

(৭) **প্রকৃতি বিষয়ক ও প্রাণী বিষয়ক শব্দ :** বিলাই (বিড়াল), হাত্তি, চান্দর—চাঁদ, সূরজ—সূর্য্য, মাকড়, বান, বিহান, চিকান—ঊষাকাল, বচা—কুমীর, কছু—কচু, উই, ডেনা, আঁশিয়া—আঁশ, কাছুয়া।

(৮) **সংখ্যাবাচক শব্দ :** কুড়ি—বিশ, হালি—চার, চাইর, নয়—নও, বাহিস—বাইশ, চল্লিশ—চালিস, পঞ্চাশ—পচাস্, নব্বুই—নোবই, একশো—স, আধ—আধা, আড়াই—আড়হাই, দেড়—দেড়হা।

(৯) **তৎসম শব্দ :** অল্প, জল, আকাশ, নদী, নীল, বুদ্ধি, ধর্ম, দেশ প্রভৃতি।

(১০) **তদ্ভব :** নাং, পিন্ধি-পিন্ধিয়া, শকর, সুতা, নিন্দ, সেজা, ছিন্ডা, ধল, মাও, বাপ, বেটা, ভাতার, মাই, জুয়াই, মোশা, শাস, ভোসুর, দাউরা।

(১১) **অর্ধতৎসম :** কইন্যা, রাইত, বরণ, কতন, দেহা, ধেনুক, দুখ, কুটুম, ভাদো, ঘিন্না, জন্ম, নবান, তক্ক, সগ্‌গ, ভন্ড প্রভৃতি।

(১২) **সমাসবদ্ধ পদ :** হাতিপাই (হাতির মতো পা যে মেয়ের), মাউরিয়া—মাতৃহীনা যে, বাউরিয়া—যে ভবঘুরে, খাটনিয়া—যে খাটতে পারে, মোহনীয়া—যা মোহময়, জঙ্গলিয়া—জঙ্গলে ঘোরে যে, নাঠুয়া—মামলা বাজ, কুড়িহা—কুঁড়ে, কাপালিয়া—ভাল ভাগ্য, চিমটা—কৃপণ, মৈষাল—যে মোষ চরায়, দো কাপড়ী—যে জামা ও শাড়ী দুইই পরে। মর্দাহী—মরদের মতো, গাটিয়া—বেঁটে ও মোটা, ফান্দুয়া—যে ফাঁদ পাতে, ঘাসিয়ার—যে ঘাস কাটে।

(১৩) **উপসর্গ ও প্রত্যয় যুক্ত শব্দ :** নিখাটিয়া—যে খাটে না, নিকামা—যে কাজ করে না, নিলাজ—যার লজ্জা নেই, নিধন, নিডিম, নিসাড়, অকুলা, অদেখা, অজাতিয়া, আগুরি—আগলানো প্রভৃতি।

(১৪) **দ্বিত্ব বাচক শব্দ :** উত্তরা উত্তরি—প্রতিবাদ করা, ওদোল বোদোল—আগোছালো, ছিকো ছিকো—ছিঃ ছিঃ, হেরা হেরা—পেরপেরা, বাসি বা গলাভাত, পেচকুটি—পেচকুটি, ছোট ছোট, আন্ধারে মুন্ধারে—অন্ধকারে, দুলদুল—গোটা গোটা, থক্ থকি, চুচুর মুচুর প্রভৃতি।

(১৫) **গালাগালির শব্দ :** কুটনি, চিরল দাঁতি, নাং, ঢেমনী, সাঙ্গানী, হাউরিয়া—(লোভী) আটকুরা, ঘর ভুন্দরা, ঢাউসা (চরিত্রহীন), কোদাল দাঁতি—(ঝগড়াটে মেয়ে), বাহোমারী (পাড়া বেড়ানো মেয়ে)), কান্দুরী—জোঁয়াই ভাতারী—(যে নিজ জামাইকে পতি করেছে)), কাল্‌কুটি ইত্যাদি।

(১৬) **নিত্য ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ :** গাভুর, মাই, ছোন্ডা, ছেচ্চা কথা, গালা, খাটুনি, খুশামত, কোইন্যা, এগনা, ভেলদূর, মাউগ, বহু, গসাই, বন্ধু, কাইচ, ভেল্লা, মেলা, গন্ডি, নুকটা, আগ, নাও, হেংলা, নদারী (নতুন বৌ), হিয়ল, সিজা, ছুতা, ছুয়া, সেজ্জা, কুণ্ঠী, হিলা, ভাউজি, চুমা, খুটা, দাদি, বিটা, বিটি, হালকান, কাচ্চি পাকি, আয়না, বৈল, সিধা, কোমর, হাড্ডি, খতম, খুন, দোস, ঘিউ, দহি, দিল্, ধুতি, নিক্‌লা, পানি, রাণ্ডি প্রভৃতি।

যদিও উত্তরবঙ্গের লোক ভাষা বলতে ঐ অংশের সকল অধিবাসীদের ভাষার কথাই বলা দরকার তবে এখানে শুধুমাত্র ঐ অংশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা প্রসঙ্গেই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। তবে বর্তমানে এই ভাষাক্রমেই প্রয়োজন ভিত্তিক হয়ে ওঠার ফলে তরুণ ও শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা চলিত বাংলায় প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকছে বেশী করে। প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারের রীতি লোপ পাচ্ছে দ্রুত তালে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোক নাম

কোন প্রাণী, বস্তু বা কোন কিছুর প্রকৃতি বা ভাবানুসারে যে নামকরণ করা হয় তাকেই বলা হয় লোকনাম বা Folk naming. কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন লোকনামের সঙ্গে যুক্ত থাকে কোন বিশেষ স্থানের নাম, ঘটনার স্মৃতি, বার, মাস, পক্ষ, কাল বা ঠাকুর দেবতার নাম, জীবিকা বা প্রকৃতির অবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছুই।

উত্তরবঙ্গের লোকনামের দিকে লক্ষ্য করলেও আমাদের ঐসব বৈশিষ্টগুলো চোখে পড়ে।

(ক) জন্মবার অনুসারে নাম :

বিষাদু—বৃহস্পতি বারে যার জন্ম, সোমারু—সোমবারে যার জন্ম, মঙ্গালু—মঙ্গলবারে যার জন্ম, তেমনি শুকুরু, বুধারু প্রভৃতি।

(খ) জন্মমাসানুসারে নাম :

বৈশাগু, জেঠিয়া, আষারু, শাওনা, ভাদো, ভাদরু, অগনা, অঘু, পুষ, মাঘু, মাঘো, ফাগু, চৈতু প্রভৃতি।

(গ)) প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে ও কালানুসারে নাম :

আকালু—আকালের সময় জন্ম, বানাতু—বন্যার সময়ে জন্ম, ভূঁইচালু—ভূমিকম্পের সময় জন্ম, দুপুরু—দুপুরে জন্ম, আঁধারে জন্ম—আন্ধারু, জোনাকু—জ্যোৎস্না রাতে জন্ম, সাকালু—সকালে জন্ম, আমাসু—অমাবস্যায় জন্ম প্রভৃতি।

(ঘ) জাতক জাতিকার প্রকৃতি অনুসারে নাম :

গোরা—ফর্সাছেলে, ঢ্যাপা—মোটা ছেলে, সুটকু—রোগা ছেলে, সুটকী—রোগা মেয়ে, নিস্তেজ ছেলে—নিসারু, ধ্যার—ধেরিয়া—ছিঁচ্ কাঁদুনে, বেঁটে—বাটু বা বাণ্টু, লম্বা—ঢ্যাঙ্গা প্রভৃতি।

(ঙ) ঠাকুর দেবতার নামে নাম :

শিবু, শ্যামা, দুর্গা, কালী, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারান, চন্ডী, গণেশ, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের গ্রাম নাম

(ক) গ্রাম নামের গুরুত্ব :

লোক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কোন দেশের গ্রাম-নামের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে বহু ঘটনা, বহু কাহিনী ও বহু বিচিত্র ইতিহাস। ঐ সব গ্রাম নামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বহু সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান সূত্রেরও সন্ধান।

উত্তরবঙ্গের গ্রাম নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একদিকে যেমন দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাম আছে তেমনি ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখী, ব্যক্তি, সংখ্যা, পদবী, ইতিহাস, পুরাণ, ফল, ফুল, নদী, খালবিল, দীঘি, প্রভৃতি কতো কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েই না গ্রামগুলোর নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন নাম যেমন আছে তেমনি পরিবর্তিত নাম এবং নূতন নূতন নামও হয়েছে কতো।

(১) পুর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'পুর' অন্ত্যপদযুক্ত অসংখ্য গ্রাম রয়েছে। ঐসব নামের পূর্বে দেবদেবীর নাম, পৌরাণিক চরিত্র সমূহের নাম, আরবী ফার্সী যুক্তনাম, বৃত্তি সূচক নাম, ফল, ফুল, ব্যক্তির নাম ইত্যাদি থেকে ঐসব গ্রামের ইতিহাস ও নামের উৎস বুঝতে অসুবিধা হয় না যেমন— জয়পুর, বিরামপুর, রামপুর, ইসলামপুর, সাদুল্লাপুর প্রভৃতিক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়।

(২) গুড়ি : উত্তরবঙ্গে অন্ত্য পদে গুড়িযুক্ত গ্রামের সংখ্যাও কম নয়। গুড়ি শব্দ গোড়া থেকে বাস্তুপ থেকে বা কুঁড় থেকে যেখান থেকেই আসুক না কেন গুড়ি পদযুক্ত গ্রামগুলো সবসময়েই যে আরম্ভ অর্থ বহন করেছে এমন কিন্তু নয় যেমন মহাকালগুড়ি, জলপাইগুড়ি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আরম্ভ অর্থ বোঝায় না।

(৩) বাড়ী : অন্ত্যপদে বাড়ী যুক্ত বহু গ্রাম রয়েছে। ফুল, ফল, ব্যক্তি, স্থান, গাছপালা ও দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েও বাড়ী নামের গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন— ফুল বাড়ী, হলদী বাড়ী, কাঁঠাল বাড়ী, তাঁতি বাড়ী, বাঙাল বাড়ী প্রভৃতি। আবার কমলা বাড়ী গ্রামটি যদু নারায়ণের প্রথমা স্ত্রী কমলার নাম থেকে হয়েছে বলে জনশ্রুতি।

(৪) গড় : এই শব্দযুক্ত গ্রামগুলো একদা যে গড় ছিল সর্বদা কিন্তু তা বোঝায় না। বরং চারদিকে যে গর্ত বা জলাশয় ছিল তাইই বুঝায়— গড়মাহাল, বুড়ীন গড় প্রভৃতি গ্রামের চারদিকে এমনই জলভর্তি ছিল মনে হয়।

(৫)) পাড়া : পাড়াযুক্ত গ্রামের নামও আছে অসংখ্য। ধনপাড়া, মাণিকপাড়া, নোয়াপাড়া, কামার পাড়া প্রভৃতি।

(৬) গ্রাম, হাট, গঞ্জ, ডাঙ্গা, গছ, গাছ, গাঁও, দহ বাটি ঘটি বস্তী, পুকুর প্রভৃতি যুক্ত কতো অসংখ্য গ্রামই না ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী বা স্মৃতি বুকে নিয়ে।

(৭) প্রত্যয়যুক্ত গ্রাম নাম : ল, ইল, ইয়া, উয়া, ন, ইন, নি, র, রি, কি, টি, খানা, রা, আল, আরা, ড়া, ওর, হার, হারা, দা, চি, চা, ট, সা, প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত কতো গ্রামই না আছে। তবে বহুক্ষেত্রেই অন্য শব্দের সঙ্গে মিশে এইগুলি প্রত্যয় জাত অর্থ না বহন করে অন্য অর্থ বহন করছে। যেমন—হাপ্তিযা, ইটাহার, ইটাল, মহারাজা, কানকি প্রভৃতি বহুগ্রামের নাম প্রত্যয় জাত অর্থ বহন করে না।

(৮) নগর, কুটি, কুঁড়ি, কুণ্ড, জোড়, জোড়া, তলি, তলা, জোল, খণ্ড, কুল, কোল, দীঘি প্রভৃতিযুক্ত গ্রামের নামও কম নয় এই অংশে।

(৯) সংখ্যা যুক্ত গ্রাম নাম : দোঘারিয়া, আটঘর, চৌঘরিয়া, বত্রিশ কোলা, আঠারোকোঠা, তেঘরা, আটরই, আটকড়া, দশাগ্রাম, নয়ঘর, তিন বিঘা, পঁচিশ বিঘা, সাতগাছি, দোগাছি, পাঁচপাড়া, নওদা, কুড়িবাড়ী, তিনধরিয়া প্রভৃতি কত গ্রামই না আছে।

(১১) ব্যক্তি নামে গ্রাম : মধুপুর, গোবিন্দপুর, ভাবানী প্রসাদ, ফুলেশ্বরী, প্রভাকর কুঠী, রাম প্রসাদ, উপেন চৌকি, গোপাল গঞ্জ, বলারামপুর, প্রভৃতি বহুগ্রাম আছে ব্যক্তি নামে।

(১২) পশু পাখীর নামে গ্রাম : চাতক, পানিকৌড়ি, বুলবুল চণ্ডী, ঘুঘুমারী, শকুনী বালা, চিলাখানা, কোকিল, মহিষ বাথান, মহিষ কুচি, হাতি ডোবা, বাঘমারি, ময়নাগুড়ি, গাধিয়া টোল, ছাগল কাটি, কাগমারি প্রভৃতি।

(১৩) দেবদেবীর নামযুক্ত গ্রাম : জটেশ্বর, দুর্গানগর, বাণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম, মাধব ডাঙ্গা, রামকেলি, চণ্ডীশাল, মহেশ্বর, গোবিন্দপুর, বিষ্ণুপুর, শীতলাবাস, কালীর ঘাট, শ্যামপুর, নারায়ণপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি।

(১৪) মাছের নাম যুক্ত গ্রাম : সিঙ্গি মারি, চিতলমারি, বড় শোল মারি, পুঁটিমারি, মাগুর মারি, বোয়াল মারি, বেলে পাড়া প্রভৃতি।

(১৫) কুঠী যুক্ত গ্রাম নাম : কুঠী গ্রাম, রসের কুঠী, পানি মারার কুঠী, তুর কাণীর কুঠী, দুখাভুলার কুঠী, ঝাউ কুঠী, বলা কুঠী, রাজা কুঠী প্রভৃতি।

(১৫) ফুলের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম নাম : পলাশ বাড়ী, ফুলবাড়ী, শেফালিকা, শিমূল বাড়ী, কুসুম বাড়ী প্রভৃতি।

(১৬) পেশার সঙ্গে যুক্ত গ্রাম নাম : কলুডাঙ্গা, মল্লিক পাড়া, আমিন গাঁ, কুমার পাড়া, লস্কর পাড়া, তেলি পাড়া, বারুই পাড়া, মোল্লাপাড়া, গোয়াল পুকুর, দালাল বস্তী প্রভৃতি।

(১৭) সব্জী ও শস্যের নাম যুক্ত গ্রাম : ধানটোলা, সরিষা টুলি, আলুবাড়ী, হলদী বাড়ী, পিয়াজ পোখর, প্রভৃতি।

(১৮) মুসলিম নামের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম : মামুদপুর, মহম্মদপুর, মীর্জাপুর, সাবাজ পুর, সুলতানপুর, রসুলপুর, ফতেপুর, খাঁপুর, মোল্লাপাড়া, আলীপুর, সৈয়দপুর, হোসেনপুর, সেকেন্দর পুর, সাদুল্লাপুর, ফরিদপুর, হাবিবপুর, নূরপুর, নাজিরপুর, ইসলামাবাদ, হোসাইনাবাদ, প্রভৃতি।

(১৯) ফলের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম নাম : তালেশ্বরগুড়ি, কামরাঙ্গাগুড়ি, আমবাড়ী, বেলপুকুর, বেলডাঙ্গি, নাটাবাড়ী, কাঁঠালবাড়ী, আমটুলি, প্রভৃতি।

(২০) হিন্দী বা উর্দু ফার্সী প্রভাবিত গ্রাম নাম : বহিন, কানহাইয়া, পাঁচ ভাইয়া, বেগমগঞ্জ, নবাব নগর, উজিরপুর, ভূজাগাঁও, খোদাবস্তী, মিয়াভিটা, মোসলেমপুর, সুজাপুর, ফাজিল পুর, দোরাহা প্রভৃতি।

(২১) ধ্বন্যাত্মক শব্দযুক্ত গ্রাম নাম : সরসর, ঠকঠকি, ধনীবনী, ঠুনঠুনিয়া, খুড়খুড়িয়া, থকথকি, ডাংরা ডাংরি, খিলবিল, কনকনিয়া, চুচুর মুচুর, ঝল ঝলিয়া, দোলা চলা, ঘড় ঘড়িয়া, চক্চকা, ঝল ঝলি, দল দলি, ছুয়াই মুয়াই, ডিমডিমা প্রভৃতি।

(২২) কাব্যিক নামযুক্ত গ্রাম নাম : আলোক বাঝি, রসের কুঠী, সোনাতুলি, রসিকবিল, কাজল দীঘি, মনটানি, হেমকুমারী, উছলপুখুরি, নন্দি, সুজালি, বিলাসী, ফুলমণি, বিরহিনী, আঙ্গিনা, মনোহরা, ভোমরা, প্রাণসাগর, জয়ন্তী, সুখানী, মালঞ্চ, কালনাগিন, মালাহার, বিলকাঞ্চন, চিকন মাটি প্রভৃতি।

(২৩) দেশজ শব্দজাত গ্রাম নাম : কাণ কাটা, চোপা, ডুমনি পাড়া, নাগর ভাঙ্গনী, নেংটি ছানা, বাগুন, বোচকাপড়া, বুড়াবুড়ী, হাথী পাঁও, রাতুন, ভূঁইহারা, চক্চকা, চক্চকি, টঙ্গটঙ্গি, ঢনঢনিয়া, বৈদোল, চেচাকাটা, ভেলাগাছি, মাথান পোখর, কাকড়ি বাড়ী, মাঙ্গনাভিটা, বাথান ডাঙ্গী, ভাণ্ডানী গ্রাম প্রভৃতি।

(২৪) সংস্কৃত ঘেঁষা গ্রাম নাম : গোকর্ণ, নরহট্ট, বৈরহট্ট, রণহট্ট, নারী হট্ট, কর্ণদীঘি—করণদীঘি, ব্রহ্মপুর, বৈরিগুড়ি, ধূপগুড়ি, জগন্নাথ বাটি, করদহ, মঙ্গলদহ, মূলাহার, দেউল, দুর্গাপুর, বাণেশ্বর, বৈকুণ্ঠপুর, ব্রহ্মাপুর, জয়ন্তী, দেবগ্রাম, সিদ্ধেশ্বরী, ব্যঘ্রেশ্বরী, সকর্মা, নাগেশ্বর পুর, কল্যাণী, কুম্ভীরা প্রভৃতি।

(২৫) অস্ট্রিক শব্দজড়িত গ্রাম নাম : নাটুয়াডাঙ্গী, মোটরা, টেপুর, বরহুড়, ডেহর, ইটাহার, ইটাল, কুকুড়ামণি, ডিমঠি, পাঁচড়া, টিটিহি, বনাড়া, সিংতোড়, খস্তি, কুমারডাঙ্গী, ডাঙ্গী, কামরডাঙ্গা, এলাঙ্গী, টোটোপাড়া, ভোটপাড়া, ডুমনীগুড়ি, ডাউয়া গুড়ি প্রভৃতি।

(২৬) ইংরেজ স্মৃতিবাহী গ্রাম নাম : কুঠী অন্তপদের বিভিন্ন গ্রাম ও ইংরেজ বাজার, মিস্টার পাড়া, সাহেব গঞ্জ, নীলডাঙ্গা প্রভৃতি।

(২৭) ইতিহাস ও কিংবদন্তী জড়িত গ্রাম নাম : বংশীহারী, বাণগড়, করদহ, করণদীঘি, বৈরহাট্টা, বৈদোল, কসবা মহেশো, কমলা বাড়ী, বাণপুর, হরিশ্চন্দ্র পুর, কুশমণ্ডী, আদিনা, পাণ্ডুয়া, বাঁশড়া, গোসানিমারি, রাজা ভাত খাওয়া, তামসাং, ধাপগঞ্জ, ভাণ্ডানী গ্রাম, জল্পেশ গ্রাম।

(২৮) রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাশ্রিত গ্রাম নাম : অর্জুনপুর, ভীমপুর, রাবণপুর, ভরতপুর, ভীমরাম, জানকী নগর, লক্ষ্মণীয়া, রামপুর, নৃসিংহপুর, পরশু-রামপুর, নরসিংহপুর, গন্ধর্বপুর, লঙ্কাপাড়া, মহিষাসুর প্রভৃতি।

(২৯) প্রাচীন ও ইতিহাস খ্যাত স্থান নামে গ্রাম নাম : চিতোর, অযোধ্যা, রাজকোট, উদয়পুর, প্রয়াগপুর, এলাহাবাদ, ভোজপুর, প্রভৃতি।

(৩০) ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নামজড়িত গ্রাম নাম : কবীরপুর, নিত্যানন্দপুর, শ্রীনিবাসপুর, গৌরাঙ্গপুর, সায়েস্তাবাদ, গঙ্গাগোবিন্দপুর প্রভৃতি।

(খ) মূল্যায়ন :

উত্তরবঙ্গের এইসব গ্রাম নামগুলো পর্য্যালোচনা করলে যেমন প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় তেমনি আবার মুসলমান যুগের ছাপও রয়েছে দেখা যায়। আবার অষ্ট্রিক দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় ছাপও রয়েছে বহু গ্রাম নামে। রয়েছে দেশজ শব্দজাত বহুগ্রামের নামও।

দেবদেবী ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐসব গ্রাম নামে বহু কিংবদন্তীর কাহিনীও। সংখ্যাবাচক, গাছপালা, ফুল, ফল, পশুপাখী, মাছ শস্য প্রভৃতির প্রভাব যেমন রয়েছে ঐ সব গ্রাম নামে তেমনি ধ্বন্যাত্মক ও কাব্যিক নামেও আছে বহুগ্রাম।

আবার উপসর্গ ও প্রত্যয়যুক্ত গ্রাম নাম যেমন আছে তেমনি হিন্দী, ফার্সী, উর্দু এবং ইংরেজী শব্দের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম নামও রয়েছে প্রচুর।

আছে বহু কৌতুকপ্রদ এবং মজাদার নামও। গ্রাম নামগুলো নিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করলেই পাওয়া যাবে নানান ঘটনা এবং কাহিনী ও ঐসব গ্রামের নামকরণের প্রকৃত ইতিহাস। পাওয়া যাবে মূল্যবান লোকসংস্কৃতির বহু উপাদানের সন্ধানও। কেননা—"The study of place names brings to light many interesting cultural traces.. .."

(Fundamental of Folk Literature— *W.Bosewel* Page-51)